আধুনিক যুগ ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি

প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী

প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী একজন খ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, পণ্ডিত ও কুশলী। ইসলামী জ্ঞানে তার গভীরতা এবং সমসাময়িক বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের কি ভূমিকা হবে সে বিষয়ে সুচিন্তিত মতামতের জন্য তিনি সারা বিশ্বে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র। তিনি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার একজন প্রবক্তা। ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংলাপের উপর তিনি সব সময় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিখ্যাত মিশরীয় পণ্ডিত ড. কারযাভীর জন্ম ১৯২৬ সালে। দশ বছর বয়সেই তিনি সম্পূর্ণ কোরআন হেফজ করেন এবং কোরআন তেলাওয়াতের নীতিমালা, কারীদের উপর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তিনি আল আজহারেই লেখাপড়া করেন। ১৯৭৩ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উসুল আল দ্বীন অনুষদ হতে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ড. কারযাভী আল আজহার ইনস্টিটিউটে মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশুনার সময়ই তার প্রতিভার স্বাক্ষর হিসেবে শিক্ষকদের কাছ থেকে আল্লামা বা মহান পণ্ডিত খেতাবে ভূষিত হন। ১৯৫৮ সালে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উপর ডিপ্লোমা করেন। এর আগে তিনি আরবি ভাষা অনুষদ থেকে শিক্ষকতার সনদ পান।

ড. কারযাভী মিশর সরকারের আওকাফ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বোর্ড অব রিলিজিয়াস এফেয়ার্স-এর একজন সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি আলজেরীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ইসলামিক সায়েন্টিফিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমানে তিনি জেদ্দাস্থ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) ফিকাহ একাডেমী, মক্কাভিত্তিক রাবেতা আল আলম আল ইসলামীর ফিকাহ একাডেমী, রয়াল একাডেমী ফর ইসলামিক কালচার এন্ড রিসার্চ জর্ডান, ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার অক্সফোর্ড-এর সদস্য, ▶

আধুনিক যুগ
ইসলাম
কৌশল ও কর্মসূচি

প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী

অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী

আধুনিক যুগ : ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি
প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী

প্রকাশক
বুকমাস্টার
৭০ নয়াপল্টন, ঢাকা ১০০০
ফোন: ০১৬৭৮ ১১১১০৫, ০১৮১৩ ১৬৪৮১৫

গ্রন্থস্বত্ব
শাহ্ আবদুল হালিম
E-mail: sah1947@yahoo.com

প্রকাশকাল
চতুর্থ সংস্করণ : আগস্ট ২০১৩, বুকমাস্টার
তৃতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০১১, দি পাইওনিয়ার
দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ২০০৩, নতুন সফর প্রকাশনী
প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০০৩, ইসলামিক ইনফরমেশন ব্যুরো বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ
রফিকুল্লাহ গাযালী

ক্যালিগ্রাফি
হাজী নূর দীন (চীন)

মুদ্রণ
দি প্রিন্টমাস্টার
E-mail: theprintmaster2000@gmail.com

মূল্য
২৪০.০০

Adhunik Jug : Islam Kaushal O Karmoshuchi by Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Translated by Muhammad Sanaullah Akhunji from Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase, Published by Bookmaster, 70 Nayapaltan, Dhaka 1000. 4th Edition : August 2013, Price Tk. 240.00 (US$ 12.00).

প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের কথা

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সমস্যা হলো, মুসলিম বিশ্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। মুসলিম বিশ্ব গতিশীল নয়। এর প্রধান কারণ, মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব উম্মাহর মৌলিক সমস্যা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। তারা ব্যর্থ হয়েছে একটি কার্যকর কৌশল নির্মাণ ও কর্মসূচি গ্রহণে যা তাদেরকে বর্তমান অস্থিতিশীল অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে। এই হলো সার্বিক অবস্থা।

বাংলাদেশে যারা সংস্কার ও রেনেসাঁর নামে কাজ করছে তারা কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে সক্ষম না হওয়ার কারণে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশে যারা এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা তাদের কাজের অগ্রাধিকারের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করতে সক্ষম হননি–কোন কাজটি আগে করতে হবে এবং কেন?

ইসলামিক ইনফরমেশন ব্যুরো বাংলাদেশ একটি বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। ব্যুরোর লক্ষ্য হচ্ছে সমাজ সংস্কারের নিমিত্তে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি নির্মাণ করা। এ উদ্দেশ্যে ব্যুরো পাঠকদের জন্য প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী রচিত প্রাইওরিটিস অব দি ইসলামিক মুভমেন্ট ইন দি কামিং ফেস-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করছে। আমাদের বিশ্বাস এ গ্রন্থটি বাংলাদেশে যারা সমাজ সংস্কারে কাজ করছে তাদের সুখনিদ্রা ভাঙতে সক্ষম হবে এবং তাদের মাঝে গতিশীলতা আনতে সহায়ক হবে। আশা করা যায় বইটি সমাজ কর্মীদের উজ্জীবিত করবে এবং তাদের মাঝে প্রাণসঞ্চার করার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন আনতে সক্রিয় ক্যাটালিস্ট বা অনুঘটকের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

ড. কারযাভীর এ গুরুত্বপূর্ণ বইটি দার আল নসর, কায়রো থেকে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ থেকে অনুবাদ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী। অনুবাদের কাজ প্রাথমিকভাবে শেষ হওয়ার মুহূর্তে বইটির একটি পরিমার্জিত ও সংশোধিত সংস্করণ যা এয়োকেনিং পাবলিকেশনস, যুক্তরাজ্য প্রকাশ করে তা আমাদের হস্তগত হয়। ফলে বাংলা অনুবাদের পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন দেখা দেয়। জনাব সানাউল্লাহ আখুঞ্জী তার নানাবিধ ব্যস্ততার কারণে এর পুনর্বিন্যাস, পরিমার্জন ও সংশোধনের জন্য সময় দিতে অপারগ হওয়ায় প্রকাশককেই বইটির পুনর্বিন্যাস ও সম্পাদনার কঠিন কাজটি গ্রহণ করতে হয়। আমাকে এ কাজে সহায়তা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শফিক চৌধুরী ও কবি ওমর বিশ্বাস। উল্লেখ করা প্রয়োজন, এরপরও যদি বাংলা অনুবাদে কোনো ভুলত্রুটি থেকে থাকে তাহলে তার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বইয়ের সম্পাদক ও প্রকাশকের।

কেননা, সংশোধিত ইংরেজি অনুবাদের সাথে সাযুজ্য বজায় রেখে বাংলা অনুবাদ সাজানো হয়েছে যা জনাব সানাউল্লাহ শারীরিক অসুস্থতার জন্য দেখে দিতে পারেননি। এখানে পবিত্র কোরআনের আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা কোনো প্রকাশিত কোরআনের বাংলা অনুবাদের সাহায্য নেইনি। বরং আয়াতের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে ড. কারযাভীর সংশোধিত ইংরেজি অনুবাদের বই থেকে। যে কারণে আমরা "কোট" "আনকোট" চিহ্ন ব্যবহার করিনি। একথা হাদিসের অনুবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জনাব শফিক চৌধুরী বইয়ের প্রারম্ভিক কথা, ইংরেজি সংস্করণের সম্পাদকের কথা ও লেখকের মুখবন্ধ অনুবাদ করেছেন। কবি ওমর বিশ্বাস অনুবাদ করেছেন লেখক পরিচিতি ও প্রকাশকের কথা ।

বিশিষ্ট গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান কায়রো থেকে প্রকাশিত বইটি সরবরাহ করেন–যে কারণে আমরা বইটির অনুবাদের কাজে হাত দিতে সক্ষম হই। জনাব শাহ্ আবদুল হান্নান যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত বইটির সংশোধিত সংস্করণ আমাদেরকে দেন। ফলে বইটির পরিমার্জন, সংশোধন ও পুনর্বিন্যাস করা সহজ হয়। আমরা তাদের উভয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমাদের অনুরোধে WebmasterE@islam-online.net ড. কারযাভীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠায়। এজন্য আমরা ওয়েবসাইট www.islamonline.net এর কাছেও কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জনাব শফিক চৌধুরী ও কবি ওমর বিশ্বাসকে বইটি পুনর্বিন্যাস ও সম্পাদনার কাজে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহায়তার জন্য। কবি ওমর বিশ্বাস ভালোবাসার স্বাক্ষর হিসেবে বইটির প্রুফ দেখে দেয়ার মতো কষ্টকর কাজটি করেন। উল্লেখ্য বইটির বানান রীতির ক্ষেত্রে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া যথাসম্ভব বাংলা একাডেমীর 'বাংলা বানান-অভিধান' অনুসরণ করা হয়েছে। স্নেহাস্পদ আহমদ হোসেন মানিক বইয়ের জন্য মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। সর্বোপরি জনাব সানাউল্লাহ আখুঞ্জী বইটির একটি সুন্দর অনুবাদ উপহার দেন। আমি তাদের সকলের কাছে ঋণী।

১৯৯৫ সালের মে মাসে ইসলামিক ইনফরমেশন ব্যুরো বাংলাদেশ ড. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী রচিত গ্রন্থ জ্ঞান ঃ ইসলামী রূপায়ণ প্রকাশ করে। আমার বিশিষ্ট বন্ধু মাহবুবুল হক আমার অনুরোধে এ বইটি অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। বইটি অনুবাদের ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য। ড. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকীর এ অনবদ্য বইটি প্রকাশের সুযোগ দেয়ার জন্য আমি জনাব মাহবুবুল হকের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। স্নেহাস্পদ আতা সরকার সার্বিক প্রকাশনা তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে এ বইটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। আমি দেরিতে হলেও তাদের কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

শাহ্ আবদুল হালিম
চেয়ারম্যান
ইসলামিক ইনফরমেশন ব্যুরো বাংলাদেশ

প্রারম্ভিক কথা

তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল যুবক হাসান আল বান্না তার মাতৃভাষা ইংরেজিতে 'প্রাইওরিটিস অব দি ইসলামিক মুভমেন্ট ইন দি কামিং ফেস' বইটির সংশোধিত অনুবাদের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছেন। এ বইটির ইংরেজি অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে ঃ

১. সমসাময়িক ফিকাহ্

শিক্ষিত মুসলিম যুবকদের জন্য সমসাময়িক কালের ফিকাহ্ প্রয়োজন, বিশেষত যারা পাশ্চাত্যে বাস করে। তাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন দিক নির্দেশনা গ্রহণ করছেন। এর মধ্যে রয়েছে উগ্রবাদিতা, ফেতনা বা বিভ্রান্তিকর মতবাদ, অপরকে কাফের সাব্যস্ত করার প্রবণতা ও অনমনীয় মনোভাব। তারা অন্য মুসলমানদের প্রতি রূঢ় আচরণ করে। যে দেশে বসবাস করে সেখানকার লোকদের প্রতি শত্রুতাভাব প্রদর্শন করে। যদিও তারা সেখানে দুর্বল সংখ্যালঘু। তারা নিজ মাতৃভূমি থেকে পরিত্যক্ত। তাদের অনেকেই স্বদেশ থেকে বিতাড়িত। এমন কি তাদের স্বদেশের সরকার পশ্চিমাদেশের সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছে। অথচ পশ্চিমা সরকার এদের আশ্রয় দেয়ার পাশাপাশি নানারকম সমাজকল্যাণমূলক সুবিধা দিয়েছে। তারা সেখানে শিক্ষা, ব্যবসা, মসজিদ নির্মাণ, সামাজিক কেন্দ্র ও স্কুল নির্মাণের সুযোগ লাভ করেছে।

যারা তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন সে সব লোকের প্রতি এধরনের লোকদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আল–কোরআনে বর্ণিত হয়েছে সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কি হতে পারে (সূরা আর রাহমান ঃ ৬০)। এধরনের কথা হাদিসেও উল্লেখিত হয়েছে ঃ যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা দেখায় না। এর পরিবর্তে তারা মুসলিম দেশগুলোতে রচিত সেই সব সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়, যে সব দেশে কয়েক শতাব্দী ধরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যখন পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি দেখা যায়, তখন পণ্ডিত ও ইসলাম প্রচারকরা কঠোর সমালোচনা ও নিন্দনীয় ভাষায় তাদেরকে বিরোধিতা করেন এবং নির্ভেজাল মূলে ফিরতে আহ্বান জানান।

এ ধরনের আহ্বান ও বই-পুস্তক, সেই সব মুসলিম দেশ থেকে আমদানী করা হয়, যেখানে পণ্ডিত ও দ্বীনের প্রচারকরা স্বৈরশাসক ও একনায়ক শাসকের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে এক আতঙ্কজনক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। এটি জন্ম দিয়েছিল এক ভারসাম্যহীন ইসলামী চিন্তাধারার যার ভিত্তি ছিল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা, কাউকে কাফের বলা। এমন কি শাসক ও সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা এবং যে কোনো ধরনের সংলাপের আহ্বান

বা স্বাধীনতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করা। এসব সাহিত্য তাদের মূল পরিবেশ থেকে পাশ্চাত্যে আমদানি করা হয়। এ ক্ষেত্রে ফিকাহর মৌলনীতি কোনোভাবেই বিবেচনা করা হয়নি–আর তা হচ্ছে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ফতোয়া পরিবর্তনশীল। মুসলমানদের বর্তমান দুর্বলতর অবস্থানের কথাও বিবেচনা করা হয়নি।

সারা বিশ্ব যখন তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছিল, তখন যে সব সরকার দাওয়াতি কাজ চালাতে ও দ্বীন প্রচারকদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং স্বাধীনতা ও মর্যাদা প্রদান করছে–তখন সে সরকারগুলোর সঙ্গে বৈরিতা সৃষ্টির পিছনে কি প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্য থাকতে পারে? ইসলামী রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যখন মুসলিম সরকারগুলো ব্যর্থ হয়েছে তখন সে দায়িত্ব পাশ্চাত্যে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের উপর চাপিয়ে দেয়ার কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে যারা বর্ণবাদের হুমকির সম্মুখীন। বিভিন্ন মুসলিম গ্রুপের মধ্যে বিভেদে এ সংখ্যালঘুদের জড়িয়ে কি উপকার হবে যখন এ মতপার্থক্যের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। আর উম্মাহর পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো বিশেষ মুসলিম গ্রুপকে কাফের অভিহিত করা সম্পর্কে কখনই কোনো ঐকমত্য ছিল না।

উপরোল্লিখিত অজ্ঞতার সৃষ্ট বিষয়গুলোর কোনো ব্যাখ্যা নেই। এসবের একটি দীর্ঘ বিবরণ ড. কারযাভী তার বইয়ে দিয়েছেন এবং অগ্রাধিকারের ফিকাহ, ভারসাম্যের ফিকাহ ও বাস্তবতার ফিকাহর রূপরেখা তুলে ধরেছেন।

২. কর্মবাদ ফিকাহ

ইসলামী চিন্তার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত হচ্ছে এ বইটি–যদিও ড. কারযাভী এর উপাদান পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ, খোলাফায়ে রাশেদীনের ঐতিহ্য, ফিকাহর পণ্ডিত এবং ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক সংস্কারকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন।

তা সত্ত্বেও একথা সত্য ড. কারযাভীর পূর্বে আর কেউই সাফল্যের সঙ্গে সকল আহরিত বিষয়কে বিন্যাসের মাধ্যমে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে পারেননি। তিনি আমাদের বর্তমান সমস্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে তার সমাধানও বের করেছেন। এগুলো তিনি করেছেন নিখুঁত ব্যাখ্যা, যৌক্তিক ও জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

শায়খ মুহাম্মদ আল গাজালীর পাশাপাশি এ বইটি ড. কারযাভীর একটি কঠোর প্রচেষ্টার ফসল। তিনি এ বইতে সমসাময়িক কালের ইসলামী আন্দোলনের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করেছেন। এতে তিনি আন্দোলনের ব্যাধির মূল কারণ উদঘাটন ও তা সমাধানের পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। এ বিষয়গুলো তিনি তার বিভিন্ন বইতেও আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে - 'দি ফেনমেনন অফ এক্সট্রিমিজম ইন তাকফির' 'ইসলামিক এয়োকেনিং বিটুইন রিজেকশন এন্ড এক্সট্রিমিজম' এবং 'হোয়্যার ইজ দি রং'।

এছাড়াও এ বইটিতে বিকল্প ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতির রূপরেখা দেয়া হয়েছে। অপরদিকে এর আগের বইগুলোতে ব্যাপক বিশ্লেষণ, সমালোচনা ও মূল্যায়নের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। নতুন ধরনের উসূল বা মৌলিক নীতি, ইসলামে কর্মবাদ

ফিকাহ, বাস্তব অভিজ্ঞতার ফিকাহ, ধর্মীয় ফিকাহর প্রয়োজন ও তা বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন ও প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে তার অবদান প্রশংসনীয়।

বস্তুত ইসলামের বর্তমান অবস্থার জন্য ইসলামী সাহিত্যের অভাব একটি অন্যতম প্রধান কারণ। ইসলামী দাওয়াত সম্পর্কিত বহু সাহিত্য রচিত হয়েছে যেগুলো অবাস্তব যুক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ, যা সমসাময়িক সমস্যা ও স্থানের প্রকৃতির সাথে সম্পর্কহীন। পূর্বসূরিরা আমাদের জন্য যা রেখে গেছেন তাই শেষ কথা। এর উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও নবায়নের কোনো সুযোগ নেই। বিভিন্ন ইসলামী পরিবেশ থেকে নেয়া চিন্তা ও আচরণ পাশ্চাত্যের ইসলামী সার্কেলেও একই ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এর ফলে কোনটি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় এবং কোনটি অনির্দিষ্ট ও পরিবর্তনীয় সে সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আর এসব অহেতুক তর্ক কোনো কল্যাণ বয়ে আনেনি। এসব বিভ্রান্তি সংশোধন করাই এ বইটির উদ্দেশ্য যাতে দেখানো হয়েছে যে ইসলাম ও তার ঐতিহ্য যুক্তিসঙ্গতভাবে বাস্তবমুখী পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবতাকে মোকাবিলা, উপলব্ধি ও পরিবর্তন করে।

৩. লেখকের পাণ্ডিত্য

সমসাময়িক কালের বুদ্ধিবৃত্তিক ইসলামিক চিন্তা-চেতনা ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হিসেবে ড. ইউসুফ আল কারযাভীর নাম উচ্চারণ করলে অত্যুক্তি করা হবে না। এর কারণ হচ্ছে ঃ

ক. তার মধ্যপন্থী পদ্ধতি এবং আধুনিক ও ভারসাম্যপূর্ণ আবেদন। কোনো বিশেষ মাজহাবের অন্ধ অনুকরণ ও অন্যান্য সকল মাজহাবকে খারিজ করা এবং কোনো মাজহাবকেই না মানা এ দু'য়ের মধ্যে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। একই সঙ্গে পথভ্রষ্ট ও নব উদ্ভাবিত তাসাউফপন্থী সুফিবাদ ও সত্য পথে চালিত তাসাউফপন্থীদের বিরোধিতাকারী, প্রত্যাদেশের বিরোধী হলেও যুক্তি দ্বারা পরিচালিত ও যারা প্রত্যাদেশকে বোঝার ক্ষেত্রে যুক্তির ভূমিকার বিরোধিতা করে–এসব ক্ষেত্রে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। আর বাস্তবে মধ্যপন্থার মাজহাব উম্মাহর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে যেখানে সর্বপ্রকার উগ্রপন্থা গুরুত্ব হারায়।

খ. ইসলাম সম্পর্কে তার সুবিস্তৃত ও ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে। তিনি তার বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানকে একটি ক্ষেত্রেই শুধু সীমাবদ্ধ করে রাখেননি। তিনি যেমন লিখেছেন আকিদাহ্ সম্পর্কে, তেমনিভাবে লিখেছেন ইবাদাতের ফিকাহ অথবা বাস্তবতার ফিকাহ সম্পর্কে। তিনি শুধু এসব ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও লিখছেন। তিনি কোরআন ও সুন্নাহর ফিকাহ এবং বাস্তবতা ও তার প্রয়োগের ফিকাহ সম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তিনি ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখিত শ্রেষ্ঠ স্কলারদের পথ থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি কোরআন ও সুন্নাহ - এ দু'টি সূত্রের ওপর গুরুত্বারোপ করেন, সকল বিষয়কে কোরআন ও সুন্নাহর মাপকাঠিতে বিচার-বিশ্লেষণ করেন এবং তার বিরোধী হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি কোনো মাজহাবের অন্ধ অনুকরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন, তবে

সমৃদ্ধ ইসলামী ঐতিহ্য বাতিল করার পক্ষেও নন। তার বক্তব্য ও উপদেশ খুবই সুস্পষ্ট। তার হৃদয় আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসায় পূর্ণ। তিনি ইবনে আল কাইয়েমের মতো সালাফি, সুফি স্কলার ইমাম আল শাফির মতো একজন বড় লেখক ও কবি এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতো সমসাময়িক বিষয়ের উপর একজন ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন পণ্ডিত।

গ. তার অগাধ বিশ্বাস যে ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম বিশ্বাস নয় বরং এটি একটি অপরিহার্য কাঠামো, সংগঠন, আন্দোলন ও সংগ্রাম–যা তাকে একজন যুবক হিসেবে সংযুক্ত করেছিল সমসাময়িক কালের বৃহৎ ও প্রাচীনতম ইসলামী আন্দোলন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সঙ্গে। আন্দোলনের জন্য তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় এবং তিনি কারাভোগ করেন। আল্লাহর রহমতে কারাভোগের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি চরম ধৈর্যের পরিচয় দেন।

তা সত্ত্বেও তিনি তার ইসলামী মিশনের ঝাণ্ডা নিয়ে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য ভ্রমণ করেছেন, যদিও তার বয়স এখন ৭০ এর ওপর। আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুণ। তাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন। সারা বিশ্বব্যাপী তার এ সফরই তাকে সমসাময়িক কালের মুসলিম চিন্তাবিদ, মুসলিম জনগণ, মুসলিম যুব আন্দোলন এবং তাদের সঙ্গী-সাথিদের সাথে সুপরিচিত ও ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে।

তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক ফতোয়া কাউন্সিলের প্রধান। একই সময়ে তিনি সমসাময়িক কালের বহু ফিকাহ কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং সক্রিয়ভাবে এদের কর্মকাণ্ডে জড়িত। তিনি নিজে মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী এবং সমসাময়িক ইসলামী চিন্তার ক্ষেত্রে মুক্তচিন্তার অনুশীলনের আহ্বান জানান। বিভিন্ন ফোরাম--ইসলামিক-সেক্যুলার, মুসলিম-ক্রিশ্চিয়ান, আরব ন্যাশনালিস্ট-ইসলামিক ইনস্টিটিউটে বিতর্ক ও আন্তঃমাজহাব সংলাপে অংশগ্রহণ করে তিনি ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

বস্তুত তরুণ হাসান আল বান্নার অনুবাদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তিনি ইংরেজি ভাষাভাষী পাঠকের কাছে ড. কারযাভীকে উপস্থাপন করেছেন।

পাশ্চাত্যে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এ বিরাট অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে আল্লাহ প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভীকে এবং ইংরেজিতে ভাষান্তরের জন্য এস এম হাসান আল বান্নাকে পুরস্কৃত করুন। আমিন।

শায়খ রাশিদ ঘানুসী
সভাপতি
আন নাহদা পার্টি তিউনিসিয়া
এপ্রিল ২০০০

ইংরেজি সংস্করণের সম্পাদকের কথা

দুর্ভাগ্য, বিংশ শতাব্দী ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখতে পায়নি। তা সত্ত্বেও এটি নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইসলামী পুনর্জাগরণ ও পুনরুত্থান ঘটার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের বিশেষত শিক্ষিত ও যুবকদের মধ্যে এ জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে যে ইসলাম একটি ব্যাপক জীবন ব্যবস্থা যা মানুষকে ইহজীবন ও পারলৌকিক জীবনে সত্যিকার অর্থে সুখের পথ প্রদর্শন করবে।

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি এমনি যে তাকে ভেতর ও বাইরের অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। আজ ইসলামী সভ্যতা এবং এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অন্যান্য বিষয় ক্ষয়িষ্ণুতার সম্মুখীন। যার ফলে বহু ব্যাধি ও সমস্যা দেখা দিয়েছে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা–এটি উপলব্ধির ক্ষেত্রে ব্যর্থতা আজ মুসলিম মননের একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের লোক মনে করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সঙ্গে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে খাপ খেয়ে চলতে পারে। অপরদিকে রয়েছে তারা যারা ইসলামী দাওয়াতের কাজের ব্যাপারে একান্তই আন্তরিক, কিন্তু ইসলামকে বোঝার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা চরমপন্থী–না হয় উন্নাসিক। ব্যাপক সমস্যার জন্য ব্যাপক সমাধান প্রয়োজন–অনেকে এটিও বুঝতে পারেন না। অন্যদের অবস্থা এ রকম যে তাদের রয়েছে উচ্চ আশা ও অত্যুচ্চ উদ্দেশ্য। কিন্তু যারা এ আশা ও স্বপ্ন উপলব্ধি করতে পারেন সে রকম মেধা তাদের নেই।

এছাড়াও অনেক ইসলামী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে বর্তমান অবস্থার দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেই কাঙ্ক্ষিত সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে যেখানে সামগ্রিকভাবে আল্লাহই একমাত্র উপাস্য হতে পারেন। দেখা যায় এধরনের আন্দোলন প্রাথমিকভাবে বিকশিত হয় এবং জনগণের ব্যাপক আস্থা লাভ করে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তা স্থবির অবস্থায় পতিত হয়। সে সময়ই এখন আমরা অতিক্রম করছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, মুসলিম উম্মাহ যে সকল ত্রুটি ও সমস্যা দ্বারা জর্জরিত–ইসলামী আন্দোলনও সেই সকল ত্রুটি ও সমস্যা দ্বারা সংক্রমিত।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে–আমরা কোথা থেকে শুরু করব? আমাদের ঘাটতি কিসে? আমাদের কি করা উচিত? কিভাবে করা উচিত? আমরা কি সুস্পষ্টভাবে দাওয়াত, আন্দোলন (হারাকাহ) ও সংস্কারের (ইসলাহ) প্রকৃতি বুঝতে পেরেছি? কোন পদ্ধতি আমাদের প্রয়োগ করা উচিত? সমাজের বিভিন্ন অংশের সাথে আমরা কিভাবে আচরণ করব? ইসলামী আন্দোলনের অগ্রাধিকারসমূহ কি কি? এসব প্রশ্ন সামনে রেখে প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী এ বইটি লিখেছিলেন।

ফিকাহ্ শাস্ত্রে যে কয়েক জন বিজ্ঞ পণ্ডিত জীবিত আছেন আল্লাহর রহমতে তাদের মধ্যে ড. কারযাভী একজন। তিনি নতুন যারা আধুনিকতার প্রতিনিধিত্বকারী ও পুরাতন যারা ঐতিহ্যবাদীর প্রতিনিধিত্বকারী এর উভয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ আধুনিক সিদ্ধান্ত এবং অভিমত পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও সমৃদ্ধ জ্ঞান উম্মাহর কল্যাণ বয়ে এনেছে।

ড. কারযাভী ইসলামী আন্দোলনের সমস্যা, সম্ভাবনা ও অগ্রযাত্রা নিয়ে সব সময় চিন্তাভাবনা করেন। তিনি আন্দোলনের কোনো বিষয়ে উপদেশ বা নির্দেশ দিতে নিজেকে সক্ষম মনে করলে তা নির্দ্বিধায় দেন।

ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা থেকেই এ গ্রন্থটির জন্ম। এ গ্রন্থ থেকে শুধুমাত্র পরামর্শই নয় নির্দেশনাও নেয়া উচিত। কেননা আমরা এমন এক সময়ের মধ্যে বসবাস করছি যেখানে প্রত্যেকেরই বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিই দিক নির্দেশনা দেয়ার যোগ্যতা রাখেন।

মূল বইটি আরবি ভাষায় লিখিত। এর দশটি সংস্করণও ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। বইটি প্রকাশের কয়েক মাস পরই এর একটি প্রাথমিক ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তা ছিল অপূর্ণাঙ্গ। ফলে এর একটি সংশোধিত ইংরেজি অনুবাদের প্রয়োজন অনুভূত হয়-যা মূল আরবি গ্রন্থের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর কাছাকাছি।

এ নতুন ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকা লিখে দিতে সম্মত হওয়ার জন্য আমি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শায়খ রাশিদ ঘানুসীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ড. কামাল হিলবাবি মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন-আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। ইউসরা ঘানুসী ভূমিকার অনুবাদসহ বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। এ সহযোগিতার জন্য আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করুন। এছাড়াও ওয়ালী, উমর, নাদীম, বারা, সাহেরা ও অন্যান্য অনেকের সহযোগিতার ফলেই বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের সকলকেই পুরস্কৃত করুন।

পরিশেষে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হাফিজ আবদুল কাদিরসহ অন্যান্য শিক্ষক যারা আমাকে কোরআনের ভাষা শিখিয়েছিলেন তাদেরকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য আস্বাদন করা যায় কেবল আরবি ভাষার মাধ্যমেই।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) নির্দেশিত পথে ও আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ আমাদের সকলকেই এ পৃথিবীতে অবিচল রাখুন।

এস এম হাসান আল বান্না
লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
এপ্রিল ২০০০

লেখকের মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্যই, যাঁর করুণায় সকল সৎকর্ম ফলপ্রসূ হয় এবং তাঁর প্রেরিত নবী, তাঁর পরিবার ও অনুসারীদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

এটি আমার সৌভাগ্য যে বিগত ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসের শীতকালে উত্তর আমেরিকার আরব মুসলিম ইয়ুথ এসোসিয়েশনের বার্ষিক কংগ্রেসে যোগ দেয়ার সময় সেখানে লেখক মোহাম্মাদ আল হাশেমী আল হামেদীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেখানেই তিনি 'সেন্টার ফর স্টাডিজ অন ইসলামিক ফিউচার'-এর প্রসঙ্গ আমার কাছে উত্থাপন করেছিলেন। এটি একদল মুসলিম চিন্তাবিদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। সেন্টারটির প্রতি সহযোগিতা ও সমর্থন দেয়ার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করেন।

তিনি সেন্টারের উদ্যোগে এমন সব ইস্যু নিয়ে একটি সিম্পোজিয়াম আয়োজনের ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলেন যার সঙ্গে ইসলামের ভবিষ্যত কল্যাণ অকল্যাণ জড়িত এবং এর আলোচ্য বিষয় ও আলোচকদের নামও উল্লেখ করেন। এ ব্যাপারে আমার অভিমত জানতে চাইলে সেন্টার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানিয়ে আমার সাধ্যমত পরামর্শ দেই। তা সত্ত্বেও এ উদ্যোগে আমার সক্রিয় অংশগ্রহণের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার তিনি চাচ্ছিলেন। তার প্রস্তাবকে আমার কাছে আরো হৃদয়গ্রাহী করার জন্য তিনি বললেন, আমরা এমন একটি দেশে সিম্পোজিয়াম করব যে দেশটি আপনি পছন্দ করেন– আর সে দেশটি হচ্ছে আলজেরিয়া। তিনি আমাকে সিম্পোজিয়ামের জন্য আগামী তিন দশকে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রাধিকার বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করার অনুরোধ জানান। ইসলামী আন্দোলনের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে আমার চিন্তাভাবনার প্রতি আগ্রহ দেখে তিনি এ বিষয়টি নির্ধারণ করে দেন। আমি ফিকাহর এ শাখায় আমার ধ্যানধারণা কেন্দ্রীভূত করেছি। এ ব্যাপারে অনেক আলাপ আলোচনাও করেছি। ইসলামী আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা এবং ইসলামী পুনর্জাগরণের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে এটি আমার আগ্রহেরই বিষয়। এটি এমন তাৎপর্যপূর্ণ যে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে বিষয়টি যেন যথার্থভাবে তুলে ধরতে পারি সে জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। পরিস্থিতি এমনই ছিল যে সিম্পোজিয়ামের আয়োজকদের দাওয়াত কবুল করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। আলোচ্য বিষয়, আমন্ত্রণকারী ব্যক্তি, অংশগ্রহণকারীগণ এবং অনুষ্ঠানের স্থান॥এসব উপাদান আমাকে কেবল অনুপ্রাণিতই করেনি বরং দাওয়াত কবুলে বাধ্য করেছে।

সে সময়ে আমাকে বারবার সফর করতে হয়। যার ফলে আমার চিন্তা ও গবেষণাকর্মে বিঘ্ন ঘটে। আমি আল্লাহর সাহায্য কামনা করে নিবন্ধটি রচনায় মনোনিবেশ করি।

সেই গবেষণাকর্মের ফসল আমার এ বই। আমি আশা করি এতে যে আলোকরশ্মি রয়েছে তা ক্ষীণ হতে পারে কিন্তু তাই আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাবে। তবে এটিই যথেষ্ট যে বিষয়টি আমরা গবেষণা ও আলোচনার পর্যায়ে তুলে আনতে পেরেছি। যদি তা নাও হয় অন্ততঃপক্ষে তা প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। আমি এখানে যা কিছু লিখেছি তা বিশেষভাবে ইসলামী আন্দোলন এবং সাধারণভাবে ইসলামী পুনর্জাগরণ সম্পর্কে আমার ইতিপূর্বের বই-পুস্তক, প্রবন্ধ-নিবন্ধসহ বিভিন্ন রচনারই সংযোজন ও ধারাবাহিকতা।

আন্দোলন ও পুনর্জাগরণের মধ্যে তফাত হচ্ছে, একটি আন্দোলন কোনো সংগঠিত গ্রুপ বা গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করে যাদের সুস্পষ্ট কর্মপন্থাসহ নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। আর পুনর্জাগরণ হচ্ছে ব্যক্তি ও সমষ্টি এবং সংগঠিত অথবা অসংগঠিত উভয়কে পরিবেষ্টন করে এক সর্বব্যাপী স্রোতধারা। পুনর্জাগরণ এমন এক জোয়ার যা আন্দোলনকে বলীয়ান ও শাণিত করে। অন্যদিকে আন্দোলন এক পাথেয় যা পুনর্জাগরণকে সঠিক পথে পরিচালনার দিক নির্দেশনা দেয়। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন যুক্তিবাদীরা বলে থাকেন যে নিরঙ্কুশ সার্বজনীনতা এবসলিউট জেনার‍্যালিটি এবং নিরঙ্কুশ বিশিষ্টতা এবসলিউট পার্টিকুলারিটি– এ দু'টির মধ্যে তা বিদ্যমান রয়েছে। সকল আন্দোলনই হচ্ছে পুনর্জাগরণ। কিন্তু সকল পুনর্জাগরণই আন্দোলন নয়। সেহেতু আন্দোলনের চেয়ে পুনর্জাগরণ তার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে অধিকতর ব্যাপক ও বিস্তৃত।

এ ক্ষেত্রে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি যখনই ইসলামী আন্দোলনের কথা বলি তখন তা সর্বাত্মক ইসলামী আন্দোলনকে বুঝিয়ে থাকি। কোনো বিশেষ ধরনের সংগঠন বা আন্দোলনকে নয়। অবশ্য উদাহরণ হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কথাই উল্লেখ করব। কারণ এ আন্দোলনের মধ্যেই আমি নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছি। এ আন্দোলনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এবং প্রায় অর্ধশতাধিক কালের ঘটনা প্রবাহ প্রত্যক্ষ করেছি।

আমি এ বইয়ের জন্য 'প্রাইওরিটিস অব দি ইসলামিক মুভমেন্ট ইন দি কামিং ফেস' নামটি বেছে নিয়েছি। অনুরোধ মাফিক আলোচনার বিষয়বস্তু তিন দশকের মধ্যে সীমিত রাখিনি। এ দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগে আমি এরূপ সীমিত মেয়াদভিত্তিক আলোচনার কোনো কারণ খুঁজে পাই না।

প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী
দোহা, কাতার।
এপ্রিল ১৯৯০

সূচিপত্র

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলন : রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলন

ভূমিকা

ইসলামী আন্দোলনের সংজ্ঞা

ইসলামী আন্দোলন বলতে বোঝায় জনগণের দ্বারা সংগঠিত সামষ্টিক প্রচেষ্টা যা সমাজের **নেতৃত্বে তথা জীবনের** সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে চালিকা শক্তি হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা **করতে চায়।**

সব কিছুর আগে ইসলামী আন্দোলন হচ্ছে এক কর্মতৎপরতা, নিরন্তর কঠোর কর্মপ্রচেষ্টা। এ কাজ কেবল কথার ফুলঝুরি আর বক্তৃতা-বিবৃতি বা বইপত্র লেখাই নয়। এসবের দরকার অবশ্যই আছে, তবে তা আন্দোলনের অংশ মাত্র–নিজেই আন্দোলন নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা বলেছেন ঃ এবং বলুন (হে মুহাম্মদ) তোমরা আমল করে যাও, আর আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদাররা তোমাদের আমলকে দেখে নেবেন (সূরা তাওবা ঃ ১০৫)।

আন্দোলন হচ্ছে জনগণের কর্মপ্রচেষ্টা

ব্যাপক জনগণের বিশেষত মানুষের স্ব-উদ্যোগ ও গভীর বিশ্বাসভিত্তিক সম্পাদিত কর্মপ্রচেষ্টাই হচ্ছে ইসলামী আন্দোলন। ঈমানই হচ্ছে এ কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তি এবং কোনো মানুষের কাছ থেকে নয়, কেবল আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার আশায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই এ কাজ সম্পাদন করা হয়। ইসলামী পুনর্জাগরণ সম্বন্ধে যখন কোনো মুসলমান সচেতন হয়, তখন সে নিজের মধ্যে আত্মপ্রেরণা, চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা অনুভব করে। একজন মুসলমান একদিকে যখন তার ঈমান এবং অন্যদিকে তার পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার মধ্যে অসঙ্গতি দেখতে পায় তখনি তার মনের গভীরে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। আর এ ধরনের এক মানসিক অস্থিরতা থেকেই তার মধ্যে সূত্রপাত হয় স্ব-উদ্যোগের।

এ উপলব্ধির প্রেক্ষিতে দ্বীনের প্রতি তার ভালোবাসা, আল্লাহ, তার রাসূল ও কোরআনের প্রতি ঈমান, মুসলিম উম্মাহর প্রতি তার দরদ এবং কর্তব্য পালনে তার নিজের এবং স্বজাতির ঔদাসীন্যে ব্যথিত হয়ে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে সে গভীর আগ্রহে কর্তব্য পালন, দুর্বলতার মূলোচ্ছেদ, আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপেক্ষিত ফরজ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় অবদান, কোরআনের ছায়াতলে মুসলিম উম্মাহর একত্রীকরণ, আল্লাহর বন্ধুদের প্রতি সমর্থন, আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই, সকল আগ্রাসন অথবা অমুসলিম নিয়ন্ত্রণ থেকে মুসলিম ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার, শরীয়াহর দাবি অনুযায়ী নতুন করে খেলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ইসলামের দাওয়াত প্রচারের আবশ্যিক কর্তব্য পালনে নব অঙ্গীকার, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ এবং কথায়, কাজে অথবা কমপক্ষে মনে মনে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার

জন্য উদ্বুদ্ধ হয়, জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর কালাম যাতে সবার উপর সমুন্নত হয় সে লক্ষ্যে সে এসব সংগ্রামে ব্রতী হয়।

সরকারী কাজের অপর্যাপ্ততা

বস্তুত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে পরিচালিত কর্মতৎপরতার মাধ্যমেই ইসলামী আন্দোলন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সরকারী বা আধাসরকারী কাজ তথা ইসলামী কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে বোর্ড গঠন, উচ্চ পরিষদ, সমিতি অথবা ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা অথবা যে কোনো সরকারী সংস্থা গঠন করে ইসলামের স্বার্থে জোরদারভাবে কাজ করা নির্ভর করছে এসব কাজে সরকারী সংস্থায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের আগ্রহ ও উৎসাহের ওপর। তারা এবং তাদেরকে যারা এসব পদে নিয়োগ করেন উভয়ের পার্থিব জীবনের প্রতি আকর্ষণের চেয়ে দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা কতটুকু তার উপরেও ইসলামী কাজের ফলাফল নির্ভর করে।

যাহোক, এসব সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সব সময় নানা দিক দিয়ে অপর্যাপ্ত ও ত্রুটিপূর্ণ। যেমন ঃ

১. রাষ্ট্রীয় নীতির গণ্ডির মধ্যেই নিজস্ব এসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কেননা সরকারই এসব চালু করে এবং অর্থ যোগান দেয়। সংশ্লিষ্ট নীতির প্রতি অনুগত থাকার ফলে এ সংস্থা তাদের ইচ্ছে ও পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে পারে না। সেজন্য ঐ বিশেষ রাষ্ট্রের স্বার্থ যতটা তারা তুলে ধরে, ইসলাম এবং বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের ততটুকু তারা প্রতিনিধিত্ব করে না।

২. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব প্রতিষ্ঠান পরীক্ষিত লোক দিয়ে চালানো হয় না, যারা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে এবং প্রত্যক্ষ ময়দানে পরীক্ষিত হয়েছে। বরং সে সব লোক দিয়ে চালানো হয়, যারা রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের সমর্থক। আর এ ধরনের লোকেরা তাদের লালসা চরিতার্থ করতে অথবা ভীতির দরুন রাষ্ট্রযন্ত্রকে তোষামোদে লিপ্ত হয়। এ ধরনের লোক রাষ্ট্রের নির্দেশ অমান্যও করতে পারে না, আবার কোনো ব্যাপারে 'কেন' অথবা 'না' বলারও ক্ষমতা রাখে না, এদের অধিকাংশই এমন চরিত্রের হয়ে থাকে। অন্যদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছেন যারা বেসরকারী ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের চেয়েও ভালোভাবে কাজ করে থাকেন। কারণ আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, দ্বীনের প্রতি তাদের অনুরাগ এবং সঠিক পন্থায় দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রাণপণ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের সেবায় নিজেদের নিবেদিত করেন।

৩. অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের স্বার্থরক্ষায় সত্যিকার আন্তরিকতারও অভাব থাকে। এমন কি এসব কাজ পুরোপুরি রাজনৈতিক মতলব অর্জনের জন্যেও চালানো হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব কাজ কোরআনে উল্লেখিত 'ফিতনার মসজিদ'-এর অনুরূপ যার

বাহ্যিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ইবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়ার চর্চা। কিন্তু এর গোপন অভিসন্ধি হচ্ছে ঈমানদারদের মধ্যে বিভেদ এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের তৎপরতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

৪. এসব কারণেই সরকারের ইসলাম বিষয়ক কর্মসূচি জনগণের পক্ষ থেকে অভিযোগের সম্মুখীন হয়। ফলে এসব কর্মসূচি জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন থেকে হয় বঞ্চিত। এমন কি যেসব সরকারী আলেম রাষ্ট্রীয় নীতির রূপায়ণে নিজেদের নিয়োজিত করেন। তারা জনগণের সমর্থন বঞ্চিত হয়। তারা রাষ্ট্রের চাহিদামত কথা বলে এবং রাষ্ট্রীয় নির্দেশে নীরব থাকে। তাই তারা জনগণের আস্থা হারায়। জনগণ তাদেরকে 'সরকারী আলেম' অথবা 'পুলিশের এজেন্ট' হিসেবে আখ্যা দেয়।

এসব কারণে ইসলামী শাসনের অনুপস্থিতিতে সরকারী ও আধাসরকারী ইসলামী কর্মসূচির ফলে একটি সত্যিকার ইসলামী আন্দোলন রূপ নিতে পারে না। আবার এসব কর্মসূচি যথাযথভাবে কাজে লাগালে বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিছু না কিছু অবদান রাখতে পারে এবং ইসলামী আন্দোলন ও এর প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন দিতে পারে। বিশেষ করে যদি সরকারী ও আধাসরকারী ইসলামী কর্মসূচিগুলো ঈমানদার ও সাহসী লোকদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

আন্দোলন হচ্ছে সামষ্টিক প্রচেষ্টা

ইসলামী আন্দোলন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হলেও তা একটি সংগঠিত ও সমবেত প্রচেষ্টা। ইসলামের স্বার্থে ব্যক্তির স্বেচ্ছা উদ্যোগে পৃথকভাবে ও বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করে যাওয়াই যথেষ্ট নয়। যদিও তাদের কর্ম ও প্রচেষ্টা কেয়ামতের হিসাব নিকাশে যোগ হবে। কারণ আল্লাহ পুরুষ বা নারী কারো কর্মফল বিনষ্ট করবেন না। প্রত্যেককে তার নিয়ত ও তার কাজের যথার্থতা বিচারের পর পুরস্কৃত করা হবে। আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ তুল্য সৎকর্ম করবে সে তা দেখতে পাবে (সূরা যিলযালা ঃ ৭)।

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতিতে ভেদাভেদের অবসান ঘটিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাই যথেষ্ট হবে না, এ জন্য অবশ্যই সমবেত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আর এটিই দ্বীনি বাধ্যবাধকতা এবং বাস্তব পরিস্থিতির দাবি।

ইসলাম সংগঠিত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার চেতনাকে উৎসাহিত করে এবং বিচ্ছিন্ন থাকার বিরোধী। সমবেত প্রচেষ্টার সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য থাকে। আর যে বিচ্ছিন্ন থাকে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। দলছুট ও বিচ্ছিন্ন মেষই নেকড়ের খপ্পরে পড়ে। তাই জামায়াত বাদ দিয়ে যদি কেউ একাকী অথবা জামায়াতের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে নামাজ আদায় করে তাহলে তার নামাজ পূর্ণাঙ্গ হয় না। একজন ঈমানদার আরেকজন ঈমানদারের কাছে পরস্পর সংযুক্ত ইটের শক্ত গাঁথুনির মতো। সৎ ও নেক কাজে সহযোগিতা করা অন্যতম

দ্বীনি ফরজ কাজ এবং পরস্পরকে সত্য ও সহিষ্ণুতার নসিহত করা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম পূর্বশর্ত।

এ কঠিন বাস্তবতায় এটিই স্বাভাবিক যে কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে হলে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। দু'হাতেই তালি বাজে, একাকীত্বেই দুর্বলতা, অনেককে নিয়ে চলার মাঝেই শক্তি। বড় বড় সাফল্য আসে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। নিশ্চয়ই ঐক্যবদ্ধ থাকলেই চূড়ান্ত যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়। আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁর রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে, যেন তারা এক নিরেট গাঁথুনির কাঠামো (সূরা সা'ফ ঃ ৪)।

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুসংগঠিত হওয়া উচিত। দায়িত্বশীল নেতৃত্ব, সুদৃঢ় ভিত ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিই বাধ্যতামূলক পরামর্শ (শূরা) এবং আনুগত্যের মূলনীতির আলোকে নেতৃত্ব ও তৃণমূল পর্যায়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেয়।

রীতিনীতি অনুসরণ করে না এমন কোনো সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে ইসলাম স্বীকার করে না। এমন কি এক সাথে জামায়াতবদ্ধ হয়ে যে নামাজ আদায় করা হয় তার ভিত্তি হচ্ছে সুসংগঠন ও শৃঙ্খলা। আল্লাহ সেই কাতারের দিকে দৃষ্টি দেবেন না যা সুশৃঙ্খল নয়। শুধু তাই নয়, কাতারগুলোও হতে হবে নিবিড়। কাতারের মুসল্লীদের মধ্যে কোনো ফাঁক থাকা চলবে না। কেননা এ ফাঁকে শয়তান অবস্থান নেয়। তাই দাড়াতে হবে কাঁধে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে। নামাযের রুকু-সিজদাহ ও বাহ্যিক রূপই চিন্তার ক্ষেত্রে ঐকমত্যের নির্দশন। 'ভেদাভেদে লিপ্ত হয়ো না যাতে তোমাদের অন্তরগুলোও ভেদাভেদে আক্রান্ত না হয়'।

এ কারণে নামাজ শুরুর আগে ইমামকে লক্ষ্য রাখতে হবে তার পেছনে কাতারগুলো সোজা হয়েছে কিনা এবং তিনি মুসল্লীদেরকে 'তাদের ভাইয়ের প্রতি সহযোগী' হওয়ার তাগিদ দেবেন। কারণ সামগ্রিকভাবে শৃঙ্খলার স্বার্থে জামায়াতে নামাজ আদায়ের সময় সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব আবশ্যক।

এরপর আসে ইমামের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্ন। ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণের জন্যই। তিনি যখন 'আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করেন তখন তাই বলতে হয়; তিনি রুকু করলে রুকুতে যেতে হয়, সিজদায় গেলে সিজদা করতে হয়। আবার তিনি যখন তেলাওয়াত করেন তখন তা শ্রবণ করতে হয়।

কেউই শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে পারে না কিংবা ইমামের আগে রুকু বা সিজদা করতে পারে না, যাতে কেউ এ সুসংগঠিত, সুসমন্বিত কাঠামোতে কোনো বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম সৃষ্টি করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ পায়। যে এরূপ করবে তার ভয় করা উচিত।

কিন্তু ইমাম যদি ভুল করেন তবে সে ভুল শোধরানো তার পেছনে কাতারবদ্ধ মুসল্লীদের জন্য কেবল সঙ্গত নয়, দায়িত্বও বটে। ইমামের সে ভুল, অনুচিত কাজ, বিস্মৃতি, কোরআন তেলাওয়াত অথবা নামাজের অন্য যে কোনো মৌলিক বিষয়ে হোক না কেন, মুসল্লীরা ইমামের ভুল ধরিয়ে দিতে পারবে। এমন কি পেছনের কাতারের মহিলা মুসল্লীরাও ইমামের ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হাতে তালি দিতে পারবে।

জামায়াতবদ্ধ সালাত ইসলামের সামগ্রিক জামায়াতী ব্যবস্থা এবং সেনাপতি ও সৈন্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি রকম হওয়া উচিত তারই এক ক্ষুদ্র রূপ। অর্থাৎ নেতৃত্ব না কখনো অভ্রান্ত হতে পারে, আর নিরঙ্কুশ ও অন্ধ আনুগত্যেরও না কোনো অবকাশ আছে।

লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের পুনরুজ্জীবন

ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য কি? সব বাধাবিঘ্ন দূর করে জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই ইসলামী আন্দোলন সূচিত হয়েছে। ইসলামের পুনরুজ্জীবন কথাটি নতুন নয়। এটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) র কথা যা আবু হুরাইরা (রা.) এক প্রামাণিক হাদিসে বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি হচ্ছে ঃ আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক শতবর্ষের শুরুতে এমন কাউকে পাঠাবেন যিনি এ দ্বীনের পুনরুজ্জীবন ঘটাবেন (আবু দাউদ ও আল হাকিম)।

এ হাদিসের অধিকাংশ ভাষ্যকার বলতে চেয়েছেন, এখানে 'যিনি' বলতে এক বিশেষ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যার দ্বারা দ্বীনের পুনরুজ্জীবন ঘটবে। তারা এ প্রসঙ্গে হিজরী শতকের শেষ দিকে ইন্তেকাল করেছেন এমন কয়েকজন প্রখ্যাত ফকিহ্ ও ইমামের নামও উল্লেখ করেছেন যারা দ্বীনের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। যেমন হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) (মৃত্যু ১০১ হিজরী), আল শাফেয়ী (র.) (মৃত্যু ২০৪ হিজরী) প্রমুখ। কিন্তু হিজরী তৃতীয় শতকের মুজাদ্দেদ কে হতে পারেন সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

হাদিসের কোনো কোনো ভাষ্যকার এ হাদিসের 'যিনি' শব্দটিকে এক বচনের মতই বহুবচন অর্থেও ধরে নেয়া যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ 'পুনরুজ্জীবনকারী' বলতে কোনো এক ব্যক্তি নয়, একটি গ্রুপকেও ধরে নেয়া যেতে পারে। ইবনে আল আসির তার 'আল জামিলিল উসূল' গ্রন্থে এটি খুবই সম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন। আল হাফিজ আল জাহাবী এবং অন্যান্যরাও এ মত সমর্থন করেন।

এর সাথে আরো বলা দরকার ইসলামের পুনরুজ্জীবনকারী গ্রুপে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের জড়িত হওয়া আবশ্যক নয়। চিন্তা ও কর্মপন্থার একটি ধারার প্রতিনিধিত্বকারী যে কেউ এ গ্রুপে যুক্ত হতে পারেন যারা দ্বীনের পুনরুজ্জীবনে একযোগে কাজ করতে আগ্রহী।

একটি শতাব্দী শেষ এবং একটি শতাব্দীর সূচনাকালে উল্লেখিত হাদিসের অনুধাবন ও প্রয়োগের এটিই সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, নতুন শতাব্দীর দিনগুলো যেন বিগত দিনগুলোর চেয়ে উত্তম হয় এবং আল্লাহ্ যেন আমাদের আগামী দিনগুলো আরো উজ্জ্বল করেন।

পুনরুজ্জীবনের কৌশল

তিন পদ্ধতিতে ইসলামী আন্দোলন পুনরুজ্জীবন আনতে সক্ষম।

প্রথম উপায় হচ্ছে, ইসলামী আন্দোলনের একটি অগ্রণী দল গঠন করতে হবে। সংহতি ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে গড়ে ওঠা এ অগ্রণী দল দক্ষতার সঙ্গে সমকালীন সমাজকে ইসলামের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। আর এটি করতে গিয়ে তারা না বিচ্ছিন্ন হবে, না ঔদাসীন্যকে প্রশ্রয় দেবে। কেবল ইসলাম নির্ধারিত নির্দেশনাবলীর দ্বারাই তারা মুসলিম সমাজের জরাগ্রস্ততার প্রতিবিধানে সক্ষম হবে। এ অগ্রবর্তী দল এমন ব্যক্তিদের নিয়েই গঠন করতে হবে যারা দৃঢ় বিশ্বাস, গভীর জ্ঞান ও সমঝদার এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তিতে হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ।

দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে জনমত সৃষ্টি করতে হবে। যেখানে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মতের প্রতিফলন ঘটবে, যে জনমত ইসলামী আন্দোলনের সার্বিক উদ্দেশ্য জেনে শুনে আন্দোলনকারীদের ঈমান ও দক্ষতার প্রতি আস্থাশীল হয়ে তাদেরকে ভালোবাসবে ও সমর্থন দিয়ে যাবে। একই সাথে এ জনগোষ্ঠী ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও তার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের কুপ্রভাব থেকেও নিজেদেরকে মুক্ত রাখবে।

তৃতীয় উপায় হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী এমন একটি আবহ সৃষ্টি করা, যাতে বিশ্বের মানুষ ইসলামের মর্মবাণী ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ অনুধাবন করে মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেবে। সেই সাথে তারা মধ্যযুগের উদ্গত ধর্মান্ধতা এবং ইসলাম বিরোধী মহলের মিথ্যাচার ও বানোয়াট বিকৃত অপপ্রচারের অপপ্রভাব থেকেও মুক্ত থাকবে। এ জনমত অন্যান্য বিশ্বশক্তির পাশাপাশি মুসলিম শক্তির অভ্যুদয়ের প্রতি সহনশীল হবে। কারণ তারা উপলব্ধি করতে পারবে, মুসলমানরা যেহেতু নিজ নিজ দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী স্বীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েমের অধিকার তাদের রয়েছে। এটি বহুল প্রশংসিত ও প্রচারিত গণতান্ত্রিক রীতিরই দাবি এবং রীতি মোতাবেক বিশ্বের অন্যতম মহৎ আদর্শ হিসেবে ইসলামের বিশ্বজনীন, মানবতাবাদী আদর্শ প্রচারের অধিকারও তাদের রয়েছে। এ আদর্শের একটি অতীত আছে, বর্তমান আছে ও ভবিষ্যত আছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে এ আদর্শের একশ কোটিরও বেশি অনুসারী রয়েছে।

ইসলামী আন্দোলনের অগ্রাধিকার

আগামীতে যে সব ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করা আবশ্যক তা ব্যাপক ও বিস্তৃত। আন্দোলনের সক্রিয় নেতা ও তাত্ত্বিকদের এসব ক্ষেত্র নিয়ে সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করা উচিত। এ ধরনের পর্যালোচনা অবশ্যই প্রমাণিত, সঠিক তথ্য এবং পরিসংখ্যান ভিত্তিক হতে হবে।

শিক্ষাক্ষেত্র

বিজয় প্রত্যাশী প্রজন্ম, মানবিক গুণে গুণান্বিত সদস্য এবং ইসলামী অগ্রণী দল গড়ে তোলার জন্য এক্ষেত্রের কাজ গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রুপের সদস্যরা জ্ঞান, কাজ, দাওয়াত ও সংগ্রামসহ ইসলামকে সম্যক রূপে অনুধাবন এবং বিশ্বাস করবে। এ প্রজন্মের প্রথম কাজ হবে স্বজাতির কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। অতপর সেই বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া। এ কাজ তাদের পক্ষে তখনই করা সম্ভব হবে যখন তারা ইসলামের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ এবং এ সম্পর্কে অন্তরে সুস্পষ্ট ধারণা লালন, আদর্শকে হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রের আচরণবিধি হিসেবে ইসলামের নৈতিকতাই তাদের পরিচালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। তারা আল্লাহর বন্দেগী ও মানুষের সঙ্গে শরীয়াহ মোতাবেক আচরণ করবে এবং অনুধাবন করবে যে ইসলামের একটি পদ্ধতি ও সভ্যতা রয়েছে যা মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থার উন্নতি ঘটাবে, আল্লাহর কালামের ভিত্তিতে মানব জাতিকে একত্রিত করবে এবং বিভ্রান্ত মানব সমাজকে সর্বোত্তম ও সঠিক দিক নির্দেশ দেবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্র

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য হবে সকল দুর্বলচিত্তের ও বিশ্বাসঘাতকদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে সাহসী ও সৎ লোকদের হাতে অর্পণ করা–যারা না নিজেরা উচ্চপদ দখল করে ক্ষমতার দাপট দেখাতে চায়, না দেশকে দুর্নীতিগ্রস্ত করতে চায়। বরং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমতায় বসালে তারা নামাজ কায়েম ও যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

সামাজিক ক্ষেত্র

সামাজিক কর্মসূচির লক্ষ্যই হবে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, রোগব্যাধি ও পাপাচার দূর করা এবং যে সব সন্দেহভাজন প্রতিষ্ঠান মুসলিম উম্মাহর পরিচিতি ও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল করার হাতিয়ার হিসেবে সামাজিক ও মানবিক কাজে লিপ্ত তাদের মোকাবিলা করা।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্র

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের কর্মসূচি সমাজকে আর্থিক দুর্গতি ও সুদভিত্তিক ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করবে এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পটভূমি তৈরি করে সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখবে।

জিহাদের ক্ষেত্র

জিহাদের লক্ষ্য হবে মুসলিম ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করা, ইসলামী দাওয়াত ও মুসলিম উম্মাহর বিরোধী শক্তির সাথে লড়াই করা, মুসলমানদের ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং মুসলমানদের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করা।

মিডিয়া ও প্রচারের ক্ষেত্র

এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের আদর্শ এমনভাবে প্রচার এবং ইসলামের শিক্ষা এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যেন এ আদর্শে মধ্যমপন্থার বৈশিষ্ট্য ও ব্যাপকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে সব ধরনের অস্পষ্টতা এবং সত্যের স্বচ্ছতাকে বিনষ্ট করতে পারে এমন সব মিথ্যাচার নির্মূল হয়ে যাবে। এ জন্য প্রকাশনা থেকে শুরু করে অডিও-ভিজুয়ালসহ সকল ধরনের মিডিয়া ব্যবহার করতে হবে।

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র

এ কাজের উদ্দেশ্য হবে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে মুসলিম ও অমুসলিম মানসে ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার সংশোধন করে সঠিক ধারণা সৃষ্টি করা এবং সে সব ভ্রান্ত ধারণা ও ত্রুটিপূর্ণ ফতোয়া (আইনগত মতামত) সংশোধন করা। কোনো কোনো ইসলামী গ্রুপের মধ্যেও ভ্রান্ত মতবাদ ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। সেহেতু ইসলামী আন্দোলনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য এসবের অবসান ঘটানো দরকার। এ উপলব্ধি কোরআন-সুন্নাহ ও শরীয়াহর মূলনীতি থেকে উৎসারিত বৈধ ভিত্তির উপর গড়ে উঠবে এবং এ চেতনা ও উপলব্ধি বিশেষভাবে শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। কারণ ইসলামকে সঠিক ও যথার্থভাবে জানার আসলেই কোনো সুযোগ এ শ্রেণীর নেই।

দায়িত্ব বণ্টন

সকল ক্ষেত্রে কাজ করা জরুরী এবং কোনোটাই অবহেলা করা বা ফেলে রাখা উচিত নয়। এ ব্যাপারে অবশ্য করণীয় হচ্ছে, একদিকে প্রত্যেক ক্ষেত্রের কি কি প্রয়োজন এবং অন্যদিকে আমাদের কাছে কি জনশক্তি ও সামর্থ্য আছে সেটি বিবেচনায় রেখে প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য জনশক্তি ও সামর্থ্য বণ্টন করে দেয়া।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জামানায় সকল মুসলমানকে জিহাদে যেতে পবিত্র কোরআনে নিষেধ করা হয়। পবিত্র সেই ক্ষেত্র কোনটি যেদিকে লক্ষ্য রেখে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা

হয়েছিল। সেটি কোনো অংশে জিহাদের ময়দানের চেয়ে কম পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বরং এ ক্ষেত্রটি কখনো কখনো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ এ ক্ষেত্রটি মুসলমানদেরকে জিহাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এর পথ প্রশস্ত করে দেয় এবং এটি অবহেলা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয়। আর সে ক্ষেত্রটি হচ্ছে দ্বীনকে অনুধাবন করার লক্ষ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা।

সূরা তাওবায় যারা জিহাদ-বিমুখ হয় তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এ সূরার ১২২নং আয়াতে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ ঈমানদারদের সকলকে একত্রে জিহাদে যাওয়া ঠিক নয়। সুতরাং তাদের প্রত্যেক দলের মধ্য হতে একটি করে অংশ যেন জিহাদে যায়। যাতে অবশিষ্ট লোক দ্বীনি জ্ঞান-গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে পারে এবং জিহাদে যোগদানকারীরা নিজ কওমে ফিরে এলে যাতে তারা অসৎ কাজ সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।

এটিই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্মীবাহিনীর দায়িত্ব বন্টনের এবং বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য দৃঢ় আহ্বান।

গুরুত্ব ও অগ্রাধিকারের ভিত্তি

ইতিপূর্বে বর্ণিত অগ্রাধিকার চিন্তার আলোকে আগামীতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কতিপয় বিষয়ের প্রতি ইসলামী আন্দোলনকে মনোযোগ দিতে হবে। বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

১. বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু ভাবধারার স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং এসব ব্যাখ্যা সকলের বোধগম্য ও গভীরভাবে তুলে ধরার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এটিকে আমরা 'নতুন ফিকাহ' হিসেবে অভিহিত করতে পারি।

২. সমাজের কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে আন্দোলনের বিস্তার ঘটানো যেতে পারে এবং ইসলামের প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে কোন শ্রেণীকে ইসলামী পুনর্জাগরণের মূলস্রোতে শামিল করা যায় সেদিকে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করা।

৩. শিক্ষা ক্ষেত্র বিশেষ করে যেখানে ঈমান ও আকীদার পরিশীলনের প্রশ্ন জড়িত সেখানে ভবিষ্যত নেতৃত্বের প্রস্তুতি ও গুণাবলী সৃষ্টিতে নির্দিষ্ট গুণগত মানের ওপর দৃষ্টি দেয়া।

৪. স্থানীয় ও বিশ্ব রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চিন্তা ও চেতনার যে উন্নয়ন ঘটেছে তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাতে করে মুসলিম বিশ্বের বিচ্ছিন্নতা ও অবরোধ ভেদ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্দোলনের বিশ্বজনীনতা এবং গতিশীলতা নিশ্চিত করা যায়।

পরবর্তীতে এ চারটি কর্মক্ষেত্রের প্রত্যেকটির ওপর আলাদা আলাদাভাবে আলোকপাত করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলন বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে

বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রই প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কারণ ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াত প্রসারের এটিই হচ্ছে ভিত্তি। বস্তুত বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটই প্রধান সমস্যা। অনেক লোকের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে যেমন পরিষ্কার ধারণার অভাব রয়েছে, তেমনি ইসলামের শিক্ষা ও এসব শিক্ষার পর্যায়ক্রমিক গুরুত্ব অর্থাৎ কোনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি সাধারণ গুরুত্বের এবং কোনটি আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয় এসব ব্যাপারে জ্ঞানের গুরুতর অভাব রয়েছে।

আমরা বর্তমানে যে যুগে বাস করছি তার পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা সম্পর্কেও জ্ঞানের গুরুতর অভাব দেখা যায়। অন্যদের সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা এমন যে হয় তাদেরকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেই নয় তো খাটো করে দেখি। অথচ অন্যেরা আমাদের সব ধরনের খবর রাখে এবং তারা আমাদের বিষয়ে গভীরভাবে অবহিত।

এমনকি নিজেদের সম্পর্কেও আমাদের অজ্ঞতা রয়েছে। আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের শক্তি ও দুর্বলতার দিকগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখিনি। বরং প্রায়শই ক্ষুদ্র বিষয়কে বড় করে দেখি অথবা চায়ের কাপে ঝড় তুলি। আমাদের শক্তি সামর্থ্য অথবা দোষ ত্রুটি যে দিকেই দেখি না কেন, উভয়ক্ষেত্রে একই অবস্থা। এ অজ্ঞতা কেবল সাধারণ মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামের স্বার্থ এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব যাদের উপর নির্ভর করে সেই অগ্রণী দল, যাদের মৌলিক কাজের ওপর ইসলামী আন্দোলন গড়ে উঠবে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উভয়ের ক্ষেত্রে এ অজ্ঞতা প্রকট।

নতুন ফিকাহ

বস্তুত আমাদের দরকার এক নতুন ফিকাহ যাতে করে আমরা আল্লাহ যাদেরকে সমঝদার লোক বলে বর্ণনা করেছেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করতে পারি। এখানে ফিকাহ বলতে ইসলামী পরিভাষায় ব্যবহৃত ফিকাহ বোঝানো হয়নি। অর্থাৎ সেই আইনশাস্ত্র যা অজু, পাক-পবিত্র, ইবাদত–বন্দেগী, লেনদেন, বিবাহ, তালাক, শিশু লালন-পালনের শর্তাবলীর মতো বিস্তারিত বিশেষ বিধিবিধান নির্ণয় করে। এসব বিধিবিধান যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, আমরা এখানে তা বোঝাতে চাই না। কোরআন ও হাদিসেও ফিকাহ শব্দটি এ প্রসঙ্গে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আমরা সে অর্থেও বোঝাতে চাই না। যেহেতু, এটি এমন সব শব্দ ও ভাবের মধ্যে উচ্চারিত হয়েছে যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন ইমাম গাজ্জালীও তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'এহিয়া উলমুদ্দীন'-এর জ্ঞান অধ্যায়ে এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আল-কোরআনের মক্কী সূরাগুলোতে শরীয়াহর আওতায় আদেশ নিষেধের বিস্তারিত বিধান এমন কি সকল ফরজ, হুদুদ (দণ্ডবিধি) ও বিচারের আইন প্রবর্তনের পূর্বেই মূল শব্দ ফিকাহর উল্লেখ দেখা যায়।

মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আল আন'আমের ৬৫ নং আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলছেন ঃ বলুন তিনি এতই শক্তিমান যে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করতে আসমান এবং যমীন থেকে কিংবা তোমাদেরকে দলে উপদলে বিভক্ত করে দ্বিধায় ফেলতে। এবং তোমাদের একেকে অপরের উপর আক্রমণের স্বাদ গ্রহণ করান; লক্ষ্য কর! আমরা কিরূপে প্রমাণসমূহকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করছি, যাতে তারা বুঝতে পারে।

একই সূরার ৯৮ নং আয়াতে আরো উল্লেখ রয়েছে ঃ আর তিনি এমন যে যিনি তোমাদেরকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন ; থাকার জন্য দিয়েছেন একটি স্থান (পৃথিবীতে বা মাতৃগর্ভে) আর একটি হচ্ছে গচ্ছিত স্থান। নিশ্চয়ই আমরা প্রমাণসমূহের বিশদরূপে বর্ণনা করেছি ঐ সকল লোকের জন্যে যারা উপলব্ধি করে।

এ দু'টি আয়াতে ফিকাহ শব্দের অর্থ হলো আত্মা, অন্তর ও অভিজ্ঞতার আলোকে আল্লাহর অপরিবর্তনীয় বিধান, তাঁর সৃষ্টি এবং তাঁর নির্ধারিত সঠিক পথ থেকে যারা সরে যায় তাদের জন্যে তাঁর শাস্তি গভীরভাবে উপলব্ধি করা।

মক্কী সূরা আল আ'রাফের ১৭৯ নং আয়াতে যে সব লোক জাহান্নামে যাবে বলে মহান আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাদের সম্পর্কে বলছেন ঃ তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না। এরপর এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ এ সকল লোক চতুষ্পদ জন্তুর মতো বরং এরা তার চেয়েও বেশি পথভ্রষ্ট। এসব লোক হচ্ছে গাফেল।

বিভিন্ন সূরায় কোরআনের প্রতি বহু ঈশ্বরবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা বলছেন ঃ আর আমরা তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি, যাতে তারা কোরআনকে না বোঝে এবং তাদের কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছি (আল আন'আমঃ ২৫, বানী ঈসরায়ীল ঃ ৪৬, আল কাহ্ফ ঃ ৫৭)।

আল-কোরআনের বেশ কয়েকটি মাদানী সূরায় ফিকাহ শব্দটি বহু ঈশ্বরবাদী ও মুনাফিকদের বোধশক্তি না থাকার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা আল আন্ফালের ৬৫ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদের সম্বোধন করে বলছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়তাসম্পন্ন ব্যক্তি থাকে, তবে তাঁরা দুইশ'র উপরে জয়লাভ করবে, আর তোমাদের মধ্যে যদি একশ ব্যক্তি থাকে, তবে এক হাজার অবিশ্বাসীর উপর জয়লাভ করবে, এ কারণে যে তারা এমন লোক যারা বোঝে না।

এখানে অবিশ্বাসীদের জ্ঞান না থাকার ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অপরিবর্তনীয় বিধিবিধান এবং পালাক্রমে সকল লোককে কিভাবে তিনি বিভিন্ন রকম সৌভাগ্যের দিন প্রদান করেন সে সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

সূরা তাওবার ৮৭ নং আয়াতে আল্লাহ মুনাফিকদের নিন্দা করে বলেছেন ঃ এরা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের সাথে থাকতে তৃপ্তিবোধ করল এবং তাদের অন্তরের ওপর মোহর লাগানো হলো, যাতে তারা উপলব্ধি না করে।

এখানে উপলব্ধি অর্থ হচ্ছে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দ্বীন রক্ষার উপলব্ধির অর্থ হচ্ছে **জীবন, ইজ্জত, সম্পত্তি ও সামগ্রিক অর্থে** সমাজকে রক্ষার জন্যে সচেষ্ট থাকার **প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা**। এসব কাজ যে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ–তা যতোই জরুরী **হোক তার** চেয়েও অগ্রাধিকার পাবে।

একই সূরার ১২৭ নং আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা (যাদের বোধশক্তির অভাব **রয়েছে) এ** ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলছেন ঃ আর যখন কোনো সূরা নাজিল করা **হয়, তখন** তারা একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে; (এবং বলে যে) তোমাদেরকে কি **কেউ** দেখে না? অতঃপর তারা সরে পড়ে। আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, কারণ তারা হচ্ছে নির্বোধ সমাজ মাত্র।

এসব নির্বোধ লোক ভুলে যায় যে কোনো মানুষ তাদেরকে দেখার আগেই আল্লাহ তাদেরকে দেখতে পান। আসলেই তারা তাদের ফিকাহ এবং বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

সূরা আল হাশরের ১৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ নিশ্চয় তাদের অন্তরে আল্লাহর অপেক্ষা তোমাদের ভয় অধিক; এটি এ কারণে যে তারা বুঝতে পারে না।

সূরা আল মুনাফিকুনের ৩ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলছেন ঃ এটি এ কারণে যে তারা ঈমান এনেছে, অতঃপর কাফের হয়েছে। তাই তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, অতএব তারা বুঝতে পারছে না।

একই সূরার ৭ নং আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরো বলেন ঃ তারাই বলে, আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে যারা রয়েছে তাদের জন্যে কিছুই ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা তাকে পরিত্যাগ করে। অথচ আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদরাজি আল্লাহরই অধিকারে আছে, কিন্তু মুনাফিকরা বোঝে না।

এতে দেখা যায়, 'সে সব লোক যারা বোঝে না'– এ মুনাফিকদের সম্পর্কেই কোরআনের একটি বিরাট অংশ জুড়ে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, মুনাফিকদের ধারণা তারা বুদ্ধিমান। তাই তারা পক্ষাবলম্বন না করে সুবিধাবাদী অবস্থান নেয়, দ্বিমুখী নীতি নিয়ে আল্লাহ ও ঈমানদারদের ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে। বিশ্বাসীদের সঙ্গে মিলিত হলে তারা বলে, আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু যখন তাদের দুষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রিত হয় তখন তারা বলে, আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি।

কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ বহু আয়াতে তাদের রহস্য, দ্বিধা এবং ধোঁকাবাজি প্রকাশ করে দিয়েছেন। সূরা আল বাকারার ৯ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ তারা আল্লাহ এবং

ঈমানদারদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে বলে মনে করে, বস্তুত তারা নিজেদের সাথেই ধোঁকাবাজি করে এবং তারা তা অনুধাবন করতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও মানুষের সামনে তাদের মুনাফিকী ধরা পড়েছে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে তারা হারিয়েছে এবং নিশ্চিতই তারা দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে। এর চেয়ে মর্মান্তিক পরিণতি আর কী হতে পারে?

সুতরাং, এ বর্ণনা অনুযায়ী কারো মধ্যে মুনাফিকীর লক্ষণ পরিলক্ষিত হলে নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে তার মধ্যে ন্যূনতম পরিমাণ বোধশক্তি নেই।

উপসংহার

আল-কোরআনের বাচনভঙ্গি অনুযায়ী ফিকাহ্ শব্দটি আজকের ভাষায় আইনশাস্ত্রের পারিভাষিক অর্থ বোঝায় না। বরং আল্লাহর কালাম এবং সৃষ্টি জগত, জীবন ও সমাজ সম্পর্কিত তাঁর বিধিবিধান উপলব্ধি ও জ্ঞান আহরণ বোঝায়।

এমন কি সূরা তাওবার ১২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তাদের প্রত্যেক দলের মধ্যে হতে একটি করে অংশ যেন জিহাদে যায়। যাতে অবশিষ্ট লোক দ্বীনি জ্ঞান-গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে পারে এবং জিহাদে যোগদানকারীরা নিজ কওমে ফিরে এলে যাতে তারা অসৎ কাজ সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।

এ আয়াতের ফিকাহ্ শব্দটি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। আইনশাস্ত্র সম্পর্কিত এরূপ অর্থ করলে তাতে সেই হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হবে না যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অর্থের হেরফের করা অথবা নিজেকে রক্ষা এবং দাওয়াতি কাজের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে গাফিলতির ব্যাপারে সতর্ক হয়।

আল-কোরআনের উপরোক্ত আয়াতে 'ফিকাহ' শব্দের যে ব্যবহার এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একটি হাদিসেও এর ব্যবহারের মধ্যে সাযুজ্য রয়েছে। হাদিসটি হচ্ছে ঃ আল্লাহ্ যদি কোনো ব্যক্তির কল্যাণ করতে চান তবে তিনি তাকে দ্বীনি এলমে পারদর্শী করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তার দৃষ্টিকে আলোকিত করবেন যাতে করে সে কেবল শব্দাবলী আর ভাসাভাসা অর্থ নিয়ে আত্মতৃপ্তির পরিবর্তে দ্বীনের সত্যতা, গূঢ়তত্ত্ব ও লক্ষ্য আরো ভালোভাবে অনুধাবনের জন্যে গভীর সাধনা চালাতে পারে।

যে ফিকাহ্ প্রয়োজন

আমাদের কোন কোন ধরনের ফিকাহ্ প্রয়োজন, তার মধ্যে বেশ কয়েকটি আমার 'ইসলামিক এয়োকেনিং বিটুইন রিজেকশন এন্ড এক্সট্রিমিজম' বইয়ে আলোচিত হয়েছে। তাতে আমলের ফিকাহ্ এবং কর্মের ক্রমবিন্যাসের ফিকাহ্ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

বক্তব্যের আরেকটি অংশ আমার 'ইসলামিক এয়োকেনিং বিটুইন পারমিটেড ডিফারেন্সেস এন্ড ব্লেমওয়ার্দি ডিজইউনিটি' বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে আমাদের

অন্যতম প্রধান প্রয়োজনীয় 'মতানৈক্যের ফিকাহ্' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয় যে আমাদের পাঁচ ধরনের ফিকাহ্ দরকার। এখানে এর মধ্যে মাত্র দু'টি ফিকাহ্র ওপর আলোচনা করা হয়েছে ঃ

১. **ভারসাম্যের ফিকাহ্ (ফিকহ্ উল মুয়াজানাত)**

২. **অগ্রাধিকারের ফিকাহ্ (ফিকহ্ উল আওলাইয়াত)**

এ ধরনের ফিকাহ্র প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

ভারসাম্যের ফিকাহ

ভারসাম্যের ফিকাহ বলতে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝি ঃ

১. আকার ও সামর্থ্য, মূল্য ও ফলাফল এবং সহনক্ষমতার আলোকে কোনটির চেয়ে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ সে ব্যাপারে ভারসাম্য রক্ষা করা, যাতে কোনটির উপর অগ্রাধিকার দেয়া যায় এবং কোনটি স্থগিত রাখা যায় তা নির্ণয় করা যায়।

২. ভালো বিষয়গুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার মতো মন্দ বিষয়গুলোর মধ্যেও ভারসাম্য রক্ষা করা, যেন কোনটি গ্রহণ এবং কোনটি পরিহার করতে হবে তা নির্ধারণ করা যায়।

৩. ভালো ও মন্দ বিষয়গুলো যদি সাংঘর্ষিক হয়, তবে ভালো লাভের চাইতে মন্দ বিষয় পরিহারের উপর অগ্রাধিকার দেয়া এবং ভালো লাভের স্বার্থে কোন কোন ক্ষেত্রে মন্দকে কখন উপেক্ষা করা যায় তা স্থির করা।

দু'ধরনের ফিকাহ

এ প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রয়োজন দু'পর্যায়ের ফিকাহ ঃ

শরীয়াহর ফিকাহ

প্রথম হচ্ছে শরীয়াহর ফিকাহ। শরীয়াহর প্রকৃত মর্ম গভীরভাবে অনুধাবনই হবে এর ভিত্তি। এর লক্ষ্য হচ্ছে উপরোক্ত 'ভারসাম্য নীতিমালার' অকাট্যতা প্রতিপন্ন করে এর প্রামাণিকতা নির্ণয় করা। এটি তাদের কাছে স্পষ্ট হতে হবে যারা শরীয়াহর মূল উৎস ও হুকুম-আহকাম অনুধাবন এবং এগুলোর গূঢ় তত্ত্ব উদঘাটনে সচেষ্ট।

শরীয়াহ কেবল মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণে কয়েক ধরনের সহজাত চাহিদাকে সামনে রেখেই পাঠানো হয়েছে। এর কল্যাণকর পর্যায়গুলো হচ্ছে ঃ অপরিহার্য (আল দুরুরিয়াহ), প্রয়োজনীয় (আল হাজিয়াহ) ও সৌন্দর্যবোধক (আল তাহসিনিয়াহ)।

বাস্তবতার ফিকাহ

দ্বিতীয় পর্যায়ের এ ফিকাহ আসলে ইতিবাচক যার ভিত্তি হচ্ছে সমকালীন বাস্তবতা নিয়ে গবেষণা। অত্যন্ত সঠিক তথ্য উপাত্ত নির্ভর গবেষণা সতর্কতার সঙ্গে ব্যাপক ক্ষেত্রে চালাতে হবে। এ ব্যাপারে প্রচারমূলক উপাত্ত ও প্রশ্নমালা ভিত্তিক বিভ্রান্তিকর ও অবাস্তব তথ্য পরিসংখ্যানের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ এসবের পেছনে একটি মতলব কাজ করে। এতে সামগ্রিকভাবে সত্য প্রকাশের উদ্দেশ্য থাকে না।

ফিকাহর সমন্বয়

শরীয়াহর ফিকাহ ও বাস্তবতার ফিকাহ উভয়ের মধ্যে সমন্বয় দরকার। যাতে করে আমরা যথাযথ তাত্ত্বিক ভারসাম্যকরণ প্রক্রিয়ায় পৌছতে পারি, যা একই সাথে উগ্রতা ও ঔদাসীন্য মুক্ত হবে। নীতিগতভাবে এখানে শরীয়াহর ফিকাহ'র বিষয়টি স্পষ্ট। এ বিষয়ে উসূল আল ফিকাহ গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'আল-মুসতাসফা' (ইমাম গাজ্জালী) থেকে শুরু করে 'আল-মুয়াফাকাত' (ইমাম আল শাতিবি) পর্যন্ত এবং নিয়মবিধি, সাদৃশ্য ও ভিন্নতা সংক্রান্ত বই- পুস্তকেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যখন নানামুখী স্বার্থের সংঘাত হয়, তখন উচ্চতর স্বার্থে নিম্নতর স্বার্থ এবং সাধারণের স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থের মালিককে তার ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া উচিত। পরস্পর বিরোধী স্বার্থের ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদীর স্থলে দীর্ঘ মেয়াদী অথবা স্থায়ী স্বার্থ, তুচ্ছ স্বার্থের স্থলে প্রকৃত স্বার্থ এবং অনিশ্চিত স্বার্থের পরিবর্তে সুনিশ্চিত স্বার্থের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যক।

আমরা দেখেছি রাসূলুল্লাহ (সা.) হুদায়বিয়ার সন্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃত, মৌলিক ও ভবিষ্যত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যা অন্য কেউ হলে কখনোই ছাড় দিতে চাইতো না। তিনি এমন শর্ত মেনে নিয়েছিলেন যা প্রথম নজরেই মুসলমানদের জন্যে অন্যায্য ও অবমাননাকর মনে হয়েছিল। তিনি 'পরম করুণাময় আল্লাহর নামে' বাক্যটি তুলে ফেলতে সম্মত হয়েছিলেন। সে স্থলে লেখা হয়েছিল 'হে প্রভু আপনার নামে'। তিনি চুক্তিতে 'আল্লাহর রাসূল' কথাটি উল্লেখ না করে কেবল তার নাম 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ' লিখতেও রাজী হন। এরকম বহু উদাহরণ রয়েছে।

ক্ষতিকর বিষয়গুলো পরস্পর বিরোধী হলে এবং এগুলোর মধ্যে কোনোটি যদি অপরিহার্য হয় তবে দু'টি মন্দের কম মন্দটি এবং অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর মন্দ বিষয়টি বেছে নেয়া উচিত। মুসলিম মনীষীরা ক্ষতিকর বিষয় যথাসম্ভব নির্মূল করার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে কোনো বড় ধরনের ক্ষতিকর বিষয়ের স্থলে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর বিষয় নির্মূল করা উচিত নয়। একটি ছোট ক্ষতি সহ্য করা উচিত যদি তাতে একটি বড় ক্ষতি পরিহার করা সম্ভব হয়। আবার সাধারণের ক্ষতি এড়ানোর স্বার্থে ব্যক্তির ক্ষতি স্বীকার করে নেয়া উচিত। এর বহু উদাহরণ 'আল কাওয়ায়িদুল ফিখিয়া' ও 'আল আসবাহ্ ওয়ান নাজায়ের' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি লাভ ও ক্ষতির সংঘাত দেখা দেয় তবে আকার, ফলাফল ও মেয়াদের নিরিখে তার বিচার করতে হবে। একটি বৃহত্তর স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে সামান্য ক্ষতি উপেক্ষা করা যায়। দীর্ঘমেয়াদী অথবা স্থায়ী স্বার্থের জন্যে কোনো সাময়িক ক্ষতি মেনে নেয়া উচিত। এমন কি কোনো বড় ক্ষতিকেও মেনে নেয়া যায় যদি এর চেয়েও বড় ক্ষতি নির্মূলের সম্ভাবনা থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় স্বার্থ আদায়ের আগেই ক্ষতিকর বিষয় এড়ানোর চেষ্টা করা উচিত।

এ ভাবধারা কেবল তত্ত্ব হিসেবে মনে করা উচিত নয়, বরং এগুলো আমাদেরকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। কারণ, সক্রিয় ইসলামী গ্রুপগুলোর মধ্যে এসব ভারসাম্যকে ঘিরেই নানা মতপার্থক্য বিদ্যমান।

বৈরী শক্তির সাথে জোট বাধা

যেসব সরকার ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ত নয় তাদের সঙ্গে সমঝোতা বা সন্ধি স্থাপন কি মেনে নেয়া যায়?

যে ক্ষমতাসীন সরকার বিশুদ্ধ ইসলামী চরিত্রের সরকার নয়, ত্রুটিপূর্ণ সংবিধান দ্বারা পরিচালিত অথবা যার প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন নেই–সেই সরকারে অংশগ্রহণ করা কি উচিত?

একটি ধর্মবিরোধী, স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী অসৎ সরকারকে হটানোর জন্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত বিরোধী ফ্রন্টে আমাদের যোগদান করা কি উচিত?

সুদভিত্তিক মানব রচিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাবাধীন পরিবেশে আমরা কি ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারি?

সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে সুদভিত্তিক ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে দেয়া অথবা ইসলামের শিক্ষা অনুসরণকারী দ্বীনদার লোকদেরকে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে কাজ করা থেকে বিরত রাখা কি উচিত?

বাস্তব জীবনে প্রয়োগ

নীতিমালা প্রণয়ন করা সহজ, কিন্তু এগুলো মেনে চলা কঠিন। সাধারণ মানুষ এবং যারা সামান্য কারণে শোরগোল করেন তাদের পক্ষে ভারসাম্যের ফিকাহ অনুধাবন করা সহজ নয়।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এবং তার দল জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ষাটের দশকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খানের স্থলে ফাতেমা জিন্নাহকে নির্বাচনে সমর্থন করা ভারসাম্যের ফিকাহর আলোকে কম ক্ষতিকর বলে মত প্রদান করায় তিনি ও তাঁর অনুসারীরা তীব্র প্রতিরোধ ও হয়রানির সম্মুখীন হয়েছিলেন। একটি জাতি কোনো মহিলাকে তাদের নেতা নিযুক্ত করলে কখনোই উন্নতি করতে পারবে না– এ হাদিসকে ভিত্তি করে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রচারণা চালানো হয়। তাহলে সেই জাতির কী হবে যারা কোনো স্বৈরশাসককে তাদের নেতা হিসেবে বরণ করে নেয়? তারা কী কাজটা খুব ভালো করবে? কখনোই না। এখানেই ভারসাম্যের ফিকাহর কাজ হচ্ছে দু'টি অনিষ্টের মধ্যে কম অনিষ্টকে বেছে নিয়ে বৃহত্তর ক্ষতি পরিহার করা।

সুদানের ইসলামী আন্দোলনের নেতা ড. হাসান আল তুরাবী এবং তার সহযোগীবৃন্দ সোস্যালিস্ট ইউনিয়নে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নেয়ায়, এমন কি সুদানে ইসলামী শরীয়াহ চালু করার ঘোষণা দেয়ার আগেই তারা জাফর নুমায়ের সরকারের পদ গ্রহণ করায় কোনো কোনো ইসলামপন্থী তাদের কঠোর সমালোচনা করে।

সিরিয়ায় আমাদের সহযোগী ভ্রাতৃবৃন্দ তাদের সমূলে ধ্বংসে উদ্যত স্বৈরশাসনের প্রতিরোধে কোনো কোনো অনৈসলামী শক্তির সঙ্গে জোট বাঁধার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে একই রকম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অথচ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং বহু ঈশ্বরবাদী খুজয়াহ গোত্রের সঙ্গে মিত্রতা করেছিলেন এবং কখনো কখনো বহু ঈশ্বরবাদী এক গ্রুপের বিরুদ্ধে অপর এক গ্রুপকে সমর্থন দিয়েছিলেন।

অবশ্য আমি এখানে কোনো পক্ষ নিচ্ছি না। আমি কেবল একটি নীতি তুলে ধরছি, সেটি হচ্ছে ভারসাম্যের ফিকাহ–যার ওপরে 'শরীয়াহ রাজনীতির' কাঠামো নির্মাণ করা উচিত। অনৈসলামী শাসনে অংশগ্রহণ অথবা অমুসলিম শক্তির সঙ্গে জোট বাঁধা অনুমোদনযোগ্য–এ বক্তব্যের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবিদের গৃহীত অবস্থান এবং আমাদের সুবিস্তৃত শরীয়াহর বিধানে বহু দলিল রয়েছে।

ভারসাম্যের ফিকাহ'র প্রমাণ

আমরা যদি আল–কোরআনের মক্কী ও মাদানী সূরাগুলো সতর্কতার সঙ্গে অধ্যয়ন করি তাহলে ভারসাম্যের ফিকাহর অনেক প্রমাণ এবং একটি বিষয়ের সাথে আরেকটির গুরুত্ব পরিমাপের উপায় দেখতে পাব।

আমরা ভারসাম্যের স্বার্থের উদাহরণ দেখতে পাই হযরত মূসা (আ.) এর প্রশ্নে হযরত হারুনের (আ.) জবাবে বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে ঃ হে আমার মাতৃতনয়। তুমি আমার দাড়ি ধরো না, মাথাও স্পর্শ করো না, আমি এ আশঙ্কা করেছিলাম যে তুমি বলবে, তুমি বনি ইসরাইলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ, আর তুমি আমার কথার সম্মান দাওনি (সূরা ত্বাহা ঃ ৯৪)।

আবার অনিষ্টকর বিষয়গুলোর মধ্যে ভারসাম্যের নজির দেখা যায় আল খিজির (আ.) কর্তৃক নৌকা ফুটো করে দেয়ার ব্যাখ্যার মধ্যে ঃ আর নৌকাটির ব্যাপার হচ্ছে, বস্তুত তা ছিল কতিপয় গরীব লোকের যা দিয়ে তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত, সুতরাং তাতে ফুটো সৃষ্টি করতে চাইলাম এবং তাদের অপর দিকে ছিল এক বাদশাহ যে প্রত্যেকটি নিখুঁত নৌকা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিত (সূরা আল কাহ্ফ ঃ ৭৯)।

নৌকাটি পুরোপুরি হারানোর চেয়ে ফুটো নৌকাটি রাখাই মালিকের জন্যে কম ক্ষতিকর। অর্থাৎ সব কিছু হারানোর পরিবর্তে নিঃসন্দেহে কিছুটা বাঁচিয়ে নেয়া অনেক ভালো।

আল্লাহর কালামেও ভারসাম্যের ফিকাহ'র বিষয়টি স্পষ্ট রয়েছে ঃ মানুষ আপনাকে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, এ সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধ করা আল্লাহ্র কাছে গুরুতর অপরাধ। আর মানুষকে আল্লাহ্র পথে চলতে বাঁধার সৃষ্টি করা এবং আল্লাহর সাথে কুফরি করা, মসজিদে হারামের পথে বাধা দেয়া এবং মসজিদে হারামের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করা আল্লাহর নিকট তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ। আর ফেতনা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা অধিক জঘন্য (সূরা আল বাকারা ঃ ২১৭)।

সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে বলছেন, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা গুরুতর অপরাধ, কিন্তু এরচেয়েও কোনো মারাত্মক অপরাধের প্রতিরোধে যুদ্ধ করা যেতে পারে।

মূর্ত ও বিমূর্ত স্বার্থের মধ্যে তুলনার লক্ষ্যে আসুন আমরা পড়ি সেই আয়াত যেখানে আল্লাহতায়ালা বদরের যুদ্ধের পর মুসলমানদের ভর্ৎসনা করেছেন ঃ নবীর পক্ষে শোভনীয় নয় যে তাঁর কাছে যুদ্ধবন্দী রয়েছে এবং তা তিনি মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেন অথচ তিনি ভূমিতে কাফেরদের প্রচুর রক্তপাত ঘটাননি ; তোমরা তো দুনিয়ার ধনসম্পদ চাইছো, কিন্তু আল্লাহ চাইছেন আখেরাত; আর আল্লাহ্ অতি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় (সূরা আল আন্ফাল ঃ ৬৭)।

ভালো ও মন্দের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নে আসুন আমরা দেখি মহান আল্লাহ্ কি বলছেনঃ তারা আপনাকে মদ ও জুয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, উভয়ের ব্যবহারের মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু কল্যাণও আছে। আর এ দু'টোর মধ্যে কল্যাণ অপেক্ষা পাপই অধিক গুরুতর (সূরা আল বাকারা ঃ ২১৯)।

বিভিন্ন অমুসলিম গ্রুপ ও চক্র একে অপরের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে সূরা আল রুমের প্রারম্ভিক কয়েকটি আয়াতে আল্লাহতায়ালা পারসিকদের উপর রোমকদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ঐ দিন ঈমানদাররা আনন্দিত হবে। যদিও উভয় পক্ষই অমুসলিম। তবুও অগ্নিপূজক পারসিকদের তুলনায় রোমানরা মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ। তারা আহলে কিতাব বলে মুসলমানদের অধিক কাছাকাছি।

ইবনে তাইমিয়ার মত

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া একটি অনৈসলামিক রাষ্ট্রে কোনো মুসলমানের সরকারী পদ গ্রহণ অনুমোদনযোগ্য বলে দৃঢ় মত প্রকাশ করেছেন, যদি সংশ্লিষ্ট পদাধিকারী ব্যক্তি কিছু কিছু অন্যায় অবিচারের প্রতিকার অথবা অসৎ কাজ ও দুর্নীতি দমনে ইচ্ছুক হন (পরিশিষ্ট-১)।

তিনি ভালো ও মন্দের দ্বন্দ্ব অথবা দু'টোই যদি একসাথে সামনে আসে এ দু'য়ের সমন্বয় এবং আলাদা করা সম্ভব না হলে সাময়িকভাবে গ্রহণ অথবা বর্জনের ওপরে একটি বিস্তারিত অনুচ্ছেদও রচনা করেছেন (পরিশিষ্ট-২)।

ইসলামী অর্থনীতির ওপরে আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামে[১] অংশগ্রহণকারী বেশ কয়েকজন ফিকাহবিদ ও অর্থনীতিবিদ মত প্রকাশ করেন, মুসলিম দেশগুলোতে অনুমোদিত খাতে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বেচাকেনা করা শরীয়াহর দৃষ্টিতে জায়েজ। যদিও এরূপ লেনদেনে সুদ-সংশ্লিষ্টতার কিঞ্চিৎ সন্দেহ থাকে। ভারসাম্যের ফিকাহর আলোকে এ ইস্যু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিম্পোজিয়ামে মত প্রকাশ করা হয়, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর খাত অমুসলিম অথবা অধার্মিক মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। কেননা এ পদক্ষেপ বিশেষত কোনো কোনো দেশে মারাত্মক বিপদ সৃষ্টি করবে। বরং শেয়ার হোল্ডারগণ সুদ-সংশ্লিষ্ট লেনদেন থেকে যে লভ্যাংশ পান বলে মনে করেন আনুপাতিকভাবে সেই অংশটি সাদাকাহ বা জনহিতকর কর্ম হিসেবে দান করে দিতে পারেন।

এ ফিকাহ অনুসারে বিবেকবান মুসলিম তরুণদেরকে ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্সের মতো কোম্পানিগুলো থেকে চাকরি না ছাড়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এতে অবশ্যই কিছু গুনাহর আশঙ্কা থাকলেও তারা সেখান থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন তা ইসলামী অর্থনীতির বিকাশে কাজে লাগাতে পারেন। এভাবে তারা মনে মনে ক্ষতির দিকটা প্রত্যাখ্যান করার পাশাপাশি গোটা পদ্ধতি ইসলামীকরণের প্রচেষ্টায় যারা নিয়োজিত তাদের সঙ্গেও অংশ নিচ্ছেন।

ভারসাম্যের ফিকাহর অনুপস্থিতি

আমরা যদি ভারসাম্যের ফিকাহ প্রয়োগ না করি তাহলে আমরা বহু কল্যাণ ও লাভের দরজা নিজেরাই বন্ধ করে দেব। পরিণামে সব ব্যাপারে প্রত্যাখ্যানের দর্শনই একটি হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াবে, ঝামেলা এড়ানোর অজুহাতে একঘরে হয়ে যাব এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে তার নিজের যুক্তি মোতাবেক সংঘর্ষে না জড়ানোর পথ বেছে নেব। তখন ইজতেহাদ সাপেক্ষ প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের পক্ষে 'না' বলা অথবা 'এটি হারাম' বলা সহজ হয়ে যাবে।

কিন্তু আমরা যদি ভারসাম্যের ফিকাহ প্রয়োগ করি তাহলে এক পরিস্থিতির সাথে আরেক পরিস্থিতির তুলনা, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে এবং ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে ক্ষতির স্থলে

১. আলজেরিয়ায় ১৯৯০ সালের ২-৫ মার্চ ৬ষ্ঠ বারাকাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আরো কয়েকজন ফকীহর সঙ্গে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম। তারা হচ্ছেন, শায়খ আব্দুল হামিদ আল সায়েহ, শায়খ মুখতার আল সালামী, ড. আবদুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ, ড. সাইয়েদ দার্শ ও ড. তালাল বাফাকীহ।

লাভের পরিমাপ করার উপায় খুঁজে পাব। আর এভাবে আমরা সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ পরিহারের পথ বেছে নিতে পারব।

১৯৮০ সালে কাতার থেকে প্রকাশিত 'দোহা' ম্যাগাজিনে লেখার অনুরোধ পেয়েছিলাম। এটি একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রকাশনা এবং এর অধিকাংশ সম্পাদকীয় কর্মী সেক্যুলারপন্থী। এর মূলনীতি ইসলাম বিরোধী না হলেও ইসলামপন্থী বা ইসলামের সমর্থকও নয়। আমি অনেক দিন ধরে ইতস্তত করার পর ভারসাম্যের নীতিতে প্রস্তাবটি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেই পত্রিকাটি বয়কট না করে এতে লেখা দেয়াই বেশি ভালো হবে। কারণ এর পাঠকরা এক ব্যাপকভিত্তিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন যারা সাধারণত ইসলামী পত্র পত্রিকা পড়েন না। 'আল উম্মাহ্'র' মতো সাময়িকীর যে ধরনের পাঠক রয়েছে এ পত্রিকার পাঠকরা সেই শ্রেণীর নন বিধায় আমরা যখন সুযোগ পাচ্ছি তখন তাদের কাছে আমাদের কথা পৌঁছে দেয়া দরকার। আর এটি আল্লাহ প্রদত্ত আমাদের প্রতি দায়িত্ব।

এ কারণে এসব পত্র পত্রিকার নীতি আমাদের মতের অনুকূল না হলেও তাদেরকে সাক্ষাতকার বা লেখা দিতে রাজী হওয়া উচিত। যে সব দৈনিক পত্রিকা স্পষ্টভাবে ইসলামী ধারা অনুসরণ করে না সে সব পত্রিকায় লেখালেখি করলে অনেকে এখনো দোষারোপ করেন। অনেকে আমার 'ইসলামিক এয়োকেনিং বিটুইন পারমিটেড ডিফারেন্সেস এন্ড ব্লেমওয়ার্দি ডিজইউনিটি' বইটি সউদী দৈনিক 'শারক আল আওসাত' এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্যেও আমাকে দোষারোপ করেছেন। কারণ তারা এ পত্রিকার কোনো কোনো দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন না। কিন্তু আমি বহুল পঠিত এ পত্রিকায় বইটি ছাপানোর সুফলের দিকই বেশি বিবেচনা করেছি।

এমন অনেক লোক রয়েছেন যারা বিশ্বাস করেন, বিপথগামী চিন্তা চেতনার কারণে অডিও-ভিডিওসহ সকল গণসংযোগ মাধ্যম বর্জন করা উচিত। তারা ভুলে যান গণসংযোগ মাধ্যম বর্জন করা মানে এগুলো আরো জঘন্য রূপ নেবে এবং সেক্যুলার ও নোংরা মানসিকতার লোক ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করে নাশকতামূলক কাজ চালানোর সুযোগ পাবে। আর আমরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হব যার কোনো বিকল্প নেই।

আমরা যদি ভারসাম্যের ফিকাহ'র আলোকে বিষয়টি পরীক্ষা করি তাহলে দেখব এ অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটিতে কাজ করা কেবল জায়েজ ও বাঞ্ছনীয় নয় বরং অত্যাবশ্যক। কারণ এটি আমাদের দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং অশুভ কর্মকাণ্ডের যথাসাধ্য মোকাবিলার ন্যায্য একটি হাতিয়ার হতে পারে।

অগ্রাধিকারের ফিকাহ

অগ্রাধিকারের ফিকাহ্ বলতে আমরা বুঝি প্রত্যেকটি ইস্যু সত্যিকার প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা। কোনো বড় ইস্যুকে স্থগিত রাখা যাবে না, কোনো ছোটখাটো ইস্যুকে বড় করে দেখা যাবে না, কোনো বড় বিষয়কে খাটো করে দেখা উচিত নয়। আবার কোনো ক্ষুদ্র বিষয়কে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া ঠিক হবে না। প্রাকৃতিক বিধান ও শরীয়াহর বিধান এ দিকনির্দেশই দেয়। আমি মনে করি, আল্লাহর সৃষ্টি ও বিধান এ প্রকৃত প্রেক্ষিত মেনে চলা অবশ্যম্ভাবী করে দিয়েছে। সূরা আল আ'রাফের ৫৪ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ নিশ্চয় তারই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা।

নবীর জীবনে অগ্রাধিকারের ফিকাহ্

মক্কী পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মিশন একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। আর এ মিশনের কর্মসূচি ছিল কেবল আল্লাহর রাস্তায় মানুষকে দাওয়াত দেয়া এবং এমন একটি বিশ্বাসী দল গড়ে তোলা যারা পরবর্তীতে সেই দাওয়াত আরবদের কাছে, অতঃপর বিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে দেবে। এ পর্যায়ে দ্বীনি আকীদা প্রতিষ্ঠা, তাওহীদের অনুশীলন, বহু ঈশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজা নির্মূল এবং নেক ও সৎকর্মের চর্চার ওপর রাসূলের (সা.) কাজ কেন্দ্রীভূত ছিল।

এ পর্যায়ের কর্মধারার প্রতি কোরআনের সমর্থন ছিল বিধায় কোরআন মুসলমানদেরকে কোনো বিশেষ গৌণ বিধিবিধানের দিকে মনোযোগ দিতে বলেনি বরং সূরা আল আসরে বর্ণিত ইসলামী ভাবধারা গড়ে তোলার ওপর সকল প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করার তাগিদ দিয়েছে। এ সূরার ৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ কিন্তু যারা ঈমান আনে, যারা সৎকর্ম করে এবং একে অন্যকে সত্য ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতে থাকে।

মক্কী পর্যায়ে দাওয়াতি কাজের সময় মুসলমানরা প্রতিদিন কাবা ঘরে যে মূর্তি দেখত সেগুলো ধ্বংস করার জন্যে আল্লাহর রাসূল (সা.) তাদের হাতে কুঠার নেয়া অথবা তাদের ও আল্লাহর শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে তলোয়ার তুলে নেয়ার অনুমতি দেননি অথচ কাফেররা ঐ মুসলমানদের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছিল। সে সময় মার খেয়ে ও জখম হয়ে তারা যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে আসতেন, কোরআনের ভাষায় তিনি তাদেরকে এটিই বলতেন ঃ স্বীয় হাতকে বিরত রাখ এবং নামাজ কায়েম কর (সূরা আন নিসা ঃ ৭৭)।

সব কিছুর জন্যে একটি উপযুক্ত সময় আছে। সেই নির্ধারিত মুহূর্তের আগেই যদি কিছু পাওয়ার আশা করা হয় তাতে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির আশঙ্কা থাকতে পারে।

অগ্রাধিকারের ফিকাহ্ ও ভারসাম্যের ফিকাহ্র পারস্পরিক সম্পর্ক

অগ্রাধিকারের ফিকাহ্ ভারসাম্যের ফিকাহ্র সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয়েই একসঙ্গে জড়িয়ে যায় অথবা একে অপরের সমান্তরাল হয়ে দাঁড়ায় এবং আবার ভারসাম্যের প্রক্রিয়া অগ্রাধিকারের দিকে ঝুকে যায়। এভাবে এটি তখন অগ্রাধিকারের ফিকাহ্র আওতায় পড়ে।

অনুপাত বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা

অগ্রাধিকারের ফিকাহ্ অনুযায়ী শরীয়াহ্র হুকুম-আহকাম (তাকলিফ) ও আমলের ক্ষেত্রে অনুপাত রক্ষা করা আবশ্যক। শরীয়াহ্র ইসলাম নির্ধারিত অনুপাতে ব্যত্যয় ঘটলে দ্বীনি ও পার্থিব উভয় জীবনে দারুণ ক্ষতি হবে।

ইসলামে আমলের আগে ঈমানের স্থান। যেহেতু ঈমান হচ্ছে ভিত্তি আর আমল হচ্ছে ইমারত। ভিত্তি ছাড়া কোনো ইমারত হয় না। আমলের আগে ঈমান। আমল বহুমুখী। রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি সহীহ্ হাদিসে বলেছেন ঃ ঈমান ৭৭ টি শাখায় বিভক্ত, সর্বোচ্চ স্থান হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই আর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে রাস্তা থেকে ক্ষতিকর জিনিস সরানো।

আল–কোরআনে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্র নিকট আমল কেবল একটি স্তরেই নয়, উচ্চ ও নিম্ন স্তরে বিভক্ত। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেনঃ তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে সেই ব্যক্তির কাজের সমান সাব্যস্ত করে নিয়েছ–যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালা ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করেছে? তারা আল্লাহ্র সমীপে সমান নয়। আর যারা অত্যাচারী, আল্লাহ্ তাদেরকে সুবুদ্ধি দান করেন না। আর যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং জানমাল দিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করেছে তারা মর্যাদায় আল্লাহ্তায়ালার সমীপে অতি বড়। আর তারাই হচ্ছে সফলকাম (সূরা তাওবা ঃ ১৯-২০)।

এ কারণে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, হজ্ব সম্পাদনের চেয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ অধিকতর উত্তম। হাম্বলী ফকিহ্গণ এবং অন্যান্য ফকিহ্ তো জিহাদকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে করণীয় সর্বোত্তম শারীরিক আমল বলে অভিহিত করেছেন। অনেক হাদিসে জিহাদের প্রশংসা করা হয়েছে। এর মধ্যে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিসও রয়েছে। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর জনৈক সাহাবি একটি সঙ্কীর্ণ উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন– যেখানে একটি মিঠাপানির ঝর্ণা ছিল। উপত্যকাটি তার ভালো লাগে এবং বলেন, আমি আল্লাহ্র বন্দেগীর জন্যে কি করে অন্য লোকদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারি। আল্লাহ্র রাসূল (সা.) এর কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে আমি এটি করবো না। সেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট তার ইচ্ছে ব্যক্ত করল এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এরূপ করো না। তোমার ঘরে সত্তর বছর

ইবাদত করার চেয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা অনেক উত্তম (তিরমিজি ও আল হাকিম)।

সালমান (রা.) বর্ণিত একটি হাদিসে কাফেরদের হাত থেকে মুসলমানদের পাহারার (রিবাত) গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ একদিন ও একরাতের রিবাত একমাসের রোজা ও রাত্রিকালীন ইবাদতের চেয়ে উত্তম এবং রিবাতের অবস্থায় কেউ ইন্তেকাল করলে তার অনুকূলে আমলে সালেহ'র হিসাব জারি থাকবে যেন সে জীবিত আছে, আর যদি জীবিত থাকে সে শয়তানের প্রলোভন থেকে নিরাপদ থাকবে (মুসলিম)।

আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারকের মতো একজন ইমাম জিহাদের সময় এক সৈন্যশিবির থেকে আল ফুজায়েল ইবনে ইয়াদ নামক তার এক বন্ধুকে কবিতা লিখছেন যিনি সব সময় দুই পবিত্র স্থান মক্কা ও মদিনার মধ্যে সফর করতেন। পঙ্‌ক্তিমালা হচ্ছেঃ

ওহে দুই পবিত্র স্থানে ইবাদতকারী,
তুমি যদি আমাদেরকে দেখতে,
তাহলে তুমি জানতে তোমার ইবাদত কেবলি খেলা।
কেউ কেউ তাদের অশ্রু দিয়ে গণ্ডদেশ ভেজায়;
আর আমরা নিজেদের রক্তে বুক ভিজাই.......।[১]

প্রচলিত ফিকাহ্ অনুসারে নফল ইবাদতকে (ঐচ্ছিক আমল যা ফরজ ইবাদতের মতো বাধ্যতামূলক নয়) ফরজের ওপর গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়; সামষ্টিক বাধ্যবাধকতার (ফরজে কেফায়া) চেয়ে ব্যক্তির বাধ্যবাধকতা (ফরজে আইন) বেশি গুরুত্বপূর্ণ; যে সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা আদৌ কারো দ্বারা সম্পাদিত হয় না সে কাজ অগ্রাধিকার পাবে সেই দায়-দায়িত্বের ওপর যা সম্পন্ন করার জন্যে পর্যাপ্ত লোক আছে। আবার একটি গ্রুপ বা জাতির সাথে সম্পর্কিত দায়িত্ব ব্যক্তির অধিকারের চেয়ে গুরুত্ব পাবে এবং যে কাজ সম্পন্ন করার মেয়াদ সীমিত, সেই কাজ ঐ কাজের চেয়ে আগেই করে ফেলতে হবে যে কাজ করার যথেষ্ট সময় আছে।

শরীয়াহর বর্ণিত স্বার্থের গুরুত্বের ব্যাপারে ফিকাহতে বর্ণিত হয়েছে কোন বিষয়টি অধিকতর অগ্রাধিকার পাবে। যেহেতু প্রয়োজনীয় (আল মাসালিহ আল হাজিয়াহ) ও সৌন্দর্যবোধক (আল মাসালিহ আল তাহসিনিয়াহ) স্বার্থের চেয়ে অপরিহার্য (আল মাসালিহ আল দুরুরিয়াহ) স্বার্থের প্রাধান্য রয়েছে। আবার প্রয়োজনীয় স্বার্থকে তাহসিনিয়াহর চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। অথচ জাতি ও ব্যক্তির স্বার্থের মধ্যে যখন সংঘাত দেখা দেয় তখন জাতীয় স্বার্থই অগ্রাধিকার পাবে। এখানে ভারসাম্যের ফিকাহ ও অগ্রাধিকারের ফিকাহ এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে।

১. সূরা আল ইমরানের শেষ আয়াতটির তাফসীরে ইবনে কাছীর এ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য ইতিহাসবিদগণও একই কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

অগ্রাধিকারের ফিকাহর প্রতি অবহেলা

ইসলামী পুনর্জাগরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু গ্রুপকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে তাদের কাছে অগ্রাধিকারের ফিকাহ'র কোনো অস্তিত্ব নেই, যেহেতু তারা প্রায়শ মুখ্য বিষয়ের আগে গৌণ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়। সামগ্রিক স্বার্থ অনুধাবনের চেয়ে কোনো বিশেষ দিক নিয়ে গবেষণায় লেগে যায়। আর প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করার পরিবর্তে বিতর্কিত বিষয় আঁকড়ে ধরে থাকে। দুঃখের বিষয়, আমরা পিঁপড়ার রক্তপাতের বিষয়ে আলোচনা করি, কিন্তু ইমাম হোসাইন (রা.) এর রক্তপাতের ব্যাপারে মাথা ঘামাই না। অথবা নফল রক্ষার জন্যে মারমুখী হয়ে উঠি যখন মানুষ ফরজকে অবহেলা করছে। সারবস্তুর পরোয়া না করে খোলস নিয়ে ঝগড়া করি।

সার্বিকভাবে এ হচ্ছে আজকের মুসলমানদের অবস্থা। আমি দেখি প্রতি বছর রমযানে কিংবা অন্যান্য মাসে লাখ লাখ লোক উমরাহ্ পালন করে এবং কেউ কেউ দশ বার এমন কি বিশ বারের মতো হজ্ব পালন করে। তারা যদি এসব নফল কাজে ব্যবহৃত অর্থ সঞ্চয় করতো, তাহলে কোটি কোটি টাকা জমা করতে পারতো। আমরা ইসলামী সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে এক হাজার মিলিয়ন ডলার তহবিল সংগ্রহে বছরের পর বছর ছুটোছুটি করি। কিন্তু এ অর্থের ১০ ভাগ এমন কি ২০ ভাগ বা ৩০ ভাগের এক ভাগও সংগ্রহ করতে পারি না। যদি এসব অতিরিক্ত হজ্ব ও উমরাহ্ পালনকারীকে তাদের ঐচ্ছিক সফরের খরচের টাকা এশিয়া ও আফ্রিকায় খৃস্টধর্মে দীক্ষিতকরণ প্রতিরোধে বা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের কাজে লাগানোর জন্যে চান, তারা কিছুই দেবে না। এটি এমন এক পুরানো রোগ যে কোনো হৃদরোগ চিকিৎসক কখনো এর চিকিৎসা করতে পারবে না।[১]

অগ্রাধিকারের ফিকাহ্ প্রয়োগ করলে আমরা জানতে পারি অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় কোন ইস্যুটির দিকে বেশি নজর দেয়া দরকার– যাতে এ ইস্যুটির জন্যে আমরা আরো বেশি শ্রম ও সময় দিতে পারি। অগ্রাধিকারের ফিকাহর আওতায় আরো জানা যায়, কোন শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি আরো বেশি কাজে লাগিয়ে তার বিরুদ্ধে আমাদের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করতে হবে এবং তুলনামূলকভাবে কোন লড়াই চালানোর যোগ্য। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের কয়েকটি প্রকারভেদ রয়েছে ঃ মুসলমান, কাফের ও মুনাফিক।

কাফেরদের মধ্যে শান্তিকামী ও জঙ্গী মনোভাবাপন্ন শ্রেণী রয়েছে। এদের মধ্যে শুধু কাফেরই নয় বরং আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন কাফেরও আছে। মুনাফিকদের মধ্যে কম মুনাফিকী করে এমন লোক রয়েছে, আবার বেশি মাত্রায়

১. বাশার আল হাফী'র এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা 'আল এহিয়া' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ৪০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে।

মুনাফিকীতে লিপ্ত এমন লোকও রয়েছে। তাহলে কোথা থেকে শুরু করব? কোন ক্ষেত্রটি কাজের জন্য অধিকতর উপযোগী? কোন ইস্যুটির দিকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে?

অগ্রাধিকারের ফিকাহ সময়ের দাবি অনুযায়ী কাজ করার ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন করে, যাতে নির্দিষ্ট কাজটি কাল বিলম্ব না করে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায়। কেননা সুযোগ একবার হাতছাড়া হলে তা পুনরায় আসতেও পারে আবার নাও পারে। আর আসলেও দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। একজন কবি সময়ের মূল্য সম্পর্কে বলেছেনঃ

সুযোগ কাজে লাগাও, একটি সুযোগ
যদি হাতছাড়া করো, আসবে দুঃখ হয়ে।

আরবি এক প্রবচনে বলা হয়েছে ঃ আজকের কাজ কালকের জন্যে ফেলে রেখো না।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজকে (রা.) কিছু কাজ আগামী দিনের জন্যে রেখে দেয়ার পরামর্শ দিলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন ঃ আমি তো ইতোমধ্যে একদিনের কাজ করেই ক্লান্ত, তাহলে আগামীকাল দু'দিনের কাজ করতে হলে কি অবস্থা হবে?

ইবনে আতা'র (রা.) একটি জ্ঞানগর্ভ উক্তি হচ্ছে ঃ অনেক কাজ আছে যেগুলো করার প্রচুর সময় থাকে, সেই সময়ের মধ্যে এগুলো করে ফেলা যায়। কিন্তু এমন কাজও থাকে যা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে না করলে আর করা হয়ে ওঠে না। কারণ প্রত্যেক নতুন সময়ের সাথে থাকে নতুন নতুন দায়িত্ব আর আল্লাহ নির্ধারিত নতুন নতুন কাজ।

গাজ্জালী ও অগ্রাধিকারের ফিকাহ

ইমাম গাজ্জালী (র.) 'আল এহিয়া' গ্রন্থে যারা সৎকর্মের দিকে মনোযোগ না দিয়ে কেবল ইবাদত-বন্দেগীতে সন্তুষ্ট থাকে তাদের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আরেক দল নফলের ব্যাপারে যতোটা আগ্রহী ফরজের ব্যাপারে ততোটা নয়। আমরা দেখি তারা সকালের নফল ও রাতের তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য নামাজ পড়ে খুব খুশি, কিন্তু ফরজ কাজ করে আনন্দ পায় না। কিংবা তারা সময় মতো ফরজ নামাজ আদায়েও তৎপর নয়। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) বর্ণিত হাদিসের কথা ভুলে যায় ঃ আমি যে সব কাজ ফরজ হিসেবে করার আদেশ দিয়েছি সেগুলো ছাড়া আমার বান্দার আর কোনো কাজ আমার অধিকতর নৈকট্য লাভের জন্যে অধিক উত্তম হবে না (বুখারী)। আমলে সালেহ'র গুরুত্বভিত্তিক ক্রমবিন্যাস অবহেলা করা অসদাচারের আওতায় পড়ে। এক ব্যক্তির দু'টি বাধ্যতামূলক কাজের মধ্যে মাত্র একটি করার মতো পরিস্থিতি আছে, অথবা একটি কাজ অল্প সময়ের মধ্যে করতে হতে পারে এবং আরেকটি কাজের জন্যে প্রচুর সময় আছে, এক্ষেত্রে সে যদি ক্রমবিন্যাস রক্ষা না করে তাহলে সে বিভ্রান্ত।

এ ধরনের বহু উদাহরণ রয়েছে যেখানে আল্লাহর হুকুমের বাধ্যতা ও অবাধ্যতা উভয়ই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে বিষয়টি বাস্তবিকই দ্ব্যর্থবোধক সেটি হচ্ছে কিছু কিছু

বাধ্যতামূলক কাজকে অন্যান্য কাজের ওপর গুরুত্ব দেয়া। যেমন নফলের চেয়ে ফরজ আমলকে অগ্রাধিকার দেয়া, ফরজে কেফায়া'র চেয়ে ফরজে আইনের প্রতি গুরুত্বারোপ, কম দরকারী কাজ যা স্থগিত করা যায় তার চেয়ে স্থগিত করা যায় না এমন কাজের ওপর গুরুত্ব দেয়া এবং পিতার প্রয়োজনের চেয়ে মায়ের চাহিদা পূরণের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ কে আমার অধিকতর সেবাযত্ন পাওয়ার হকদার? তিনি জবাব দিলেন ঃ তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমার মা। লোকটি চতুর্থবার প্রশ্ন করল, তারপর কে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমার পিতা। লোকটি আবারো জিজ্ঞেস করল এরপর কে? এবং রাসূল (সা.) জবাব দিলেন ঃ তোমার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যিনি নিকটতম এবং এরপর নিকটতর যিনি। কোনো ব্যক্তি আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা অনুযায়ী এ সম্পর্কের হক আদায় করবে। যদি তার আত্মীয়দের দু'জন সমমর্যাদার হন, তাহলে যার সাহায্য বেশি প্রয়োজন তাকে সাহায্য করতে হবে। আর উভয়ের চাহিদা যদি সমান হয় তবে যে বেশি দ্বীনদার তাকে সাহায্য করা উচিত।

একইভাবে কেউ যদি পিতার ব্যয়ভার মিটাতে না পেরেও আবার হজ্ব পালন করতে চায়, সে ক্ষেত্রে তার হজ্বে যাওয়া উচিত নয়। যদি যায় তবে সে মূর্খের মতো কাজ করবে। কারণ তার উচিত পিতার স্বার্থ রক্ষার ওপর অগ্রাধিকার দেয়া। এভাবে সে একটি নিম্নক্রমের ধর্মীয় কর্তব্যের চেয়ে অপর একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার ওপর গুরুত্ব দেবে।

অধিকন্তু কারো যদি পূর্ব নির্ধারিত কাজের সময় জুমার নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যায় তাহলে জামায়াতে শরিক হতে হবে। যদি সে পূর্ব নির্ধারিত কাজে যায় তাহলে সে আল্লাহর অবাধ্যতা করবে– যদিও প্রতিশ্রুত কাজ সম্পন্ন করাটাও একটি বাধ্যতামূলক বিষয়। কেউ যদি তার পোশাকে কিছু নাপাকী দেখে পিতামাতার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, নাপাকী অগ্রহণযোগ্য ঠিকই কিন্তু পিতামাতাকে আঘাত দেয়াও গ্রহণযোগ্য নয়। নাপাকী পরিহারে সাবধান হওয়ার চেয়েও পিতামাতাকে আঘাত দেয়া থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া বেশি জরুরী।

নিষিদ্ধ কাজ ও বাধ্যতামূলক দায়িত্বের পারস্পরিক সম্পর্কের অসংখ্য নজির রয়েছে। যে এসবের মধ্যে কোনো একটি বিষয়েও অগ্রাধিকারের ধারা উপেক্ষা করে সে নিশ্চিতই বিভ্রান্ত।[১]

১. দেখুন 'আল এহিয়া', তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০০-৪০৪, আমার বইও দেখুন ঃ 'ইমাম আল গাজ্জালী ঃ বিটুইন হিজ প্রেইজারস এন্ড হিজ ক্রিটিকস', পৃষ্ঠা ৮৭-৯৩।

ইবনুল কাইয়েমের মত

কোন ইবাদত করা উত্তম–যে বন্দেগী করা খুব কঠিন সেগুলো, না যেগুলো খুব কল্যাণকর সেগুলো? এসব প্রশ্নে ইমাম ইবনুল কাইয়েম বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

তিনি মত দিয়েছেন, একমাত্র পছন্দের ইবাদত বলতে কিছু নেই। তবে কোনো কোনো সময় কোনো কোনো ইবাদত করা পছন্দনীয় হতে পারে।[১] দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য দ্রব্য প্রদান করা সর্বোত্তম কাজ, এতে একজন মুসলমান আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভ করে। যখন কুফরী শক্তি কোনো মুসলিম দেশে হামলা চালায়, তখন জিহাদ সর্বোত্তম আমল। এরপরের স্থান হচ্ছে মুজাহিদদের অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করা। যখন কোনো আলেম ইন্তেকাল করেন অথচ তাদের কোনো উত্তরাধিকারী থাকে না, তখন দ্বীনি এলেম অর্জন করা সর্বোত্তম কাজ। এজন্যে একজন মুসলমান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের প্রত্যাশা করতে পারে এবং তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদের প্রশংসাও অর্জন করে। এভাবেই ভালো ভালো কাজগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুসারে একে অপরের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যেতে পারে।

১. মাদারিজ আল সালিকীন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৫-৯০, আমার বই 'ইবাদাহ ইন ইসলাম'।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলন প্রচার অভিযান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে

প্রচার অভিযান

সমাজের সকল গ্রুপ ও শ্রেণীর মধ্যে দাওয়াতি তৎপরতা এবং দিগ্‌দিগন্তে জনসাধারণের মধ্যে ইসলামী পুনর্জাগরণের চেতনা সৃষ্টির জন্যে ইসলামী আন্দোলনের কঠোর প্রচেষ্টা চালানো উচিত। এভাবে কাজ করলে সমাজের কোনো স্তরই ইসলামী আন্দোলনের উপস্থিতি ও তৎপরতা শূন্য থাকবে না। সর্বত্র আন্দোলনের আহ্বান পৌঁছে যাবে। এর নিবেদিত কর্মী বাহিনীও এ প্রচেষ্টায় শামিল থাকবে। এভাবে আন্দোলনের অনুসারী, সমর্থক ও প্রবক্তার সংখ্যাও বহুগুণ বেড়ে যাবে।

তথ্য ও গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে কাজ করেই এ পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব। এজন্যে সংগঠিত ও সুপরিকল্পিতভাবে বিজ্ঞানের সর্বশেষ উদ্ভাবনা, তথ্য ও গণসংযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। এরূপ কাজের জন্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সকল কৌশল ও সামর্থ্য যতটা সম্ভব এবং যেখানেই পাওয়া যায় কাজে লাগাতে হবে। আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে যতদিন সহায়ক হবে ততদিন এ পদ্ধতি ব্যবহার করে যেতে হবে। একজন সৎ ঈমানদারের সব সময় উচিত জ্ঞানগর্ভ বাণীর সন্ধান করা। যখনই সে এর সন্ধান পায়, সেটা তারই প্রাপ্য।

আন্দোলনের উচিত সে সব বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেয়া যারা সাধারণ সমাবেশ ও প্রত্যেক আলাদা গ্রুপের সামনে কিভাবে বক্তব্য রাখতে হবে সে ব্যাপারে অভিজ্ঞ। এসব বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ও গণসংযোগ বিজ্ঞানে পণ্ডিত এবং তারা জানেন কিভাবে এ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আন্দোলনের এবং ইসলামের সর্বোত্তম স্বার্থে কাজে লাগানো যায়।

আন্দোলনকে আজই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এমন এক দাওয়াতি গ্রুপ তৈরি করতে, যারা এ যুগের ভাষায় কথা বলতে এবং সমান পারদর্শিতার সঙ্গে সমকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারেন। তারা ইসলামী দাওয়াতের মহিমা, ব্যাপকতা, সার্বজনীনতা ও ভারসাম্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আজকের ভাষায় যুক্তি প্রয়োগ করে মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর যোগ্যতা রাখেন এমন একদল গণমাধ্যম কর্মীকে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলতে হবে।

এখন আমরা সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ শিক্ষিত, শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য শ্রেণীর মাঝে পুনর্জাগরণ এবং আন্দোলনের কাজ কিভাবে বিস্তৃত করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করব।

সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী

প্রথমে সাংস্কৃতিক গ্রুপের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের বিস্তার ঘটাতে হবে যাতে করে ইসলাম ও ইসলামের মর্মবাণী, আইন, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা সঠিক খাতে প্রবাহিত করা যায় এবং ইসলামী আন্দোলন, এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা যায়।

ভ্রান্ত ধারণা

সংস্কৃতিবান অনেক যুবকের মধ্যে ইসলামী পুনর্জাগরণ বিস্তৃত হলেও কেউ কেউ এখনো ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, বিকৃত বা অস্পষ্ট। এজন্য দায়ী হচ্ছে যুগ যুগব্যাপী পশ্চাৎপদতা কিংবা বিজাতীয় আদর্শিক আগ্রাসনের নতুন বিকৃত প্রভাবের পরিণতি।

এদের মধ্যে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও এখনো কুসংস্কার ও কল্পকথায় বিশ্বাসী। বিশ্বাসে বহু ঈশ্বরবাদকে প্রশ্রয় দেয়, ইবাদত-বন্দেগীতে রসম রেওয়াজের মিশ্রণ ঘটায় এবং তাদের আচার-আচরণে এলোমেলো অবস্থা বিরাজমান। আবার এরাই নিজেদেরকে সত্যিকার দ্বীনদার বলে মনে করে। অনেক সংস্কৃতিবান ব্যক্তি এখনো সাধু–দরবেশদের মাজারে মাজারে ঘুরে বেড়ায় যেন এসব মাজার–দরগাহ কাবা ঘরের অনুরূপ। তারা মৃতব্যক্তির কাছে সাহায্য চায়, তাবিজ–কবচ পড়ে, রূহকে ডেকে আনায় বিশ্বাস করে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম খায় এবং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পশু জবাই করে।

সুদূরপ্রসারী বস্তুবাদী জোয়ার এবং পাশ্চাত্যের আদর্শিক আগ্রাসনের কারণে এ ধরনের লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হলেও বিপথগামী সুফিবাদের প্রভাবে এদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। বহু মুসলিম দেশে এখনো এরা ক্ষমতার দাপট দেখায় এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে ও গোপনে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। আর একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে এর তাৎপর্য না বোঝার কোনো কারণ নেই। এসব সংস্কৃতিবান ব্যক্তির প্রকৃত ঈমান ও আকীদার মৌলিক বুনিয়াদ অনুধাবন করা এবং আল্লাহর অনুমোদিত ইবাদত-বন্দেগীর তরীকা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা উচিত। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ইসলামের শাশ্বত রূপ, শক্তি ও মহিমার নানা দিক সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ। তারা ইসলামের নীতি-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু জানে না বললেই চলে। তারা প্রাচ্যবিশারদ ও মিশনারী এবং মুসলমানদের বর্তমান হাল-অবস্থা থেকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। মনে করে, তাদের চারপাশে মুসলমানদের যে অবস্থা তাতে ইসলাম বুঝি এরকমই। সুতরাং মুসলমানদের

পশ্চাৎপদতা, কলুষতা ও অজ্ঞতার জন্যে ইসলামই দায়ী। অথচ ইসলামের সাথে এসবের কোনো সম্পর্কই নেই।

সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের জানা উচিত, ইসলাম সম্পর্কে কোথায় জ্ঞান লাভ করা যায় এবং কোন কোন সূত্র তাদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারে। তাদের জানা উচিত, মুসলমানদের দেখে ইসলাম নয় বরং ইসলামের নিরিখে মুসলমানদের বিচার করতে হবে। বিভ্রান্ত মুসলমানরা ইসলামের মানদণ্ড নয় বরং সত্যিকার মুসলমানরাই ইসলামের মানদণ্ড।

কোনো কোনো সাংস্কৃতিক লোক এখনো মনে করেন, তারাই সত্যিকার দ্বীনদার মুসলমান হতে পারেন। অথচ তারাই ইসলামী শরীয়াহ ছাড়া অন্য আইনের শাসন মেনে নেন এবং এমন দেশে বাস করেন যার নিয়ম কানুন ও ক্ষমতাসীন সরকার ইসলামী নয়।

এটি তাদের অনুধাবন করা উচিত ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা ও আইন বিধান এবং আল্লাহ তাঁর কোরআন এজন্যে নাজিল করেননি যে তা মৃতদের উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করা হবে। বরং তা জীবিত মানুষের পরিচালনার জন্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আপনার নিকট আমি এ সত্য কিতাব আল-কোরআন নাজিল করেছি যা দ্বারা আপনি মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা করেন যা আল্লাহ আপনাকে ওহী দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন (সূরা আন নিসাঃ ১০৫)। তাদের এটিও বুঝে নেয়া উচিত, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার আলোকে যে ফায়সালা করে না, তারা কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী কুফরী, অবিচার অথবা দুরাচারের আওতায় পড়ে কিংবা একত্রে সব দোষই তাদের ওপর বর্তায়।

কোনো কোনো সংস্কৃতিবান ব্যক্তি এখনো মনে করেন, ইসলাম খৃস্টধর্মের একটি রূপ এবং খৃস্টধর্ম মানুষের শ্রেণীভেদ এবং ঈশ্বর ও সিজারের মধ্যে জীবনের বিভক্তি মেনে নেয়। মেথিউ ২২ঃ২১-এ বর্ণিত ঃ 'অতএব, সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দাও আর ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে প্রদান করো।' এমনিভাবে তারা মানুষ ও আল্লাহর সম্পর্কের মধ্যে ইসলামকে সীমিত করে ফেলে। আর এ বিশেষ সম্পর্কের একমাত্র স্থান হচ্ছে মানুষের বিবেক। এ সম্পর্ক যদি বিবেকের বাইরে চলে যায়, তার একমাত্র স্থান হবে মসজিদ, অন্য কোথাও নয়। জীবন ও তার পদ্ধতি, সংস্কৃতি ও তার ধারা, শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম, অর্থনীতি ও তার প্রয়োগ, আইন ও দণ্ডবিধান এসব ব্যাপারে ইসলামের কি করণীয় আছে?

এর চেয়েও দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, এদের কেউ কেউ নিজেকে কেবল মুসলমান হিসেবেই দাবি করে না, মুসলমান বলে গর্বও করে। নামাজ পড়ে, উমরাহ অথবা হজ্ব পালন করে। আবার একই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার গুণকীর্তন করে, ইসলামের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী বন্ধন পছন্দ করে এবং তারা কিসের পেছনে ছুটছে সেটার কোনো বাছবিচার অথবা পরীক্ষা নিরীক্ষা না করেই পুরোপুরি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা গ্রহণ করে।

তারা ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব, ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষা তত্ত্ব, মার্ক্সের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং ডার্কহেমের ধর্মের উৎপত্তিতত্ত্ব গ্রহণ করে। অথচ তারা এটি দেখে না, এসব

তত্ত্বকথার মধ্যে ইসলামের কি ভূমিকা রয়েছে। এদের একজন তো একবার বলেই ফেলেছেন ঃ আমি একজন মুসলিম মার্ক্সবাদী। এটি বোধগম্য নয়, এক ব্যক্তির মধ্যে এ দু'টি জিনিসের অস্তিত্ব কিভাবে থাকতে পারে। এ প্রেরণা তিনি কোত্থেকে পেলেন– কোরআন, না দাস ক্যাপিটাল অথবা কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো থেকে? যদি কোনো বিরোধ দেখা দেয়, তখন কে হবে তার দৃষ্টান্ত ও ফায়সালাকারী–মুহাম্মদ (সা.), না মার্ক্স?

কোনো ব্যক্তি যদি বলে, 'আমি একজন মুসলিম বৌদ্ধ কিংবা মুসলিম খৃস্টান'– তা কি মেনে নেয়া যায়? যদি 'না' হয়, তবে তিনি কিভাবে বলতে পারেন, আমি একজন মুসলিম মার্ক্সবাদী? এটি কি এ কারণে যে মার্ক্সবাদ একটি ধর্ম নয় বরং সকল ধর্মের বিরুদ্ধেই তার লড়াই এবং ধর্মকে 'মানুষের আফিম' বলে মনে করে? যদি তাই হয়, তাহলে মার্ক্সবাদ প্রত্যাখ্যান করাই অধিক বাঞ্ছনীয়। কারণ ইসলাম আরেকটি ধর্মের সঙ্গে মিলে যেতে পারে না, যদি সেই ধর্ম কিতাবীও হয়। তাহলে ইসলাম কিভাবে সব ধর্মের বিরোধী একটি মতবাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে?

প্রকৃতপক্ষে মার্ক্সবাদ সকল ধর্মকে অস্বীকার করলেও এর একটি ধর্মীয় চরিত্র আছে। আর তা হচ্ছে মার্ক্সবাদ তার অনুসারীদের কাছ থেকে নিরঙ্কুশ আনুগত্য দাবী করে, সে কারণে অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদের সঙ্গে মার্ক্সবাদের মিশে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

মার্ক্সবাদ একটি নিরঙ্কুশ স্বৈরতান্ত্রিক দর্শন। এতে ইসলাম বা অন্য কোনো ধর্মের স্থান রাখা হয়নি। এমন কি প্রয়োজন ছাড়া ধর্মের কোনো ভূমিকা নেই এবং মার্ক্সীয় সমাজে ধর্মকে মৌল নয় গৌণ হিসেবে দেখা হয়েছে।

কোনো কোনো সংস্কৃতিবান ব্যক্তি বিশ্বাস করেন, মুসলমানদের রাজনৈতিক দুর্বলতা, সামরিক পরাজয়, সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দীনতার কারণ হচ্ছে ইসলাম। আর পাশ্চাত্যের বিজয় ও প্রগতি সম্ভব হয়েছে ধর্মের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথককারী ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ বরণ করার কারণে।

এ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে ধর্মের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে মৌলিক উৎসদ্বয় পবিত্র কোরআন ও রাসূলের (সা.) সুন্নাহর আলোকে। যেভাবে উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম সাহাবি ও তাদের অনুসারীরা জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তাহলে তারা দেখবেন ইসলামের প্রকৃত তত্ত্ব সঠিকভাবে জানা এবং সর্বান্তকরণে অনুসরণ করা হলে সর্বোত্তম ফল লাভ করা যায়।

ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অন্যকিছু নয়। এ শিক্ষা মনকে মুক্ত, নফসের তাজকিয়া, ইচ্ছাশক্তি সংহত, দেহকে সবল ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর নির্মাণ করে। বিজ্ঞান, বিশ্বাস, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও নৈতিকতার মাধ্যমে সমাজকে প্রগতির দিকে নিয়ে যায়। সুবিচার ও পরামর্শ ভিত্তিক সরকার কায়েম করে, আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করে এবং সমগ্র মানবজাতিকে সর্বোত্তম পথ দেখায়।

ইসলামের ইতিহাস পাঠ করে তাদেরকে আরো জানতে হবে ইসলামের উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, বিকাশ ও বিপর্যয়, শক্তি ও দুর্বলতার কারণগুলো। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অবশ্যই দেখা যাবে মুসলমানরা তখনই বিজয়, অগ্রগতি ও শক্তি অর্জন করেছে যখন তারা একজন খলীফা, একজন সেনাধ্যক্ষ, একজন মনীষীর নেতৃত্বে একটি আন্দোলনের আওতায় ইসলাম, ইসলামের মূল্যবোধ ও শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরেছে। যেমনটি হয়েছিল খোলাফায়ে রাশেদীন, উমর ইবনে আবদুল আজীজ, আবু জাফর আল মনসুর, হারুন আল রশীদ, নূরুদ্দিন মাহমুদ আল শহীদ, সালাউদ্দিন আল আইয়ুবী প্রমুখের আমলে।

অন্যদিকে পরাজয়, বিপর্যয় এবং দুর্বলতা ও পতনের কাল তখনই এসেছে যখন মুসলমানরা ইসলামের সত্য থেকে সরে গেছে। যত দূরে সরে গেছে ততই আপদ তাদেরকে গ্রাস করেছে।

কোনো কোনো সাংস্কৃতিবান ব্যক্তি ইসলামের নামে প্রচলিত অনেক বিষয়ে এখনো অজ্ঞ। যেমন আমরা দেখেছি কোনো লেখক বিষয়বস্তু হিসেবে সত্য মনে করে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে বেছে নেন। অথচ ইসলাম হযরত ঈসা (আ.) এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কথিত ঘটনাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে নাকচ করে দিয়েছে। কেউ কেউ আবার এ কাহিনী বর্ণনা করেন, কিভাবে বিবি হাওয়া (আ.) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের জন্য আদম (আ.) কে প্রলুব্ধ করেন এবং এর পরিণতিতে তারা বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে মানবজাতির জন্যে দুঃখ দুর্দশা বয়ে আনেন।

এ তত্ত্ব তাওরাত ও ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে নেয়া হয়েছে, ইসলামে যার কোনো ভিত্তি নেই। কারণ, আদমই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছিলেন এবং আদমই আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিলেন। সূরা ত্বাহা'র ১১৫ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ আর আমরা ইতোপূর্বে আদমকে এক অঙ্গীকার করিয়েছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তাঁর মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি। একই সূরার ১২১-১২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ আর আদম তার প্রভুর অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথভ্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর প্রভু তাঁকে দয়ার জন্য মনোনীত করলেন, অতঃপর তাঁর প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাঁকে সুপথে আনয়ন করলেন।

দেখা যাচ্ছে আসল দায়-দায়িত্ব আদমেরই এবং তাঁর স্ত্রী নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার ব্যাপারে কেবল তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন।

বহু সংস্কৃতিবান ব্যক্তি এখনো পাশ্চাত্যের প্রেক্ষিতে সংস্কৃতির বিচার করেন। তাদের কাছে সংস্কৃতির প্রথম সারির উপাদান হচ্ছে নৃত্য। তাই যে ব্যক্তি নৃত্য করে না সে সংস্কৃতিবান নয়। আমাদের যে নৃত্য আছে তা তরবারি নিয়ে। তাদেরকে আরো জানান, আমাদের আছে লেবাননী দারকা লোকনৃত্য এবং যে কোনো দেশের মতো অন্যান্য

আরো লোকনৃত্য যা বিয়ে ও অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়। এসব কথা যদি তাদের বলেন তাহলে আপনি হয়ে যাবেন তাদের উপহাসের পাত্র। কেননা আপনি তো নাচের একমাত্র অর্থটিই বোঝেননি। আর সেটা হচ্ছে নৃত্য মানে পরপুরুষের সাথে নারীর নৃত্য, পরনারীর সঙ্গে পুরুষের নৃত্য। আর এ নৃত্য করতে গিয়ে তারা পরস্পরের দেহের স্পর্শ অনুভব করে এবং সঙ্গীতের তালে তালে আন্দোলিত হয়। কিন্তু খবরদার, তাদের সম্পর্কে কোনো কু-ধারণা করবেন না কারণ তারা আপনার ও আমার মতো সাধারণ মানুষ নন, যাদের প্রবৃত্তি ও কামনা আছে। তারা সন্দেহ ও পাশববৃত্তির উর্ধ্বে, এমন কি তারা যেন পৃথিবীতে বিচরণকারী ফেরেশতা।

আর হালাল-হারাম একজন মুসলমানকে এ বিধান দেয় যে সে তার ইচ্ছেমত কোনো কিছু করতে পারে না। বরং আল্লাহর নির্ধারিত অলঙ্ঘনীয় সীমার মধ্যে থেকে তাকে কাজ করতে হয়। আল্লাহতায়ালা সূরা তালাকে'র প্রথম আয়াতে বলেন ঃ আর যে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করলো, সে নিজের ওপর জুলুম করলো। সংস্কৃতিবানদের কাছে এ এক অদ্ভুত তত্ত্ব, যা তারা মানতে রাজি নয়।

সংস্কৃতিবানদের প্রতি আচরণ

সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে ইসলামী পুনর্জাগরণের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে দু'টি পন্থা গ্রহণ করা উচিত ঃ প্রতিকারমূলক ও প্রতিরোধমূলক।

প্রতিকারমূলক পন্থা হচ্ছে, সংস্কৃতিবানদের লালিত ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর করার পদক্ষেপ। ধীরস্থির, বস্তুনিষ্ঠ, তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের কাছে বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। অপমান করে, এলোপাতাড়ি কথা বলে কিংবা উত্তপ্ত বাক্যবাণে বিদ্ধ করে নয়। বরং তাদের প্রামাণিক সূত্রগুলোর সন্ধান দিতে হবে যে সূত্র থেকে তারা ইসলাম, কিতাব, রাসূল, ধর্মতত্ত্ব, শরীয়াহ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

এ পন্থাটি সেই তরুণদের জন্যে সর্বাপেক্ষা উপযোগী যারা উগ্রপন্থার খপ্পরে পড়ে সেটিকে একটি নীতি হিসেবে গ্রহণ অথবা তার আলোকে জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে না। যেসব তরুণ সত্যের খাতিরে সত্যের অন্বেষণে সচেষ্ট তাদের জন্যেও এ পন্থা ফলপ্রসূ হতে পারে। যারা উগ্রপন্থী ও প্রগতিশীল, উদারপন্থা, ডানপন্থা, বামপন্থা ইত্যাদিকে আঁকড়ে ধরেছে তাদের সাথে তর্ক করা বৃথা। তবে বিশেষ কোনো একটি বিষয় ব্যাখ্যা করা বা খণ্ডন করার ক্ষেত্রে হয়তো সহায়ক হতে পারে।

দ্বিতীয় পন্থাটি প্রতিরোধমূলক। নির্ভুল তত্ত্ব ও স্বচ্ছ অভিব্যক্তি সহকারে বিশুদ্ধ, প্রামাণ্য ইসলামী সংস্কৃতির রূপ তুলে ধরাই হবে এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। ইসলাম অনুধাবনের জন্যে দিক নির্দেশনা দেয়া, সংস্কৃতিবানদের মধ্যে গড়ে ওঠা বিভিন্নমুখী ভুল ধারণা দূর করা এবং এর পাশাপাশি মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত চিন্তা-বিশ্বাসের মোকাবিলা করা।

প্রতিরোধমূলক পন্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, তরুণ সমাজকে আগ্রাসী আদর্শের বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষা করা। এ পন্থায় কাজ করার ফলে তরুণরা যে জ্ঞান অর্জন করবে তা আমাদের ভূখণ্ডে গোপনে বা প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়া আদর্শিক মহামারী প্রতিরোধে ভ্যাকসিন হিসেবে কাজ করবে।

সাধারণ মুবাল্লিগ বা ধর্মপ্রচারকদেরকে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে। এসব মুবাল্লিগ ও ওয়ায়েজগণ না যুগের ভাষায় কথা বলতে পারে, না তারা সংস্কৃতিবানদের কাছে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করতে পারে। এসব ধর্মপ্রচারক কেবল তাদের আবেগময় বাগ্মিতা দিয়ে মুসল্লীদের মধ্যে জজবা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু উদারমনা ব্যক্তিদের হৃদয়ে নাড়া দিতে পারে না। এসব উদারবাদী কদাচিৎ 'হ্যাঁ' বলে, বরং সব সময় তাদের জিজ্ঞাসা 'কেন, কিভাবে'?

জনপ্রিয় মুবাল্লিগগণ জনপ্রিয় লেখকদের মতো। প্রথমোক্তরা তাদের সুরেলা ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে জজবা সৃষ্টি করে, আর শেষোক্তরা প্রাঞ্জল লেখনীর মাধ্যমে আবেগ অনুভূতি সঞ্চার করে। আরবের একটি প্রাচীন প্রবাদ অনুযায়ী কলম হচ্ছে দু'টি জিহ্বার একটি। কণ্ঠ এবং এর আওয়াজে শ্রোতাকে উত্তেজিত ও অভিভূত করার ক্ষেত্রে জিহ্বার কার্যকারিতা অনেক বেশি। আর এর সাথে যদি যোগ হয় কল্পনাশক্তি, তাহলে তো কথাই নেই। এসব ওয়ায়েজ ও লেখকদের ভূমিকা ও উপযোগিতা ততটুকুই যতটুকু জ্ঞান তাদের রয়েছে। তবে সংস্কৃতিবান মহলে তারা যে ক্ষতি করেন, সাধারণত তাদের ভালো করার মাত্রার চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয়ে যায়।

জনগণ

সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর দিকে নজর দেয়া মানে সাধারণ মানুষকে অবহেলা করা নয়। উভয় ক্ষেত্রে কাজ পরস্পর বিরোধী নয়। ইসলামী আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনপ্রিয়তা। আন্দোলন জনপ্রিয় এ অর্থে যে এটি সরকারী বা অভিজাততান্ত্রিক আন্দোলন নয়। এ এমন এক আন্দোলন যা জনগণের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় এবং অনুভূতিগুলো প্রকাশ করে। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আন্দোলন জনগণের মতের প্রতিফলন ঘটায়। তাদের পক্ষে কথা বলে এবং তাদের দায়িত্ব ও অধিকার আদায়ে সহযোগিতা প্রদান করে।

আন্দোলনের বিদেশী শত্রুরা এবং দেশের ভেতরে তাদের এজেন্টরা ইসলামী আন্দোলনকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালায়। কখনো অপপ্রচার ও বিকৃতির মাধ্যমে, কখনো ভয়ভীতি কিংবা চাপ প্রয়োগ করে। আবার অনেকে বিভিন্ন ধরনের পন্থায় এ অপচেষ্টা অব্যাহত রাখে।

এর চেয়েও বিপজ্জনক হচ্ছে ঔদ্ধত্য, অভিযোগ, অশ্রদ্ধা, বেপরোয়াভাব ও ব্যস্ততার অজুহাতে আন্দোলন যদি নিজেই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখনই আসল বিপদ, যখন আন্দোলন জনগণের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কের কথা ভুলে যায়, জনগণের সমস্যা, দুঃখ-দুর্দশা অবজ্ঞা করে কেবল নিজেকে নিয়ে নিজের কথা নিজেই শুনতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমনিভাবে আন্দোলন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জন প্রকোষ্ঠে আশ্রয় নেয়।

ইসলামী আন্দোলন তখনই সফল হবে যখন জনগণকে সাথে নিয়ে চলতে সক্ষম হবে। জনগণ আন্দোলনের স্বার্থের সাথে একাত্ম হয়ে আন্দোলনের সমস্যা বা সংকট নিজের বিপদাপদ মনে করবে। আন্দোলনের আনন্দ তাদের আনন্দের কারণ হবে, আন্দোলনের সকল ভূমিকা, অবস্থান ও প্রচেষ্টার তারা প্রশংসা করবে এবং শত্রুকে অভিসম্পাত দেবে। ইসলামী আন্দোলন তখনই সফল হবে যখন শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রক্তের মতো জনগণের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রতি এর প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হবে। আন্দোলনের সম্পর্ক হবে দেহের সাথে আত্মা ও চোখের সাথে দৃষ্টির সম্পর্কের মতো। তখন জনতার স্রোত ও ইসলামী আন্দোলন একাত্ম হয়ে যাবে যেন একটিকে আরেকটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা না যায়।

এটি তখনই সম্ভব যখন ইসলামী আন্দোলন জনগণের স্বার্থ আপন করে নেবে, তাদের অনুভূতি, অভিব্যক্তির প্রতি সমমর্মিতা প্রকাশ করবে, তাদের শোক-দুঃখে সমব্যথী হবে, আপদে-বিপদে তাদের পাশে দাঁড়াবে, তাদের সাথে একাত্ম হয়ে যাবে।

অলীক স্বপ্ন

জনগণের ওপর আমাদের বিশ্বাস এবং জনগণের শক্তিতে আমাদের আস্থার কারণে আমরা যেন কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে না দেই অথবা অলীক স্বপ্নে বিভোর না করি। ইসলামী আন্দোলনের প্রবক্তা ও তাত্ত্বিকদেরকে জাতির সামনে তাদের প্রকৃত রোগ তুলে ধরতে হবে। রোগ লুকিয়ে রাখা যাবে না যেমনটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর বেলায় করা হয়। যতই তিক্ত হোক জাতিকে আসল সত্য জানাতে হবে। এমন অলীক স্বপ্ন দেখানো উচিত হবে না যদি সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা না যায়।

মুসলিম সুফি মনীষীরা আশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে বলেছেন, আশার সঙ্গে থাকে কর্ম সাধনা, অন্যথায় তা ইচ্ছে মাত্র। আশা হচ্ছে ঈমানদারদের লক্ষ্য, আর যারা কিছু করতে চায় না, ইচ্ছে হচ্ছে তাদের চাতুরী। আল-কোরআন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলছে, যারা দাবি করে যে বেহেশত কেবল তাদেরই অথচ তারা ঈমানও আনে না আমলও করে না। সূরা আল বাকারা'র ১১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ওগুলো তাদের মনের বাসনা, আপনি বলুন (হে মুহাম্মদ) তোমাদের প্রমাণ আন যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) তার পুত্র হাসান (রা.) কে বলেছেন ঃ সাবধান, ইচ্ছের ওপর মোটেই নির্ভর করো না। ইচ্ছে আহম্মকদের অবলম্বন। একজন আরব কবি বলেছেন ঃ ইচ্ছের দাস হয়ো না। কেননা, ইচ্ছে সম্বলহীনদের সম্বল।

যে আন্দোলন অমানিশার অন্ধকারকে উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত করতে চায়– আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সুন্দর ভবিষ্যত কামনা সে আন্দোলনের চালিকা শক্তি। আশা-আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছে থেকে ভিন্ন। কেননা ইচ্ছে অনুযায়ী কিছু না পেলে হতাশায় পর্যবসিত হয়, আর আশা-আকাঙ্ক্ষায় নিরাশা ও আশাহীনতার কোনো স্থান নেই।

আমাদেরকে জনগণের সামনে অবশ্যই কঠিন বাস্তবতা তুলে ধরতে হবে। তাদেরকে ভবিষ্যতের বিপদ সম্পর্কে সাবধান করতে হবে যেন তারা সে দুর্ভোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত হতে পারে। তারা যেন এ বিভ্রমে না থাকে যে ভবিষ্যতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ, কণ্টকহীন অথবা যেখানে বিনাশ্রমে ফল লাভ করা সম্ভব।

ইসলামী আন্দোলন মুসলিম জনগণের কাছে ইসলামী শ্লোগান ও সমস্যার সমাধান সম্বলিত উক্তি প্রচারের ক্ষেত্রে যে ভুল করছে তা সংশোধন করতে হবে। যখন শ্লোগানে বলা হয়, 'ইসলামই সমাধান', 'ইসলাম ছাড়া কোনো আশা নেই' অথবা 'আমাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান ইসলাম'- তখন সাধারণ মানুষ মনে করে, এসব শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে নির্বাচনে তাদের প্রার্থীদের সমর্থন দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পার্লামেন্টে পাঠালেই যাদুর কাঠির স্পর্শে বা অলৌকিকভাবে তাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ইসলামী আন্দোলনকারী ও আন্দোলনের বুদ্ধিজীবীদের সরাসরি ও সহজভাবে জনগণকে বোঝাতে হবে ইসলাম জনগণের মাধ্যমেই জনগণের সমস্যার সমাধান চায়। আল্লাহ তাদের কাজগুলো॥জমি চাষ, পশুপালন, শিল্পায়ন, বাণিজ্যের প্রসার, অবকাঠামো গড়ে তোলা, উৎপাদনমুখী কাজ করার জন্যে মুসলিম জনশক্তির সমাবেশ ঘটানো অথবা জাতিকে অলসতা ও শক্তির অপচয় থেকে রক্ষার জন্যে পৃথিবীতে ফেরেশতা পাঠাবেন না।

সুন্দর জীবনযাপনের জন্যে প্রয়োজন ন্যায়পরায়ণ সমাজ। সে সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকেই কাজ করতে হবে। আল্লাহ সাহায্য পাঠাবেন এ প্রত্যাশায় মসজিদে অবস্থানকারী কয়েক জন লোককে ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বললেন ঃ তোমাদের অলসভাবে বসে থাকা উচিত নয় এবং আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা সাথে সাথে পাওয়ার চেষ্টা করো না। এরপর বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ, আমার ভাগ্যে যা কিছু আছে আমার কাছে পাঠাও। অথচ তিনি জানতেন যে আকাশ থেকে সোনা-রূপা বর্ষিত হবে না। আল্লাহ বলেন ঃ আর যখন জুম'য়ার নামাজ শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা জমিনের ওপর ছড়িয়ে পড় এবং কাজের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা তালাশ করো (সূরা জুম'আ ঃ ১০)। আল-কোরআনে পরিষ্কারভাবে এ অলঙ্ঘনীয় বিধানের কথা বলা হয়েছে এভাবে ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনে (সূরা রা'দ ঃ ১১)।

এটি হচ্ছে সূচনা বিন্দু। আমাদের ভুল ধারণা, খারাপ চিন্তাধারা, ঘৃণ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অগ্রহণযোগ্য নীতি-নৈতিকতাকে সঠিক ধারণা, স্বচ্ছ ও সৎ চিন্তা, প্রশংসনীয় চরিত্র ও উন্নত নৈতিকতায় পরিবর্তিত করতে হবে। মানুষ এখন যে জীবনধারায় অভ্যস্ত তা অবশ্যই পাল্টাতে হবে। জীবনকে কাজ ও উৎপাদনমুখী করতে হবে। অলস ও ভবঘুরে হলে চলবে না। জীবনকে তামাশা নয় গুরুতর বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। জীবন কৃচ্ছ্রতার, বিলাসিতার নয়। সুবিচারের, অবিচারের নয়। জীবন মেহনতের, অলসতার নয়।

ভ্রান্ত ধারণার সংশোধন

ইসলামী আন্দোলন ও তার প্রবক্তাদের দায়িত্ব হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে যে সব ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে তা সংশোধন করা। কারণ ইসলামী চিন্তা-চেতনাই সমাজ গঠন ও প্রগতির হাতিয়ার হতে পারে।

বহু ধার্মিক লোক ইসলামের কয়েকটি প্রধান মূল্যবোধ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। এর মধ্যে রয়েছে ঈমান, তাকওয়া, সততা ও স্পষ্টবাদিতা।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ আর এসব জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো ও তাকওয়া সম্পন্ন হতো, তবে আমি তো তাদের জন্যে আকাশ ও পৃথিবীর বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম (সূরা আল আ'রাফ ঃ ৯৬)। আরও বলা হয়েছে ঃ এবং যে আল্লাহকে

ভয় করে এবং তাঁর প্রতি স্বীয় দায়িত্ব পালন করে, আল্লাহতায়ালা তার জন্যে সকল বিপদ থেকে মুক্তির পথ বের করে দেন। তাকে এমন স্থান থেকে রিজিক পৌঁছিয়ে দেবেন যা সে চিন্তাই করতে পারে না (সূরা তালাক ঃ ২-৩)। অথবা বলা হয়েছে ঃ এবং বস্তুত আমরা লাওহে মাহফুজের পর যবুরে উপদেশ বাণী লিপিবদ্ধ করেছি যে আমার সৎ বান্দারা পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভ করবে (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৫)। অন্য সূরায় বলা হয়েছে ঃ আর এরা (অমুসলিমরা) যদি আল্লাহতে বিশ্বাসী হতো এবং ইসলামের সঠিক পথে চলত তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম (সূরা জ্বীন ঃ ১৬)।

সাধারণ মানুষ যখন এসব আয়াত তেলাওয়াত করে, তারা মনে করে এসব আয়াতে কতিপয় আচার-অনুষ্ঠান ও ফরজ পালনের কথা বলা হয়েছে। যেমন নামাজ, রোজা, তসবিহ, তাহলিল, তাকবীর ইত্যাদি জিকির-আজকার করা এবং সকল নিষিদ্ধ কাজ মদ-জুয়া ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা। নিঃসন্দেহে এগুলো ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বীন, ঈমান ও তাকওয়া কেবল এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। সূরা জারিয়া'র ৫৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ আর আমি জ্বীন ও মানুষকে এজন্যে সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমারই ইবাদত করে। আল্লাহতায়ালা যখন মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেন তখন তিনি এ দ্বারা এটিও বুঝিয়েছেন যে মানুষ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি বা খলীফা হবে, যে পৃথিবীকে তারা জ্ঞান ও শ্রম দিয়ে আবাদ করবে ও গড়ে তুলবে। আল্লাহ বলেন ঃ নিশ্চয়ই আমি ভূপৃষ্ঠে একজন প্রতিনিধি পাঠাবো (সূরা আল বাকারা ঃ ৩০)। তিনিই তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে তোমাদেরকে আবাদ করেছেন (সূরা হুদ ঃ ৬১)। এখানে আবাদ শব্দটির অর্থ হলো তিনি চান তোমরা এটি আবাদ করো ও গড়ে তোল। এ আবাদ ও গড়ে তোলার কাজটিও ইবাদতের মধ্যে গণ্য।

ঈমান, তাকওয়া, সততা ও স্পষ্টবাদিতার দাবি হচ্ছে আমাদের বৈষয়িক জীবনের সাথে দ্বীনি জিন্দেগীর ভারসাম্য রচনা করা, ইসলামের বিশ্বজনীন আচার-বিধি অনুসরণ করে আল্লাহর বন্দেগী করা, আমাদের শত্রুর মোকাবিলায় সর্বশক্তি দিয়ে প্রস্তুত থাকা, জমি চাষ করা এবং কলকারখানায় কাজ করা। জাতির দ্বীনি ও বৈষয়িক জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান ও শিল্পের সকল দিক কাজে লাগান। কেননা মুসলিম ফকিহগণ একাজকে সমগ্র জাতির জন্যে সামষ্টিক দায়িত্ব (ফরজে কেফায়া) বলে গণ্য করেছেন। যদি সবাই মিলে এ কর্তব্য পালন না করা হয় তবে তা হবে গর্হিত অপরাধ।

কাঙ্ক্ষিত দ্বীনদারী দরবেশের হাতের তসবিহ নয়, স্বঘোষিত শায়খে'র মাথার পাগড়িও নয়, কিংবা ইবাদত-বন্দেগীর জন্যে মুসল্লীর বেছে নেয়া নির্জন স্থান বা খানকা নয়। দ্বীনদারী মানে জ্ঞান ও কর্মসাধনা, দ্বীনদারী ও দুনিয়াদারী, দেহ ও আত্মা, পরিকল্পনা ও সংগঠন, উৎপাদন ও উন্নয়ন, পূর্ণতা ও উৎকর্ষতা অর্জন। হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে ঃ যত সুন্দরভাবে একটি কাজ করা উচিত, মানুষ ঠিক সেভাবে কাজটি সমাধা করলে আল্লাহ খুশি হন (বায়হাকী)। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর মধ্যে নৈপুণ্য নিহিত রেখেছেন (মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলমানদের সকল কাজে সুদক্ষ হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। এমনকি একটি ক্ষুদ্র সরীসৃপ মারার ক্ষেত্রেও। রাসূলের (সা.) এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ঃ যে এক আঘাতে একটি টিকটিকি মারে সে যেন একশ নেকী অর্জন করল। যে দু'টি আঘাতে মারল সেও নেকী করল (প্রথমটার চেয়ে কম), আর যে তিনটি আঘাতে মারতে পারল সেও নেকী করল (দ্বিতীয়টার চেয়ে কম) (মুসলিম)। সব কাজ ভালোভাবে করার চেষ্টা চালাতে হবে, যদি কাজটি তুচ্ছও হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবিরা ইসলামকে ফকীর-দরবেশের ধর্ম মনে করেননি, কিংবা ঈমান ও দ্বীনদারীকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি অথবা উন্নত জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা বাদ দিয়ে একমাত্র ফরজ আমল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাননি। সা'দ ইবনে আল রাবীর (রা.) কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে দান গ্রহণের প্রস্তাব পেয়ে আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করে বললেন- আমি ব্যবসায়ী, বাজার কোথায়, আমাকে দেখিয়ে দিন। তিনি ব্যবসা করে বিপুল মুনাফা অর্জন করেন। আর এ ব্যবসা তার ঈমান ও দ্বীনদারীকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন করেনি, বরং তিনি এমন ঈমানদার ও দ্বীনদার ছিলেন যে বেহেশত লাভের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জনের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (সা.) যার বেহেশতে প্রবেশের আগাম সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং যার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ওফাতের সময় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। আব্দুর রহমান বিন আউফ হযরত ওমর (রা.) এর গঠিত ছয় সদস্যের মজলিশে শূরার সদস্যও ছিলেন। হযরত ওমর তাঁর অবর্তমানে তাদের মধ্য থেকে একজন খলীফা নির্বাচনের জন্য এ মজলিশ গঠন করেন।

তারাই ধর্মভীরু ঈমানদার যারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস এবং সততার বলে পার্থিব কল্যাণের জন্য কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি নেক কাজ করার ব্যাপারেও সদা সচেষ্ট। তাই আল্লাহতায়ালা তাদের ইহলৌকিক প্রচেষ্টায় রহমত দান করেন এবং আখেরাতেও তাদের পুরস্কার দিতে কার্পণ্য করবেন না।

মেহনতী মানুষ

মেহনতী মানুষ বলতে আমি বোঝাতে চাই বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিল্প শ্রমিক ও কারিগর। এরা বর্তমানে বড় বড় শহর নগরে কর্মরত এক বিশাল জনগোষ্ঠী। এ সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণী তাদের অধিকার আদায় এবং অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে ধর্মঘটের ডাক দিয়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অচল করে দিতে পারে।

এক্ষেত্রে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, আজ পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণীর ওপর সামান্যই প্রভাব ফেলতে পেরেছে। আমাদের সমাজের এ স্তরে বামপন্থীরা এখনো অধিকতর প্রভাবশালী ও সোচ্চার কণ্ঠ। বামপন্থীরা ব্যাপকভাবে তাদের স্বার্থে শ্রমিকদের দাবি ও ইচ্ছাকে কাজে লাগায়। মিসরে ইসলামী আন্দোলনের মূল সংগঠন ইমাম হাসান আল বান্নার নেতৃত্বাধীন ইখওয়ানুল মুসলিমিন মিসরীয় শ্রমিকদের একটি গ্রুপ নিয়ে কাজ শুরু করেছিল। ইমাম যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছিলেন তার প্রতি সমর্থনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এসব শ্রমিক ইসমাইলিয়ায় আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে।

অধিকাংশ মুসলিম দেশে (মিসর, সুদান, জর্ডান, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, পাকিস্তান ইত্যাদি) ছাত্র ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের শেকড় গভীরে প্রোথিত করা সম্ভব হলেও, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আন্দোলনের উপস্থিতি নগণ্য। সুদানী সমাজে ইসলামী আন্দোলন অত্যন্ত প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও সুদান ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্টের নেতা ড. হাসান আল তুরাবী তার 'সুদানে ইসলামী আন্দোলন' নামক গ্রন্থে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আন্দোলনের একচেটিয়া দাপট রয়েছে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা বেশ প্রভাব খাটাতে সক্ষম।

শ্রমিক শ্রেণীর মাঝে ইসলামী আন্দোলনের বিস্তারে ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে আমি অবগত নই। শ্রমিকদের মাঝে ধর্মীয় চেতনার দীনতাই কি এর কারণ? কিন্তু ধর্ম যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য অংশ শ্রমিকরা তার অন্তর্ভুক্ত হয়েও তাদের ধর্মবোধ দুর্বল হলো কেন? প্রকৃত ইসলাম ও জীবনে ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব এবং আমদানি করা বিজাতীয় ধ্যান-ধারণার প্রভাবই কি এর কারণ? এ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে।

নাকি শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি স্বীকৃতি ও স্বার্থরক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ এবং তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার প্রতি ইসলামী আন্দোলনের সমর্থন দানে ব্যর্থতা কিংবা লোভী পুঁজিপতি ও শোষক-শাসকদের কর্মকাণ্ডই এর কারণ? নাকি এটি বামপন্থীদের সফলতা যারা তাদের ধ্বংসাত্মক নীতি ও বস্তুবাদী দর্শন প্রসারে শ্রমিকদেরকে ব্যবহারের লক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে শ্রমিকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে

থাকে। বামপন্থীরা এসব কাজে সিদ্ধহস্ত। প্রলুব্ধ করার কৌশলও তাদের জানা আছে এবং ইসলামী আন্দোলন শ্রমিকদের কখনো কোনো উপকারে আসবে না–বামপন্থীরা এ অপপ্রচার চালাতেও পারঙ্গম।

কারণ যাই হোক, এক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনের কর্মকৌশল পর্যালোচনা করা উচিত। কেননা, শ্রমিক শ্রেণী মুসলিম সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলাম এখনো মেহনতী মানুষের জীবনের সুদৃঢ় চালিকা শক্তি। কেননা তারা বিশ্বাস করে যে ইসলামই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যা সবার ওপরে শ্রমের মর্যাদা দেয় এবং শ্রমিকদের প্রতি সুবিচারে আপসহীন। ইসলামের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আইনগত বিধিবিধান শ্রমিক ও শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ করে এবং যারা তাদের প্রতি অন্যায় করে ও স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহারের চেষ্টা করে ইসলাম এ মহলের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ায়। ইসলাম প্রত্যেক বেকার শ্রমিকের কর্মসংস্থান এবং সমাজের সকল কর্মক্ষম লোকের ভরণপোষণে সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেয়।

শ্রমিক সমাজে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি অনুকূল মনোভাব সৃষ্টিতে একটি নতুন উপাদান এখন কাজে লাগছে। সেটি হচ্ছে কমিউনিস্ট দর্শন ও পদ্ধতির পতন। এর ফলশ্রুতিতে পূর্ব ইউরোপের একনায়ক সরকারগুলোর বিদায় ঘণ্টা বেজে ওঠে। শ্রমিক শ্রেণী তাদেরই স্বার্থ রক্ষার নামে প্রতিষ্ঠিত একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এমন কি সমাজতন্ত্রের সূতিকাগার সোভিয়েত ইউনিয়ন পেরেস্ত্রয়কা দর্শনের আলোকে সামাজিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছে। মার্ক্সবাদী ও সমাজতন্ত্রী সরকার যা শ্রমিকদের জন্য শ্রমিকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, শ্রমিকদের কাঙ্ক্ষিত সুখশান্তি আনতে ব্যর্থ হয়েছে– যে সুখের আশায় মেহনতী মানুষ সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এটি প্রমাণিত হয়ে গেছে যে কমিউনিস্ট শাসনের নিগড়ের চেয়ে মুক্ত সরকারের শাসনাধীনেই শ্রমিকরা অনেক ভালো থাকে।

এ বিষয়টি বিশদভাবে বোঝার জন্য পুনরেকত্রীকরণ-পূর্ব জার্মানীর দুই অংশ হচ্ছে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উভয় অংশে শ্রমিকরা কিভাবে জীবনযাপন করতো, কি রকম ছিল তাদের অনুভূতি? পূর্ব জার্মানীর মানুষ মনে করত তারা যেন এক বিশাল কারাগারে বাস করছে। তারা সামান্য সুযোগ পেলেই গণহারে পশ্চিম জার্মানীতে পালিয়ে যেতো। এর চাইতে ভালো প্রমাণ আর কি হতে পারে?

ব্যবসায়ী ও অর্থ লগ্নিকারী

যেসব ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনের প্রভাব বিস্তার করতে হবে তার মধ্যে বণিক, ব্যবসায়ী এবং অর্থলগ্নিকারী গোষ্ঠীও গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্প্রদায়ের লোকজন অর্থ ও পুঁজি, লাভ ও লোকসান, একচেটিয়া কারবার ও প্রতিযোগিতার জগতে বাস করে। এ সম্প্রদায়ের মানুষ সাধারণত হালাল-হারামের বিধিনিষেধের কথা ভুলে যায়, আল্লাহর জিকির, সালাত ও জাকাত আদায়কে উপেক্ষা করে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে অশুভ ও ঝুঁকির দিক রয়েছে সে ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের দিকনির্দেশনা ও নসিহত দেয়ার ক্ষেত্রে সজাগ ছিলেন।

তিনি প্রতারণার বিরুদ্ধে তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন ঃ যে প্রতারণা করে সে আমাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। একচেটিয়া কারবারের বিরুদ্ধে তিনি সতর্ক করে বলেছেনঃ যে পণ্যের একচেটিয়া ব্যবসা করল সে অন্যায় করল অর্থাৎ সে পাপী। তিনি ব্যবসায়ীদের আল্লাহর নামে অতিরিক্ত কসম খাওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। যেসব ব্যবসায়ী সর্বশক্তিমান আল্লাহকে পণ্য বানায় তাদের সমালোচনা করে বলেছেন, তারা যেন আল্লাহর কসম না খেলে বেচাকেনা করতে পারে না। তিনি মিথ্যা শপথের বিরুদ্ধেও সতর্ক করে দিয়েছেন, যে শপথের কারণে হয়তো লেনদেন বাড়বে কিন্তু বিক্রেতা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। তিনি সুদের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ যারা সুদ নেয়, যারা দেয়, যারা এর চুক্তিপত্র লেখে এবং যারা এর সাক্ষী হয়, আল্লাহ তাদের লা'নত দেন। তিনি যে পণ্য মজুদ নেই (গারার) তা বিক্রয়ের বিরুদ্ধেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। কেননা পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাকে অজ্ঞ রাখা হয় এবং যখন মাল হাজির করা হয় তখন অনিবার্যভাবেই বিবাদ সৃষ্টি হয়।

পবিত্র কোরআনে পরিমাণ ও ওজনে প্রতারণা করার বিরুদ্ধেও ভর্ৎসনা করে বলা হয়েছে ঃ দুর্ভোগ রয়েছে মাপে ও ওজনে কম দাতাদের (যারা অন্যের অধিকার খর্ব করল), যখন তারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয় তখন পুরোপুরি নেয়, আর যখন মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে এবং মহান দিবসে, যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন ঃ ১-৬)।

অন্য দিকে আল-কোরআন সে সব ব্যবসায়ীর প্রশংসা করেছে যারা আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য এবং ফরজসমূহ পালনে গাফেল নয়। পবিত্র কোরআনে নামাজ আদায়ে তাদের নিয়মিত মসজিদে যাতায়াতের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ (তারা রয়েছে) এমন

সব গৃহে বা মসজিদে যা আল্লাহ্ পবিত্রতা ও মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য আদেশ দিয়েছেন, এতে সকাল ও সন্ধ্যায় এমন সব লোক আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে যাদেরকে ক্রয় ও বিক্রয় গাফেল করে রাখতে পারে না আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং নামাজ আদায় করা ও যাকাত প্রদান থেকে, তারা সেদিনের ভয় করতে থাকে যেদিন বহু অন্তর ও চোখ উল্টে যাবে (সূরা নূর ঃ ৩৬-৩৭)।

ব্যবসায়ী-বণিকরা জাতির সম্পদের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। তারা জনগণের কাছে পণ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভোগ্যপণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। এভাবে তারা জাতীয় অর্থনীতি ও আর্থিক নীতির ওপরে প্রভাব খাটায়। সুতরাং ব্যবসায়ীদেরকে সতর্ক করতে হবে যা তাদের করা উচিত নয় তা যেন কখনোই না করে এবং তাদের সম্পদের যাকাত আদায় এবং যাকাত ছাড়াও অন্যান্য দান খয়রাত করে।

বণিক সম্প্রদায় ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের আওতায় পড়ে না এবং তারা কেবল দুনিয়াদারি নিয়ে ব্যস্ত, তাই তাদের মধ্যে কাজ করা নিরর্থক মনে করা উচিত নয়। তারাও অন্যান্যের মত মানুষ। উপদেশ ও হুঁশিয়ারী তাদেরকে নাড়া দেয়, বিচক্ষণ বচন, সহিষ্ণু ও সঠিক উপস্থাপনায় তারাও মুগ্ধ হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দাওয়াতের প্রাথমিক দিনগুলোতে বহু ব্যবসায়ী আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) এর ওপর ঈমান আনেন। এমন কি তাদের ব্যবসা ও পুঁজি ধ্বংস বা ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও তারা তাওহীদের দাওয়াতে সাড়া দেন। দেখা যায় যারা একেবারে প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর (রা.), ওসমান (রা.) ও আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.)। তারা সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমত লাভের আশায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার জন্য তারা ঘরবাড়ি, সহায় সম্পদ ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। তারা আল্লাহর জন্যই ভাগ্যের এ পরিবর্তন সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেন।

আমাদের এ যুগে, আমরা দেখছি বহু সৎ ব্যবসায়ীকে দুনিয়ার জীবনের চেয়ে পরকালের জীবনকে গুরুত্ব দিয়ে দ্বীনি কাজে স্বেচ্ছায় অর্থ ব্যয় করছেন। আল্লাহর রহমতের নিদর্শন হিসেবে প্রাপ্ত ধন সম্পদ তারা আঁকড়ে ধরে রাখেন না। কেননা তারা নিজেদের জান ও মাল ইসলামী দাওয়াহ ও আন্দোলনেরই সম্পদ বলে মনে করেন।

পাশ্চাত্যের খৃস্টান পুঁজিপতিরা তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য সারা বিশ্বের খৃস্টান প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোটি কোটি ডলার প্রদান করছে। ইহুদী পুঁজিপতিদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। তাদের কৃপণতা ও অর্থপূজার স্বভাব সত্ত্বেও তারা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে ও পরে ইহুদী স্বার্থে অকাতরে অর্থ ব্যয় করে চলেছে। মুসলিম বিত্তশালীদেরকে তো কম করলে চলবে না। কারণ তারা জানেন, সম্পদের মালিক

আল্লাহ। সুতরাং তাদেরকে আল্লাহর পথে এ ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে। আর এ জন্য আল্লাহতায়ালা তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

বৈষয়িক দান-খয়রাতের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের ওপর আলোকপাত করতে চাই। মুসলমানদের মধ্যে বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি রয়েছেন যারা সৎ ও সত্যনিষ্ঠ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করতে আগ্রহী। তারা উদার হস্তে দান-খয়রাত করে থাকেন। কিন্তু তাদের জানা দরকার কিভাবে ও কোন পাত্রে তারা অর্থ ব্যয় করবেন।

এ অর্থ ব্যয়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে ইসলামী কাজকর্ম। তাই যারা দান-খয়রাতে সক্ষম তাদেরকে বুঝতে হবে অর্থ ব্যয় করা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে সঠিক পথে খরচ করা। এ প্রসঙ্গে অগ্রাধিকার অর্থাৎ এখন কোন খাতটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, পরবর্তী পর্যায়ে কোন ক্ষেত্রটি জরুরী–এভাবে অর্থ ব্যয়ের খাত ক্রমবিন্যাস করে নেয়া অত্যাবশ্যক। এটি সত্যিই দুঃখজনক যে অধিকাংশ ধনী মুসলমান বিশেষ করে যারা জনহিতকর কাজে অর্থ ব্যয় করেন তারা সাধারণত মসজিদ নির্মাণ কিংবা এ ধরনের দ্বীনি প্রতিষ্ঠানেই কেবল দান-খয়রাতের ব্যাপারে বেশি আগ্রহ দেখান। এ কারণে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ ও অভিযোগ রয়েছে।

আফ্রিকার 'ইসলামিক দাওয়াহ অর্গানাইজেশন' এ অভিযোগ উত্থাপন করেছে। ইন্দোনেশিয়ার 'সুপ্রীম কাউন্সিল ফর ইসলামিক দাওয়াহ'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ড. মুহাম্মদ নাসের এবং তাঁর সহযোগীরাও একই অভিযোগ করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, মার্ক্সবাদ ও অন্যান্য মতাদর্শের মোকাবিলায় যারা ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষার প্রচার প্রসারে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের কাছ থেকেও একই ধরনের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

ইসলামী আন্দোলন ও দাওয়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও একনিষ্ঠ সমর্থকগণ একমত হয়েছেন যে কাজের এমন কোনো কোনো ক্ষেত্র রয়েছে যা মসজিদ নির্মাণের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেমন মানুষ তৈরি করা–যে মানুষ সভ্যতা নির্মাণ করে, দাওয়াতি কাজে সাফল্য বয়ে আনে, আশার দোলাচলে এগিয়ে যায়, মসজিদ নির্মাণ করে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ইসলামী আদলে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়।

ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রমের বিস্তার এবং মুসলমানদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য ও যথাযথভাবে ইসলামের খেদমত করার অন্যতম পয়লা কর্মসূচি। আর এ পথে অর্থ ব্যয় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য এবং এ মহতী কর্মের মাধ্যমে একজন মুসলমান নিঃসন্দেহে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। এ ধরনের কেন্দ্র মুসলিম তরুণদের কাছে খাঁটি ইসলামী আদর্শের

দাওয়াত পৌঁছে দেয়া এবং তাদের ধ্যান ধারণার পরিশুদ্ধি ও আচার-আচরণ সংস্কারে সহায়ক হবে। এ কেন্দ্র শিক্ষা শিবির, কর্মশালা, আলোচনা অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন উপায় ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে তরুণ মানসে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারবে।

ইসলামী আন্দোলনের উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সুদক্ষ, ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষিত মার্জিত কর্মীবাহিনী যাদের জীবিকার সঙ্গতি আছে তারা পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। এ কর্তব্যে অবহেলাকে তারা পাপ মনে করবে এবং এ মহৎ কর্ম সম্পাদন আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার এবং জনগণের প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। বস্তুত এ কর্মসূচির জন্য দরকার অর্থ ও সময়ের পাশাপাশি কর্মসূচির রূপায়ণে নিরন্তর প্রচেষ্টা।

মহিলাদের তৎপরতা

দাওয়াতি কাজের শুরু থেকেই ইসলামী আন্দোলন মহিলাদের দিকে মনোনিবেশ করেছে। ইমাম হাসান আল বান্না 'আল আখাওয়াত আল মুসলিমাত' নামে মহিলাদের একটি সংগঠন গঠন করেন এবং তাদেরকে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার ও এমন একদল মহিলা গড়ে তোলার দায়িত্ব অর্পণ করেন যারা জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমে নিয়োজিত ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রচেষ্টায় শরিক হয়ে তাদের সহযোগী হবে। এ সংগঠনের মহিলারা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কারাবন্দী সদস্যদের পরিবারবর্গের দেখাশোনা এবং খাদ্য ও অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা রাখেন যা উল্লেখ করার মত। গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের হাতে হয়রানির আশঙ্কা উপেক্ষা করেই তারা এ ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাদের মধ্যে বেশ কয়েক জনকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। এমনি একজন হচ্ছেন জয়নাব আল গাজালী।

মহিলাদের মাঝে ইসলামী কাজের অভাব

কিন্তু আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে, মহিলাদের মধ্যে ইসলামী কাজ এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। যদিও মহিলাদের বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক ছাত্রীদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে গেছে।

আন্দোলন শুরুর পর ষাট সত্তর বছর পার হয়ে গেলেও তেমন কোনো মহিলা নেত্রী তৈরি হয়নি যারা এককভাবে দক্ষতার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও মার্ক্সবাদের মোকাবিলা করতে পারেন। মহিলাদের আন্দোলন পুরুষদের নিয়ন্ত্রণের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পুরুষরা কখনোই মহিলাদের গুণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ এবং তাদের নেতৃত্বের মেধা ও ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ দেয়নি। এ সুযোগ পেলে পুরুষদের আধিপত্য ছাড়াই মহিলারা তাদের কাজের দায়িত্ব ভার গ্রহণের সামর্থ্য প্রমাণ করতে পারতো।

সফলতার শর্ত

আমার বিশ্বাস ইসলামী আন্দোলন যদি দাওয়াত, চিন্তাধারা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলা ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারে তাহলে মহিলাদের ইসলামী কাজ সফল হবে।

এটি কোনো অসম্ভব বা কঠিন কাজ বলে আমি মনে করি না। প্রতিভাবান পুরুষদের মত প্রতিভাময়ী নারীও আছে। উৎকর্ষতা পুরুষদের একচেটিয়া নয়। পবিত্র কোরআন বিনা

কারণে আমাদের সামনে এ কাহিনী বর্ণনা করেনি যেখানে একজন মহিলার বিচক্ষণ ও সাহসী নেতৃত্বে তার স্বজাতি সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। তিনি হচ্ছেন সাবা'র রাণী। রাণী ও হযরত সোলায়মান (আ.) কে নিয়ে এ কাহিনী সূরা নমলে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি লেখাপড়ায় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক ভালো। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অন্যান্য সহকর্মীদের মতও তাই। এটি বিশেষভাবে সত্য এ কারণে যে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে লেখাপড়ার সময় বেশি পায়। আর ছেলেরা অহেতুক কাজে ব্যস্ত।

কট্টর মনোভাবের বিস্তার

আমি অকপটে বলতে চাই, পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামী আন্দোলনে একটি কট্টর মনোভাব বিরাজ করছে। এ ইস্যুতে এমন সব কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে যা পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। ঠিক এ ধরনের অবস্থা আমি বহু সম্মেলন ও সিম্পোজিয়ামে এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকাতেও লক্ষ্য করেছি। ১৯৭০ সালের মধ্যভাগে আমি একটানা কয়েক বছর যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করি। নারী ও পুরুষ উভয়েই এখানে বক্তৃতা-বিতর্কে যোগদান করেন। প্রতিটি প্রধান ইসলামী ইস্যুর ওপর মন্তব্য, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে তাত্ত্বিক, সামাজিক, শিক্ষা ও রাজনৈতিক ইস্যুও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেসব অধিবেশন শুধু মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ছিল তাতে কেবল নারী বিষয়ক প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করা হয়।

আশির দশকে আমি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে কয়েকটি সম্মেলনে যোগদান করে দেখতে পাই গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা-বিতর্কের মূল বিষয়বস্তুর অনেকাংশ থেকে মহিলাদের দূরে রাখা হয়। বেশ কয়েকজন মহিলা অভিযোগ করেন– ইসলামে মহিলাদের ভূমিকা, অধিকার, দায়িত্ব ও মর্যাদার ওপর কেন্দ্রীভূত বক্তৃতা শুনতে শুনতে তারা একঘেঁয়েমি অনুভব করছেন। এসব বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি তাদের ওপর এক ধরনের চাপিয়ে দেয়া শাস্তি বলে মনে হয়। আমি একাধিক সম্মেলনে এ দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করে বলেছি, ইবাদত-বন্দেগী ও দ্বীনি এলেম অর্জনের ক্ষেত্রে সকলের শরিক হওয়াই নিয়ম। ইসলামে কখনোই এমন কোনো মসজিদ ছিল না যেটি কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত এবং যে মসজিদে পুরুষরা শরিক হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন কোনো সমাবেশে নসিহত করতেন সেখানে মহিলারাও হাজির থাকতেন। তারা জুমা, দুই ঈদ ও অন্যান্য নামাজের জামায়াতে পুরুষদের সঙ্গে শরিক হতেন কিংবা অন্তত হাজির থাকতেন। মহিলারা তাদের একান্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারেও প্রশ্ন করতেন। তারা স্বভাবসুলভ লজ্জার অজুহাতে ধর্মীয় বিধিবিধান জানা থেকে বিরত থাকতেন না। হযরত আয়েশা (রা.) স্বয়ং একথা বলেছেন।

হাদিস গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে মহিলাদের প্রশ্ন করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর মধ্যে এমন সব প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো মহিলারা কেবল নারী সংক্রান্ত বিষয়েই করেছেন আবার সকল মহিলার পক্ষে কিছু সংখ্যক মহিলাও প্রশ্ন করেছেন। যেমন একজন মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে মহিলারা আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

মহিলারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে তাদের জন্য আলাদা দিন ও সময় বরাদ্দ করারও অনুরোধ জানিয়েছেন, যাতে পুরুষদের উপস্থিতি ছাড়াই তারা একান্তে যে কোনো বিষয় নিয়ে খোলাখুলি কথা বলতে পারেন। এমনি করে পুরুষদের সঙ্গে একত্রে সাধারণভাবে শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি মহিলাদেরকে আরো একটি বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে।

কার্যক্রমে সমস্যা

মহিলাদের ইসলামী কার্যক্রমে সমস্যা হচ্ছে পুরুষরা এর নেতৃত্ব দেয়, মহিলারা নয়। আর পুরুষরা এক্ষেত্রে কর্তৃত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে তৎপর। কেননা তারা নারী নেতৃত্বের উত্থান দেখতে চায় না। মহিলাদের ইসলামী কাজে পুরুষরা নিজেদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়, এমনকি মহিলাদের সভা সমাবেশেও। তারা নারীদের লাজুকতার সুযোগ নিয়ে কখনোই তাদের কাজকর্মে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগ দেয় না। ফলে ইসলামী আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় নারীর মেধা ও যোগ্যতা প্রমাণের কিংবা তাদের অভিজ্ঞতা ও সাধনা পরিপূর্ণ হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। জ্ঞান তিতিক্ষা ও এর মাধ্যমে জীবনের বিস্তৃত শিক্ষাঙ্গণ থেকে কিছু শেখারও সুযোগ তারা পায় না।

অবশ্য আমাদের মুসলিম বোনেরাও একেবারে দোষমুক্ত নন। তারাও তাদের পছন্দ-অপছন্দ পুরুষদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আরাম আয়েশে পরিতৃপ্ত হয়ে এ দুঃখজনক অবস্থার কাছে নতি স্বীকার করেছে। প্রচেষ্টার দরজা উন্মুক্ত ও দাওয়াতি কাজের সম্প্রসারণের জন্য পদক্ষেপ নেয়ার এখনই সময় এবং স্ব-ঘোষিত সে সব নারী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার যারা মুসলিম উম্মাহর নীতি, আদর্শ, বিধিবিধান ও মূল্যবোধের কুশলী বলে দাবী করেছে। এসব কণ্ঠ যত উচ্চই হোক, কেবল পরাজিত পদদলিত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। দ্বীন ও দুনিয়ার কোনো ক্ষেত্রেই এদের কোনো মূল্য নেই।

আমি ১৯৮৯ সালে আলজেরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। বক্তৃতার পর প্রথানুযায়ী আমি ছাত্রীদের লিখিত ও মৌখিক প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম। কয়েক জন তরুণও সেখানে উপস্থিত ছিল। একজন যুবক স্বউদ্যোগে প্রশ্নগুলো যোগাড় করে কোনটির জবাব দেয়া হবে আর কোনটি বাদ দেয়া হবে নিজেই বাছাই করে আমার কাছে পৌঁছে দিচ্ছিল। আমি এ ভূমিকাতে আপত্তি করে বললাম, কেন একটি ছাত্রী তার সহপাঠিনীদের পক্ষ থেকে এ কাজটি করছে না?

আমি বললাম, তোমরা ছেলেরা কেন মেয়েদের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছ? তোমরা হাত গুটিয়ে নাও। তাদেরকে তাদের মত করে কাজটি করতে দাও। তারাই প্রশ্নগুলো বাছাই

করে কোনটির উত্তর দিতে হবে সিদ্ধান্ত নিক এবং তাদের মধ্য থেকেই একজন উচ্চস্বরে প্রশ্নগুলো পড়ে শোনাক।

আমি যেন মেয়েগুলোর মন থেকে একটি বিরাট বোঝা নামিয়ে দিলাম। একটি ছাত্রী দ্রুত এগিয়ে এসে সেই ভূমিকা পালন করল যা এতক্ষণ আমাকে সাথে করে নিয়ে আসা যুবকটি করছিল।

১৯৯০ সালের শীতকালে বৃটেনের ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত এক মুসলিম ছাত্র কনভেনশনে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে মুসলিম মহিলাদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তৃতা দেয়ার পর প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল। সেখানেও একজন উৎসাহী তরুণ প্রশ্ন সংগ্রহ ও বাছাই করার দায়িত্ব নিল। আমি তাকে স্পষ্টভাবে বললাম, তোমার এখানে থাকার কোনো কারণ নেই। মেয়েদের মধ্য থেকে একজন এ কাজটি করলেই হবে। কেননা, মেয়েদের নিজস্ব কাজকর্ম নিজেরাই চালিয়ে নেয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু উক্ত সজ্জন তরুণ আমাকে বললেন, এখানকার নিয়মানুযায়ী তাকেই এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তাই সে এটি বন্ধ করতে পারে না। সে তার মতো ব্যাখ্যা দিল, আর আমাকে তা মেনে নিতে হলো।

মিসর ও আলজেরিয়ার বোনেরা আরেকটি অভিযোগ করে থাকেন। ইসলামী আন্দোলনের কোনো সক্রিয় মহিলা কর্মী আন্দোলনের মাধ্যমে পরিচিত হয়ে আন্দোলনের কোনো সক্রিয় পুরুষ কর্মীকে বিয়ে করার পর দেখা যায় তিনি মহিলাটিকে আন্দোলনে অংশ গ্রহণে শুধু বারণই করেন না, তাকে ঘরে থাকতে বাধ্য করেন। এভাবে তিনি একটি মশাল নিভিয়ে দেন যা এক সময় অপর মুসলিম নারীকে আলোর পথ দেখাচ্ছিল।

এগুলো এমন সাধারণ ঘটনা হয়ে গেছে যে ইসলামী আন্দোলনে কর্মরত একটি আলজেরীয় মেয়ে একবার আমাকে চিঠি লিখে জানতে চাইল এমনি পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য বিয়ে করতে অস্বীকার করা তার জন্যে হারাম কিনা। কারণ অনেক বোনকে দেখা গেছে, তারা আন্দোলন ও দাওয়াতি কাজ থেকে দূরে সরে গিয়ে অলস জীবন কাটানোর পথ বেছে নিয়েছে এমন এক সময়ে যখন কমিউনিস্ট, সেক্যুলার ও উদারপন্থী মহিলারা তাদের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে।

আপত্তি ও খণ্ডন

কট্টরপন্থীরা প্রশ্ন করতে পারেন, আমরা কিভাবে মুসলিম মহিলাদের ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন এবং ইসলামী কাজকর্মে তাদের উপস্থিতি প্রমাণের জন্য নেত্রীত্বের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারি। যখন পবিত্র কোরআনে তাদেরকে ঘরবাড়ির মধ্যে থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ এবং তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান করো এবং নিজেদেরকে অজ্ঞতা-যুগের মতো প্রদর্শন করো না (সূরা আহ্‌জাব ঃ ৩৩)।

এ ধরনের অতি উৎসাহী ভাইদের প্রশ্নের জবাবে বলতে চাই, এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সহধর্মিনীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাঁদের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে

যা অন্য মহিলাদের নেই। তাঁদের জন্যে এমন বিধিনিষেধ ছিল যা অন্য মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা কোরআন শরীফে তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন ঃ হে নবীর সহধর্মিনীগণ! আপনারা সাধারণ মহিলাদের মতো নন (সূরা আহ্‌জাব ঃ ৩২)।

তাই বলে এ আয়াত হযরত আয়েশা (রা.) কে উটের যুদ্ধে গমন থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তাঁর ধারণানুযায়ী রাজনীতিতে সততার দাবি পূরণেই তিনি এ যুদ্ধে যান। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দু'জন প্রবীণ সাহাবি তাঁকে সমর্থন দান করেন। এ দু'জন সাহাবি খেলাফতের জন্যে মনোনীত হয়েছিলেন এবং বেহেশতে প্রবেশের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, পরবর্তীকালে এ পরিস্থিতির জন্যে হযরত আয়েশা (রা.) এর দুঃখ প্রকাশ এ জন্যে নয় যে তাঁর ঘরের বাইরে যাওয়া অবৈধ ছিল, বরং এ কারণে যে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক ছিল না। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন এবং তাঁর রূহের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

কিন্তু যারা দাবি করেন, সকল মহিলাই এ আয়াতের লক্ষ্য, তাদের মত পরীক্ষা করলে আমরা দেখব, এর অর্থ মহিলাদের ঘরের মধ্যে থাকা এবং তাদেরকে বাইরে বের হতে বারণ করা নয়। কেননা কোরআন এভাবে ঘরের মধ্যে থাকার বিধান সে সব মহিলাদের জন্য শাস্তি স্বরূপ দিয়েছে যাদের ব্যভিচার চারজন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এ নিয়ম চালু ছিল কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত কঠোর শাস্তির বিধান 'হদ' (ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট) প্রবর্তনের আগে। সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ এবং তোমাদের যে সব স্ত্রীলোক ব্যভিচার করে ঐ স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী করে নাও। অতঃপর তারা যদি সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাদেরকে গৃহে আবদ্ধ করে রাখো যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু আসে অথবা আল্লাহতায়ালা তাদের জন্যে অন্য কোনো পথ নির্ধারণ না করেন (সূরা আন নিসা ঃ ১৫)।

এছাড়াও আল্লাহর আদেশ ঃ এবং নিজেদেরকে অজ্ঞতা-যুগের মতো প্রদর্শন করো না (আহ্‌জাব ঃ ৩৩)। এখানে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, চাকচিক্যময় প্রদর্শনী না করে শালীন পোশাকে সজ্জিত হয়ে মহিলাদের বাইরে যাওয়া বৈধ। ঘরের মধ্যে কোনো মহিলার সাজসজ্জা করা নিষিদ্ধ নয়, কারণ ঘরের মধ্যে তার ইচ্ছামতো সুন্দর করে সাজসজ্জা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেবল ঘরের বাইরে রাস্তাঘাটে, বাজারে অন্য কোথাও যাওয়ার সময় চাকচিক্যময় সাজসজ্জা গ্রহণ থেকে তাকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে

ঈমানের আলোকে প্রশিক্ষণ

জনগণের মধ্যে পরিবর্তন আনার মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে যে কোনো ইসলামী আন্দোলনের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণই হচ্ছে মৌলিক ও আবশ্যকীয় কৌশল। শিক্ষা কর্মসূচির মৌলিক লক্ষ্য হওয়া উচিত মুসলিম অগ্রণী দল গড়ে তোলা, যারা ইসলামের কাজ এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে তাঁর সাহাবিরা যেমন ছিলেন এ যুগে আমাদের কাছে অগ্রণী দলের গুরুত্ব সে রকম।

এ অগ্রণী দলের সদস্যদের সর্বপ্রথম যোগ্যতা হবে ঈমান। আমি বোঝাতে চাই কোরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত ঈমান, যে ঈমানের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সংশ্লিষ্ট সত্তরটির বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে; যে ঈমানের ওপর বহু গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। কেননা ঈমান খেয়াল খুশি অথবা কল্পনা থেকে আসে না। ঈমান অন্তর থেকে উৎসারিত এবং আমল বা কর্মের দ্বারা প্রমাণিত।

সুতরাং ঈমান অর্থ কেবল বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান নয়, যার ফলশ্রুতিতে অন্তরে আলোর ছোঁয়া লাগে না অথবা ইচ্ছা শক্তিকে আলোড়িত করে না। কিংবা আল্লাহ, প্রভু, দ্বীন ও ইবাদত-বন্দেগী; তাওহীদ ও তাগুত এবং জাহেলিয়াত-এর মত পরিভাষাকে আত্মস্থ করা নয়। এসব বিষয় মস্তিষ্কে ধারণ করে সত্যিকার ঈমানদারদের যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তা অর্জিত হয়েছে বলে গৌরব বোধ করা নয়। মূলত এগুলোই হচ্ছে চরম ও পরম বিশ্বাস। ঈমান অর্থ শব্দ ও পরিভাষা নিয়ে অন্যদের সঙ্গে যুক্তিতর্ক ও বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া নয়।

যুক্তিতর্ক বা বাকযুদ্ধ কোনোটিই সে রূপ ঈমান জাগ্রত করবে না যেমন ফেরাউনের যাদুকররা মূসা (আ.) ও হারুনের (আ.) প্রভুর ওপর ঈমান এনেছিল অথবা রাসূলুল্লাহ (সা.) র সাহাবিরা যেমন আল্লাহর কালামের ওপর ঈমান এনেছিলেন। যে ঈমান দরকার তা হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত প্রথম কাতারের ঈমান। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের যে আয়াতে আল্লাহতায়ালা আরব বেদুঈনদের 'আমরা বিশ্বাস করি' উক্তির জবাবে বলছেন, বিশ্বাস তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেনি–তা উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। আল্লাহতায়ালা সূরা হুজরাতের ১৫ নং আয়াতে বলেন ঃ কেবল মুমিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছে, অতঃপর তাতে সন্দেহ পোষণ করেনি, বরং আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল দিয়ে লড়াই করেছে; এরাই সত্যবাদী।

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যার তিনটি গুণ রয়েছে, সেই বিশ্বাসের মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারবে। সেগুলো হচ্ছে, যে কোনো জিনিসের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসা, আল্লাহর জন্যেই কাউকে ভালোবাসা

এবং আল্লাহ যে কুফর থেকে রক্ষা করেছেন সেই কুফরের দিকে ফিরে যাওয়াকে ঘৃণা করা এমনভাবে যেমন দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করা হয় (বুখারী ও মুসলিম)।

নেতার অনুসারী সাধারণ মানুষের জন্যে আধা আনুগত্য কিংবা এক-চতুর্থাংশ আনুগত্য যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের অগ্রণী দলের অবশ্যই খাঁটি ঈমান থাকতে হবে। তাদের বিশ্বাস কখনোই কম বা ঘাটতি হলে চলবে না।

ইমাম হাসান আল বান্না তার শিষ্যদের বলতেন, আমাকে বারো হাজার মুমিন দাও, আমি পাহাড় অতিক্রম করব, সাগর পাড়ি দেব, দেশ জয় করব।[১] ইসলামী উম্মাহর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে এ সংখ্যা কি যথেষ্ট। আমি বলি, হ্যাঁ, সম্ভব। বারো হাজার সত্যিকার মুমিন দিয়ে আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারব। কিন্তু আমি এটিও বলব, চব্বিশ হাজার অর্ধ বিশ্বাসী বা আটচল্লিশ হাজার এক চতুর্থাংশ বিশ্বাসী লোককে দিয়ে কাজ হবে না। অথবা বিশ্বাসীদের এমন একটি দল যাদের বিপুল সংখ্যা দেখে যে কেউ হতভম্ব হয়ে যেতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনের সময়ে সেই বাহিনী কোনো কাজে লাগত না।

আমরা মদিনার আনসারদের মতো ঈমানদার চাই যুদ্ধের সময় যারা বিপুল সংখ্যায় যোগদান করত কিন্তু গণিমতের মাল বন্টনের সময় তাদের খুব কমই দেখা যেত।

যারা সংখ্যায় বিপুল হয় কিন্তু বাস্তবে কাজের নয় তারা প্রবল জলধারার ফলে সৃষ্ট ফেনার[২] চাইতে ভালো কিছু নয়। এরা যদি সংখ্যায় লাখ লাখও হয় তবুও কখনো আন্দোলনের অগ্রণী দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য হবে না। ঈমানভিত্তিক বা আল্লাহর কালামে অনুপ্রাণিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণই হচ্ছে ইসলামের স্বার্থরক্ষাকারী একটি প্রজন্ম গড়ে তোলার পূর্বশর্ত। এ দলের কথাই মহান আল্লাহ আল-কোরআনে বর্ণনা করেছেন ঃ হে বিশ্বাসীরা! তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম ইসলাম হতে ফিরে যায়, আল্লাহতায়ালা সত্বরই এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে। তারা ঈমানদারদের প্রতি বিনয় নম্র থাকবে,

১. ইমাম বান্না (র.) মনে হচ্ছে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে খুজায়মা, ইবনে হিব্বান ও আল হাকীমের হাদিস সংকলনে সন্নিবেশিত একটি হাদিস থেকে এ মর্মার্থ গ্রহণ করেছেন। এসব হাদিসে ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, বারো হাজার ঈমানদারের একটি দল অজেয়, এ সংখ্যা কম মনে হলেও। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সূত্রেই এ হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে।

২. সওবান বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একটি হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে ঃ এমন একটা সময় আসবে যখন প্রত্যেক দিক থেকে বিভিন্ন জাতি তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে এবং তোমাদের পরাভূত করবে। ঠিক যেমন ক্ষুধার্ত লোকজন খাবারের পাত্রে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, শত্রুদের তুলনায় মুসলমানরা সংখ্যায় কম হওয়ার কারণেই কি এরকম হবে? তিনি বললেন, না; মুসলমানরা সে সময় প্রবল জলধারায় সৃষ্ট ফেনার মতো দুর্বল হবে। তোমাদের অন্তর দুর্বল হয়ে যাবে এবং তোমাদের শত্রুরা আর তোমাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হবে না। এর কারণ তোমাদের থাকবে দুনিয়ার প্রতি মোহ এবং মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা।

কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না। এটিই আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছে দান করেন; বস্তুত আল্লাহতায়ালা মুখাপেক্ষী নন, মহাজ্ঞানী (সূরা মায়েদা ঃ ৫৪)।

যথার্থ সুফি শিক্ষা

কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক যথার্থ সুফি শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরনের শিক্ষা সুফি চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়, যারা আল্লাহর সৃষ্টির আগে আল্লাহকে, ইহকালের চেয়ে পরকালকে এবং স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করার চেয়ে দ্বীনি লক্ষ্য অর্জনকে গুরুত্ব দেবে।

যদিও কেউ কেউ মনে করেন, তা সত্ত্বেও সব তাসাউফ (সুফিবাদ) খারাপ নয়। সব সুফিও বিভ্রান্ত নন, যদিও অনেকে জ্ঞান বা সঠিক ধারণার অভাবে এটি দাবি করেন। সুফিরা অন্যান্য দলের মতোই একটি দল। এ প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া 'আলফুকারা' নামে তার এক নিবন্ধে লিখেছেন ঃ সুফিদের মধ্যে আপনি সৎ লোক এবং বিপথগামী দেখতে পাবেন। এদের মধ্যে কেউ তার নফসকে কলুষিত করে, কেউ মধ্যপন্থা অনুসরণ করে, আবার এমনও আছেন যিনি আল্লাহর অনুগ্রহে অত্যন্ত সৎকর্মপরায়ণ।

আমরা অবশ্যই দার্শনিক তাসাউফের সকল ভ্রান্ত তত্ত্ব ঃ যেমন–হুলুল (ঐশী অবতারবাদ) এবং ইত্তিহাদ (আল্লাহর সঙ্গে রূহানী সংযোগ অর্থে), গোমরাহ সুফিদের কথিত রূহানী সিদ্ধিলাভজনিত নানা উক্তি এবং অর্থ কামানোর মতলবী সুফিবাদকে প্রত্যাখ্যান করি। আমরা এরূপ বিশুদ্ধ সুফিবাদ চাই, যার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছেন বুজুর্গ সুফিগণ। যেমন ঃ আল হাসান আল বসরী, আল ফুজায়েল ইবনে ইয়াদ, ইব্রাহীম ইবনে আদহাম, আবু সুলাইমান আল দারানী, আবুল কাসিম, আল জুনায়েদ প্রমুখ।

আমরা চাই কোরআন ও সুন্নাহর মধ্যপন্থা অনুসারী সুফিবাদ–যে সুফিবাদ অন্তরের পরিশুদ্ধিকে গুরুত্ব দেয়, যেখানে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানা কসরতের স্থান নেই। তাসাউফ বাহ্যিক রূপ দেখার আগে তার অন্তর্নিহিত রূপটি দেখে। সহীহ হাদিসে স্পষ্টত বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ তোমাদের দেহ ও চেহারা দেখবেন না, বরং দেখবেন অন্তর (মুসলিম)।

আমরা চাই সেই সুফিবাদ যা মনের রোগ দূর, অন্তরে শয়তানের অনুপ্রবেশের পথ বন্ধ এবং মানব হৃদয়ের লালসা চরিতার্থের প্রবণতা প্রতিরোধ করবে, যেন মানুষ পাপাচার পরিত্যাগ করে প্রকৃত নৈতিক মূল্যবোধ ও পুণ্যের অধিকারী হয়।

জনৈক মনীষী সুফিবাদকে বর্ণনা করেছেন ঃ সুফিবাদ হচ্ছে আল্লাহর নিকট সত্য থাকা এবং মানুষের জন্য কল্যাণকর হওয়া। সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা এমন লোকদের সঙ্গে আছেন যারা তাকে ভয় করে এবং নেককার (সূরা নাহল ঃ ১২৮)।

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম প্রাথমিক যুগের সুফিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ সুফিবাদ হচ্ছে সদাচার, কেউ যদি সদাচারিতায় তোমাকে ছাড়িয়ে যায় তাহলে সে তোমার চেয়ে উত্তম। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে ইবনুল কাইয়েম বলেছেন ঃ না, দ্বীনই হচ্ছে সদাচারিতা এবং কেউ যদি তাকওয়া পরহেজগারিতে তোমাকে ছাড়িয়ে যায় তবে ধর্মের দৃষ্টিতে সে তোমার চেয়েও উত্তম সদাচারি। এ ক্ষেত্রে শুধু দরকার রাসূলের (সা.) একটি হাদিস স্মরণ করা ঃ আমি নৈতিকতাকে উৎকর্ষতা দান করার জন্য বাণী বাহক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি (বুখারী)।

গুরুত্বপূর্ণ চারটি বিষয়

শিক্ষা ক্ষেত্রে চারটি বিষয়ের ওপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করতে হবে ঃ

ক. নির্ভেজাল নিয়ত

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নিজের নিয়তকে বিশুদ্ধ করা। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই কাজ করতে হবে। অর্থবিত্ত, ক্ষমতা, মানুষের অনুগ্রহ লাভ কিংবা মনের গহীনে লুকায়িত অন্য কোনো মতলব অর্জনের জন্যে নয়।

ইসলামের কাজ হচ্ছে ইবাদত ও জিহাদ। ইবাদত তখনই কল্যাণকর যখন তা নির্ভেজাল নিয়ত সহকারে আল্লাহর জন্যেই সম্পন্ন করা হয়। আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ এবং তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদতের নির্দেশ দেয়া হয়নি, এবং তাঁর ছাড়া আর কারো জন্য ইবাদত নয় (সূরা বাইয়্যেনাহ ঃ ৫)।

আল্লাহর পথে জিহাদ তখনই যথার্থ হয় যখন বিশুদ্ধ নিয়তে কেবল আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার লক্ষ্যেই করা হয়। কেবল আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা হয় এমন কাজ কিংবা যে বিশ্বাসে অন্য কারো অংশ থাকে এমন কাজ তিনি কবুল করেন না। এ কারণে ইমাম হাসান আল বান্না তার পয়লা শ্লোগান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ঃ আল্লাহ আমাদের লক্ষ্য। যাতে এটির ওপর জোর দেয়া হয় যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কারই আমাদের পরম কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য।

বলতে পারি আমরা ইসলামী সমাজ কায়েম করতে চাই। একটি ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চাই কিংবা আমরা সংহত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্যে অথবা অন্য কোনো স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছি। কিন্তু আমাদের সামগ্রিক লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। যেন তিনি আমাদেরকে তাঁর নেক বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রত্যেক ইসলামী কর্মীর এ দুটো আয়াত মনে রাখা উচিত ঃ আপনি বলে দিন– নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোনো শরিক নেই। এভাবেই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি সমস্ত অনুগতদের মধ্যে প্রথম (সূরা আন'আম ঃ ১৬২-১৬৩)।

যশ খ্যাতি প্রত্যাশীদের কোনো উদ্দেশ্য অর্জনের প্রচেষ্টা সফল হয় না। হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী তাদেরই প্রচেষ্টায় বিজয় অর্জিত হয় যারা ঃ হিতৈষী, সৎ ও শিষ্ট; তারা উপস্থিত থাকলে টের পাওয়া যায় না, অনুপস্থিত থাকলে অভাব অনুভূত হয়, যাদের অন্তর আল্লাহর পথের আলোক প্রদীপ (আল হাকিম)।

খ. আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব

দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করার দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, যে কোনো কাজে আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করা যাতে সেই কাজে উৎকর্ষতার যথার্থ প্রতিফলন ঘটে। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে যখন জিব্রাইল উৎকর্ষতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন ঃ উৎকর্ষতার চূড়ান্ত স্তর হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন আপনি তাঁকে দেখছেন। আর আপনি যদিও তাঁকে নাও দেখেন তবে তিনি আপনাকে দেখছেন।

এটি হচ্ছে দ্বীনি বা পার্থিব যে কোনো কজের পূর্বশর্ত। কারণ কাজে উৎকর্ষতা এমন এক ফরজ যা অর্জনে প্রত্যেক মুসলমানের সচেষ্ট হওয়া উচিত। আল্লাহ প্রত্যেক ব্যাপারে উৎকর্ষতার তাগিদ দিয়েছেন। আর কোনো মানুষেরই উৎকর্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে দেখছেন ও তার কথা শুনছেন এবং সে যা যা করছে তিনি তার সব কিছু জানেন–এছাড়া তার অন্য কোনো অনুভূতি থাকা উচিত নয়।

উৎকর্ষতা আরো বেশি দরকার যদি কাজটি হয় দ্বীন সম্পর্কিত। বিশেষত তা যদি হয় ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী আন্দোলনের জন্য–এ ধরনের কাজ তা ফরজে আইন বা ফরজে কেফায়া যাই হোক না কেন। ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী আন্দোলনের কাজে যেখানে অন্যান্য মুসলমান যারা শুধু অলসভাবে সময় কাটায় ও পর্যবেক্ষণ করে তাদের পক্ষে কর্মীরা দায়িত্ব পালন করে। এমনকি তারা সুযোগ পেলে ইসলামী কর্মীদের ওপর হামলাও চালায় এবং এ দ্বীনি কাজ ছেড়ে দেয়ার জন্যেও কর্মীদের প্ররোচিত করে।

ইসলামী কর্মীদের তত্ত্বাবধানের কোনো অভাব নেই। তাদের কাজের প্রশাসনিক পরিদর্শনেরও দরকার নেই, কারণ তারা আত্ম-তত্ত্বাবধানের আওতায় থাকে এবং তারাই তাদের কাজের প্রথম পরিদর্শক। তাদের অন্তরে আল্লাহর এ বাণী সব সময় জাগরূক থাকে ঃ আর তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন এবং তোমরা যা কর আল্লাহতায়ালা তোমাদের সব কাজকে দেখেন (সূরা হাদীদ ঃ ৪)।

গ. আত্মসমালোচনা

তৃতীয় কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে আত্মসমালোচনা (এহতেসাব) করা। যদি কাজ শুরুর আগে আমাদের নিয়ত স্পষ্ট এবং কাজের সময় আল্লাহ হাজির আছেন এ অনুভূতি সৃষ্টি হয় তবে তাই আত্মসমালোচনা। আর এটিই হচ্ছে জবাবদিহিতা। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ঃ বুদ্ধিমান সেই যে নিজের নফসের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পর যা আসবে সে জন্যে প্রস্তুত হয়,

আর সেই অসহায় যে নফসের মর্জিমাফিক কাজ করে এবং অতঃপর আল্লাহর উপর নির্ভর করে (তিরমিজি)।

এটিও বর্ণিত হয়েছে যে হজরত ওমর (রা.) বলেছেন ঃ তোমার কাছ থেকে হিসাব নেয়ার আগে নিজেই নিজের হিসাব নাও। তোমার আমলের ওজন করো, সেসব তোমার বিরুদ্ধে ওজন করার আগেই। মায়মুন ইবনে মাহরানের একটি উক্তি হচ্ছে ঃ ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর ব্যাপারে সচেতন যে নিজের নফসের হিসেব স্বৈরশাসক এবং কৃপন ব্যক্তির চেয়েও কঠোরভাবে নেয়। এর উৎস হচ্ছে মহান আল্লাহর কালাম ঃ আর এমন সত্তার কসম করছি, যে নিজেকে তিরস্কার করে (সূরা কিয়ামাহ ঃ ২)।

এহতেসাব ভুলভ্রান্তির পরিশুদ্ধি এবং দুর্বলতা দূর করার প্রচেষ্টা সর্বদা তীব্রতর করে। ফলে একজন সব সময় উৎকর্ষতা অর্জনে সচেষ্ট হয় এবং আত্ম-প্রশংসা, অহমিকা ও অপরের নিন্দা করার অভ্যাস পরিহার করে।

ইসলামে নিজের হিসাব গ্রহণের এ নীতি নৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যতম মৌলনীতি। এ কারণে সকল সুফি ও শিক্ষাবিদ এ নীতিকে আবশ্যকীয় বলে বিবেচনা করেছেন।

অধুনা মানুষ প্রায়ই আত্মসমালোচনা শব্দটি উচ্চারণ করে। এ শব্দটি ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। তবে আসল দোষণীয় হচ্ছে এটিকে প্রচলিত অর্থে গ্রহণ এবং অন্যের কাছ থেকে ধার বলে মনে করা। কেননা আত্মসমালোচনা নিজেই নিজের হিসাব নেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এটি মূলত কোরআন, সুন্নাহ ও আমাদের সংস্কৃতি নির্দেশিত।

ঘ. আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল

চতুর্থ কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে আল্লাহর ওপর আস্থা (তাওয়াক্কুল) রাখা। এটি এমন এক রূহানী হাতিয়ার যা দুর্বলতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এটি সেই অস্ত্র যা দিয়ে রাসূল (সা.) বিভিন্ন জাতির স্বৈরশাসকদের মোকাবিলা করেছেন। তাদের স্বৈরাচার তাঁকে কখনো ভীত করেনি; না তাদের দুরভিসন্ধি তাঁকে দুর্বল করতে পেরেছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর আল্লাহর ওপর আমাদের ভরসা না করার কি কোনো কারণ থাকতে পারে? অথচ তিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন যা আমরা অনুসরণ করি এবং তোমরা আমাদেরকে যে রূপ কষ্ট দিয়েছ, আমরা তাতে সবর করব। আর আল্লাহর ওপরেই ধৈর্যশীলদের আস্থা রাখা উচিত (সূরা ইব্রাহীম ঃ ১২)।

আল্লাহর ওপর আস্থার অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করা, তাঁর নির্দেশ মেনে চলা এবং তাঁর ওপরেই নির্ভর করা। আল্লাহতায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তাঁকেই নিজ কাজের কার্যনির্বাহক হিসেবে গ্রহণ করুন (সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ৯)।

অবশ্য নিজেকে প্রস্তুত করে সব রকম পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করেই আল্লাহকে কার্যনির্বাহী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত ; অতঃপর আল্লাহ আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না

এ আস্থা নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহর ওপর আস্থা রাখার অর্থ কোনোভাবেই এটি গ্রহণ করা উচিত নয় যে কেউ নিজ কাজে অবহেলা, লক্ষ্যে পৌঁছার নির্ধারিত কৌশল পরিহার, অনুমোদিত নিয়মবিধির প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন অথবা বীজ না বুনেই বা ক্ষেতের যত্ন না করেই ফসল কাটার প্রতীক্ষা করবে। তাওয়াক্কুলের অর্থ তাই যা রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর পূর্বের নবী-রাসূলগণ করেছেন। তা হচ্ছে আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে, তাঁর ওয়াদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁর সমর্থনের আশা করেই নিজে যথাসাধ্য চেষ্টা করে ফলাফল আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়া।

মহানবী (সা.) হিজরতের উদ্দেশ্যে সর্বোত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তবুও তিনি যে গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন কাফেররা সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) যখন বললেন ঃ ওদের মধ্যে কেউ যদি তার পায়ের নীচে তাকায় তাহলে সে নিশ্চয়ই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ আবু বকর তুমি সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে কি চিন্তা করো, যাদের সঙ্গে তৃতীয় আরেকজন আছেন–তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। সূরা তাওবার ৪০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ তুমি বিষণ্ন বা ভীত হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

এ কথা হযরত মূসা (আ.) ও বলেছিলেন তাঁর কওমকে যখন ফেরাউন তার বাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। হযরত মূসার কওম সমনে সাগর ও পেছনে ফেরাউনের বাহিনীর মধ্যে আটকা পড়ল। আল্লাহ বলেন ঃ অতঃপর যখন উভয় পক্ষ পরস্পরকে দেখতে পেল, তখন মূসার সঙ্গীগণ বলল, আমরা তো নিশ্চিত তাদের হাতে ধরা পড়লাম। মূসা বললেন, কখনোই না। কেননা, আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছেন। তিনিই আমাদের পথ দেখাবেন (সূরা আশ শূ'আরা ঃ ৬১-৬২)।

আমাদের আসলেই যা প্রয়োজন তা হচ্ছে এ ধরনের মজবুত ঈমান। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন–এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়েই ফেরাউন ও আবু জেহেলের বংশধরদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। আল্লাহতায়ালা যাদের সঙ্গে রয়েছেন তারা ব্যর্থ হতে পারে না। আল–কোরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে তো কেউই তোমাদের ওপর জয়ী হতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদেরকে সহায়তা না করেন, তবে তাঁর পর এমন কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? আর মুমিনদের শুধু আল্লাহর ওপরেই ভরসা করা উচিত (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬০)।

যথার্থ কাজের গুরুত্ব

প্রয়োজনীয় অগ্রণী দল তৈরি করতে গিয়ে দু'টি বিষয়ের সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে ঃ নিয়তে সততা ও সঠিক কাজ।

প্রত্যেক ইসলামী কাজে বিশুদ্ধ নিয়ত ও সদিচ্ছা আবশ্যক। কেননা, প্রতিটি ইসলামী কাজ মানেই ইবাদত ও জিহাদ। আমরা আগেই বলেছি কোনো ইবাদত বা জিহাদ কবুল হবে না, যদি তাতে বিশুদ্ধ নিয়ত না থাকে। এ জন্যে আমাদের আলেমগণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদিস 'নিয়ত অনুযায়ীই কর্মের মূল্যায়ন বা পরিমাপ করা হয়'-এর ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আলেম সমাজ সামগ্রিকভাবে নিয়তকে ইসলামের এক-চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ, এমন কি অর্ধাংশ বলে মনে করেন।

কিন্তু ইসলামী আন্দোলনকে প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নেয়ার জন্যে কেবল নিয়তই যথেষ্ট নয়। সৎ নিয়ত ছাড়াও সঠিক ও বেঠিক এমন কি দু'টি মতের কোনটি বেশি সঠিক এগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা এবং দু'টি মন্দের কম মন্দটি অথবা দু'টি ভালোর মধ্যে সবচেয়ে ভালোটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা থাকা উচিত। কথিত আছে, ঐ ব্যক্তি বুদ্ধিদীপ্ত যে মন্দ থেকে ভালোকে চিনতে পারে, আর ঐ ব্যক্তি বিজ্ঞ যে দু'টি মন্দের মধ্যে কম মন্দটি চিহ্নিত করতে পারে।

আসলেই একজন মুসলমানকে জানার চেষ্টা করতে হবে কোনটি সঠিক। চেষ্টা করার পরেও কেউ যদি ভুল করে, তাকে ক্ষমা এমনকি পুরস্কৃত করা হবে। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি সত্য জানার চেষ্টা করার পর ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে তবুও তাকে একটি পুরস্কার দেয়া হবে, আর কেউ যদি চেষ্টা সাধনার পর সঠিক পথ পায় তবে তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে। একটি পুরস্কার চেষ্টা সাধনার জন্যে, আর দ্বিতীয়টি সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য। সঠিক সিদ্ধান্তের জন্যে দ্বিগুণ পুরস্কারের ওয়াদা এ জন্যেই যে যারা চেষ্টা সাধনা করে তাদের সর্বদা উদ্দেশ্য হবে 'প্রকৃত সত্য' জ্ঞাত হওয়া এবং সকল বিজ্ঞ ঈমানদার যেন তাদের চেষ্টা সাধনায় প্রকৃত সত্য জানার ওপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। এ পর্যায়ে আমি দু'টি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করব।

প্রথমত, যারা চেষ্টা সাধনার জন্যে পুরস্কৃত হবেন তাদেরকে সর্বপ্রথম এ প্রচেষ্টা চালানোর যোগ্য হওয়া উচিত অর্থাৎ তার ব্যক্তিগত বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগের (ইজতিহাদ) ন্যূনতম যোগ্যতা থাকতে হবে। আমি ইজতিহাদ বলতে এখানে ফিকাহর গ্রন্থসমূহে এ ধরনের প্রচেষ্টার ব্যাপারে বর্ণিত আইনগত ও পারিভাষিক অর্থ বোঝাচ্ছি না বরং কোনো ক্ষেত্রে করা হয়েছে এমন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টাকে বোঝাচ্ছি যার জন্য প্রয়োজন বিশেষ জ্ঞান, রাজনৈতিক বিষয়ে ইজতিহাদ–সামরিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ে ইজতিহাদের চেয়ে নিশ্চিতই ভিন্ন ধরনের। কেননা প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক।

কিন্তু কেউ যদি এমন কোনো বিষয়ে গবেষণা শুরু করে যে বিষয়ে তার নিজের ভালো জ্ঞান নেই, সে যদি যথার্থ জ্ঞান ছাড়া রায় দেয় তাহলে সে নিজের উপর জুলুম করল, তার গবেষণার প্রতি অবিচার করল এবং তার জাতির ক্ষতি করল। সে তো পুরস্কার পাবেই না বরং এক অনস্বীকার্য পাপের জন্যে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। কারণ সে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও রায় দেয়, যেমন কেউ সাঁতার না জানা সত্ত্বেও পানিতে নেমে সাঁতার কাটার ভান করে। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ বিচারক তিন ধরনের, একজন যাবে বেহেশতে আর বাকি দু'জন যাবে জাহান্নামে। প্রথম জন হচ্ছে ঐ বিচারক যে

সত্য জানে এবং সে আলোকে বিচার করে, তাই সে বেহেশতে যাবে। দ্বিতীয় বিচারক অজ্ঞ অথচ রায় দেয়, সে জাহান্নামে যাবে। তৃতীয় বিচারক সত্য জানা সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে রায় দেয়, সেও জাহান্নামী হবে (আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, নাসাঈ ও আল হাকিম)।

এ হাদিসে যে বিচারক অজ্ঞতা সত্ত্বেও রায় দেয় এবং যে বিচারক সত্য জানা সত্ত্বেও অন্যায় রায় দেয় উভয়কে সমপর্যায়ে ফেলা হয়েছে। কেননা, সে নিজেকে এমন এক ক্ষেত্রে জড়িয়েছে যে বিষয়ে সে অভিজ্ঞ নয়। এক্ষেত্রে সেখান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ঐ পদের যোগ্য লোকের হাতে তা ছেড়ে দেয়াই উত্তম হবে।

এ ধরনের বিচারক যদি সঠিক কাজটিও করে তবুও সে পুরস্কৃত হবে না। কারণ ভুল অবস্থান থেকে সঠিক কথাটি বলা হয়েছে। যথাযথ পদ্ধতিভিত্তিক নয় বলে এসব কাজের কোনো মূল্য নেই। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ঃ যে জ্ঞান ছাড়াই কোরআনের বিষয়ে মতামত দেয় তা সঠিক মনে হলেও ভুল[১]। এটি অদক্ষ হাতে গুলি ছোড়ার মত।

এমন বিচারকের মতামত সঠিক হলেও ভুল বলে গণ্য হবে। যেহেতু তার মতামত (ইজতিহাদ) খেয়াল খুশি মতো তৈরি হয়েছে, কোনো যথার্থ নিয়ম পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করে নয়। সুতরাং এমন এলোপাথাড়ি চেষ্টার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, কেবল ইজতিহাদী প্রচেষ্টার জন্যে পুরস্কৃত হবেন, এমন কি একটি মাত্র পুরস্কার পাবেন তারাই যারা সত্য অনুসন্ধানে আপ্রাণ চেষ্টা চালান এবং বিষয়টির যথার্থ নিশ্চিতভাবে অনুধাবন করার ওপর পূর্ণরূপে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এটি করতে গিয়ে তাদেরকে সত্য উদঘাটনে প্রাপ্ত সকল উপায় উপকরণ এবং সত্য উদঘাটনে প্রাপ্ত সকল তথ্য উপাত্ত অনুধাবন করে কাজে লাগাতে হবে। তাদেরকে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথেও পরামর্শ করে সঠিক মতামত এবং মূল্যবান অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে হবে। এসবই তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

ভবিষ্যত নেতৃত্ব

বহু দেশে ইসলামী আন্দোলনের সমস্যা হচ্ছে আন্দোলনের ভিত এতো বিস্তৃত যে তা সামলানোর মতো নেতৃত্বের অভাব রয়েছে। এটি স্বীকার করার মধ্যে কোনো সঙ্কোচ নেই।

এ অবস্থার কারণ হচ্ছে সমসাময়িক ইসলামী আন্দোলন সারা বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করেছে। সকল দেশে আন্দোলনের শিকড় গভীরে প্রোথিত হয়েছে। ফলে এর বিস্তৃতি ক্রমান্বয়ে

১. আবু দাউদ ও তিরমিজি এ হাদিসটি একজন বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত বলে 'গরীব' বলেছে এবং আন নাসাঈ ও অন্যান্যরা হাদিসটিকে দুর্বল বা জঈফ বলে অভিহিত করেছেন।

সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু এ ক্রমবিকাশের পাশাপাশি আদর্শিক, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক পর্যায়ে উপযুক্ত নেতা সৃষ্টি হচ্ছে না। বর্তমান নেতৃত্বকে এ পরিস্থিতির কথা মনে রেখেই ভবিষ্যত পর্যায়ের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

এখানে প্রথম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, দাওয়াতি কার্যক্রমের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া। এ জন্যে ত্যাগ স্বীকার করা অথবা আন্দোলনে প্রথম অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য হওয়াই কেবল ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের গুণাবলী নয়। যদিও আল্লাহ ও মানুষের দৃষ্টিতে এসব গুণ বৈশিষ্ট্যের নিজস্ব মূল্য আছে। যে ধরনের নেতৃত্ব প্রয়োজন তা হচ্ছে, নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তব সামর্থ্য থাকা উচিত। এসব বৈশিষ্ট্য হবে নৈতিক, আচরণ ও বিশ্বাসগত প্রচলিত পূর্বশর্তের অতিরিক্ত।

আমি নেতৃত্ব বলতে আন্দোলনের শীর্ষপদের কথা বোঝাচ্ছি না। বরং সেই গ্রুপকে বুঝাচ্ছি যারা কাজের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকে এবং তাদের অধীন লোকদের কাছ থেকে যথাসম্ভব কাজ আদায় করে নেয়। তারা সংশ্লিষ্ট কর্মী বাহিনীকে ক্ষতিকর কাজ থেকে গঠনমূলক প্রক্রিয়ায়, তর্কবিতর্ক থেকে কর্মব্যস্ততায় এবং অলসতা থেকে কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত করে।

নেতৃত্ব একটি জীবনব্যাপী অধিকার, কেবল মৃত্যুই সে অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে এ ভেবে যারা গোড়া থেকে নেতৃত্বের দায়িত্বে রয়েছেন তাদের নতুন নেতাদের পথে বাধা হওয়া উচিত নয়। তাহলে তারুণ্যে ভরা মেধাবী ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের নেতৃত্বে আসার পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনকে আমাদের আদর্শ হিসেবে অনুসরণের তাগিদ দেয়া হয়েছে যাদেরকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে কাউকে সারাজীবনের জন্যে নেতা হিসেবে বেছে নেয়ার মনোভাব আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে।

বস্তুত এসব ঐতিহাসিক নজীর এমন কোনো আইন নয় যে উম্মাহকে কিয়ামত পর্যন্ত তা মেনে চলতে হবে। এ বিষয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। এখানে আমাদের যে বিষয়টির ওপর অবশ্যই জোর দিতে হবে তা হচ্ছে আগামী পর্যায়ের জন্যে এমন নেতৃত্ব প্রস্তুত করা যাতে দৃঢ়, সৎ, নির্ভরযোগ্য ও বুদ্ধিদীপ্ত নেতারা নিশ্চিতভাবে আন্দোলনের হাল ধরতে পারেন। আমাদেরকে আদর্শিক, শিক্ষা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবশ্যই নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে।

এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে চিন্তা করে আমাদের বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে এবং তত্ত্বকে কর্মে রূপান্তর করতে হবে।

নেতৃত্ব বিনির্মাণে বিশেষ ইনস্টিটিউট

এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে ইসলামী নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্যে আমি একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিচ্ছি। যাদের প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক, মনস্তাত্ত্বিক, আচরণগত ও ঈমানী গুণাবলী রয়েছে এমন প্রত্যয়দীপ্ত মেধাবী ব্যক্তিদেরকে এ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী

হিসেবে বেছে নিতে হবে। মানুষের গুণ বৈশিষ্ট্য বিচারে সক্ষম বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সুপারিশের আলোকেই এসব শিক্ষার্থী নির্বাচন করা উচিত। তাদেরকে ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণের জন্য রিক্রুট করার আগে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষাও নিতে হবে। আবাসিক ধরনের ইনস্টিটিউট হওয়াই উত্তম যেখানে শিক্ষার্থীরা একটি কমিউনিটি হিসেবে বাস করবে। সেখানে জীবনযাপনের মূল উপাদান হবে ধর্ম, জ্ঞান, দাওয়াতি কার্যক্রম, ভ্রাতৃত্ব ও জিহাদ।

এ ইনস্টিটিউটের পাঠ্যক্রম হওয়া উচিত ব্যাপক, গভীর ও বিভিন্নমুখী। এ পাঠ্যক্রমে ঐতিহ্য ও সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় এবং ইসলামী প্রেক্ষাপটে ধর্ম ও মানবিক বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ থাকতে হবে। সেই সাথে স্থানীয়, আরব, ইসলামী ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদির দিকেও যথাযথভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমাদের ধর্ম, উম্মাহ এবং অগ্রাভিযানের বিরোধী চক্রের ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের ওপর পাঠ্যক্রমে গুরুত্ব দিতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের এবং তত্ত্বের সঙ্গে অনুশীলনের সমন্বয় সাধন করবে।

এ পাঠ্যক্রম শিক্ষা দেয়ার জন্যে উচ্চশিক্ষিত, পরিপক্ক চিন্তা ও বিশ্বাসের অধিকারী নির্ভরযোগ্য শিক্ষকদেরকে মনোনীত করতে হবে। এসব শিক্ষককে কোমলতা অথবা কঠোরতা থেকে অনেক দূরে থাকা উচিত। তারা হবেন সংহত ও সমন্বিত চিন্তা-চেতনার অধিকারী। তাদের মধ্যে কেউই পরস্পরের মতামতকে অপাংক্তেয় মনে করবেন না, কেউ পাশ্চাত্য বিশারদ ও প্রাচ্য বিশারদ কিংবা বাম ও ডানপন্থী হবেন না। তাই যদি হন তাহলে তারা চিন্তার ক্ষেত্রে বৈপরীত্য ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবেন যার ফলে শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।

এর অর্থ আমি এটি বোঝাতে চাই না যে এসব সুবিজ্ঞ শিক্ষক একে অপরের হুবহু প্রতিকৃতি হবেন। আমি শুধু এটি বলতে চাই, প্রধান প্রধান ইস্যুতে তাদের সার্বিক চিন্তাধারা এবং ইনস্টিটিউটের গৃহীত মৌল দর্শনের মধ্যে একটি মতৈক্য থাকতে হবে।

এখন আমি এ উচ্চাভিলাষী উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চাই তার কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

কাঙ্ক্ষিত আদর্শের বৈশিষ্ট্য

কোনো রকম সন্দেহ বা দ্ব্যর্থতা ছাড়াই একটি বিষয়ে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত নেতৃবৃন্দের জন্যে নৈতিক বিকাশের মূল চাবিকাঠি ঈমানভিত্তিক শিক্ষা ছাড়াও সুদৃঢ় আদর্শিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে হবে। এটি হবে ইতিপূর্বে বর্ণিত ফিকাহ্ ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যা আগামী দিনের আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন।

আমাদের কাছে ঈমান যুক্তি বা বুদ্ধির পরিপন্থী নয়। বরং ঈমান যুক্তিভিত্তিক ও যুক্তি দ্বারা চালিত এবং কোরআনে মুমিনদেরকে বুদ্ধিমান মানুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআন তাদের জন্যেই দিকনির্দেশক যারা বুদ্ধিমান ও গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে। উম্মাহ্র বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের কাছে যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সকল ওহীর জ্ঞান। কেননা ওহীর জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর অস্তিত্ব কিংবা রিসালাতের বৈধতা প্রমাণ করা যায় না।

কোরআনে বর্ণিত নির্দেশাবলী যৌক্তিক মানসিকতা নির্মাণ করে যা ইবাদতের ভিত রচনা করে এবং সকল কুসংস্কার ও পূর্ব পুরুষদের অথবা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুকরণকে নাকচ করে দেয়।[১]

বিজ্ঞানসম্মত আদর্শ

যে আদর্শের ভিত্তিতে আমরা কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে চাই তার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষকদের উচিত হবে এসব বৈশিষ্টের অনুধাবন ও বাস্তবায়ন করা। আর শিক্ষা পাঠ্যক্রমে এসব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে হবে।

পূর্ণ আক্ষরিক অর্থে এ শিক্ষা হবে বিজ্ঞানভিত্তিক। বিজ্ঞানভিত্তিক বলতে আমি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্পৃক্ত বিজ্ঞানকে বোঝাতে চাইনি। যদিও মুসলমানদের বিজ্ঞানের এসব বিষয় নিয়ে চর্চা করা উচিত। কিন্তু এটি এমন এক আদর্শ যেখানে প্রমাণ ছাড়া কোনো দাবি, প্রস্তাবনা ছাড়া কোনো ফলাফল, দলিল ছাড়া কোনো সাক্ষ্য অথবা সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত না হলে কোনো প্রস্তাবনা গ্রহণযোগ্য হবে না।

আমরা চাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক চেতনা যা আমাদেরকে পথ দেখাবে যেন আমরা যে কোনো বিষয়, ইস্যু, পরিস্থিতি এবং মানুষকে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় বিবেচনা করতে পারি এবং আবেগ, তাৎক্ষণিকতা,

১. আমার বই 'দি প্রফেট এন্ড নলেজ', পৃষ্ঠা ৩৮-৪০।

আত্মকেন্দ্রিকতা, গোষ্ঠীস্বার্থ এবং প্রাত্যহিক নানা অজুহাতের প্রভাবমুক্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা নিয়ে অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষাসহ অন্য সকল ক্ষেত্রে বিচক্ষণ ও কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে পারি। উপরোক্ত প্রতিকূল দিকগুলো আমাদের আচার আচরণ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। একজন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি তার অথবা তার দলের খেয়াল খুশির প্রভাবে চালিত হলে জনগণ যা পছন্দ করে তাই করে তাদেরকে তোষণ করতে চাইবে– জনগণ, স্বদেশ ও সামগ্রিকভাবে জাতির ভবিষ্যতের জন্যে যা কল্যাণকর সে দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে না।

আমার ক্রদি ইসলামিক সলিউশন ঃ এ ফরিদাহ্ এন্ড এ মাস্টম্ব গ্রন্থে ইসলামী আন্দোলনে আত্মসমালোচনা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক চেতনার কতকগুলো প্রধান বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করেছি। আমদানি করা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্যে নয়– উম্মাহ্র প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়ে এসব বৈশিষ্ট্য এখানে পুনরুল্লেখ করা দরকার বলে মনে করি।

দরকার বৈজ্ঞানিক চেতনা

বৈজ্ঞানিক চেতনার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ

১. কোন উৎস থেকে এসেছে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বিভিন্ন বিষয়, পরিস্থিতি ও প্রসঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ। হযরত আলী (রা.) বলেছেন ঃ মানুষকে দিয়ে সত্য জানার চেষ্ট করো না, বরং সত্য কি প্রথমে সেটাই জানো, তাহলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষকে সহজেই চিনতে পারবে।

২. স্পেশালাইজেশনকে গুরুত্ব প্রদান করা। আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ সুতরাং কিতাবের বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদের জিজ্ঞাসা করো (সূরা নাহ্ল ঃ ৪৩), তাঁর সম্পর্কে যিনি অবগত তাকে জিজ্ঞাসা করো (সূরা ফুরকান ঃ ৫৯), আর তোমাকে সর্বজ্ঞ আল্লাহর ন্যায় কেউই অবহিত করতে পারবে না (সূরা ফাতির ঃ ১৪)।

   দ্বীনের নিজস্ব বিশেষজ্ঞ আছে যেমন আছে অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় বিশেষ করে আমাদের এ যুগে। যে ব্যক্তি দ্বীন, রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে জ্ঞান রাখে এবং সব বিষয়ে মতামত দেয় সে তো বাস্তব পক্ষে কিছুই জানে না।

৩. আত্মসমালোচনা, ভুল স্বীকার, এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং স্পষ্টভাবে অতীতের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার আগ্রহ থাকতে হবে। আত্মতুষ্টি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা তা অতীতকে কেবল গৌরব ও বিজয়ে পূর্ণ দেখতে পায়।

৪. সফলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বাধুনিক ও সর্বোত্তম কৌশল প্রয়োগ এবং শত্রুসহ অন্য সকলের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা। জ্ঞান মুমিনদের হারানো সম্পদ,

তা যেখান থেকেই পাওয়া যাক না কেন। অন্য যে কোনো মানুষের চেয়ে মুমিনই সে জ্ঞানের বেশি হকদার।

৫. কেবলমাত্র অকাট্য ধর্মীয় ও আদর্শিক তত্ত্ব ছাড়া সকল বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং তার ফলাফল কারো পক্ষ-বিপক্ষ বিবেচনা না করেই গ্রহণ করা।

৬. সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রদানে তড়িঘড়ি না করা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই–বাছাইয়ের আলোকে সতর্ক পর্যালোচনা এবং অপর পক্ষের সঙ্গে গঠনমূলক আলাপ-আলোচনার পরই কেবল একটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে আলোচ্য বিষয়ের ভালো মন্দ সব কিছুই সামনে চলে আসবে।

৭. ফিকাহর বিভিন্নমুখী ইস্যু এবং জ্ঞানের সকল শাখায় যারা বিপরীত ধারণা পোষণ করেন তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে মূল্যায়ন করা যতক্ষণ প্রতিটি বিষয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে যুক্তি প্রমাণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআন-সুন্নাহর আলোকে বিষয়টি এমনভাবে মীমাংসা করা যাতে বিরোধ এড়ানো যেতে পারে। আমাদের আলেম সমাজ রায় দিয়েছেন ইজতিহাদ ভিত্তিক মতামতের ওপর কোনো বিধিনিষেধ নেই। সেহেতু কেউ ইজতিহাদ ভিত্তিক মতামত দিলে তাকে অন্যের চেয়ে উত্তম গণ্য করা উচিত হবে না। তবে ইজতিহাদের মাধ্যমে গঠনমূলক আলাপ-আলোচনা এবং সহনশীল ও আন্তরিক পরিবেশে তাত্ত্বিক ও পক্ষপাতহীন যাচাই বাছাই বন্ধ হওয়া উচিত নয়।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববিরোধী রীতি

জটিল বিষয় অতি সরলীকরণ, গুরুতর ইস্যু অবমূল্যায়ন, কঠিন সমস্যা হালকা করে দেখা অথবা প্রধান প্রধান ইস্যু অশিক্ষিত লোকের মতো এবং দরবেশী আচার আচরণ দিয়ে মোকাবিলা করা বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার পরিপন্থী।

অদৃশ্য হাত ও অশুভ বিদেশী শক্তি আমাদেরকে দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দেয়ার জন্যে দুর্বৃত্তের মতো নীলনকশা তৈরি করে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে যতক্ষণ না আমরা নিজেরাই সেই ফাঁদে পা দেই। এ অবস্থায় আমরা সব কিছুর মধ্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পাই এবং মনে করি এসব অশুভ চক্রের মোকাবিলা করার মতো শক্তি আমাদের নেই। অতএব হাত গুটিয়ে নেয়াই ভালো। এ ধরনের মন মানসিকতা আমাদের জন্যে ক্ষতিকর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি সত্য হতে পারে কিন্তু এটিকে ঢালাও ব্যাপার বলে মনে করা ভুল। ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের এরূপ ব্যাখ্যা বস্তুত ষড়যন্ত্র ও নীলনকশারই ফলশ্রুতি। এসব ঘটনা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক যাই হোক না কেন উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করার দু'টি খারাপ ফল রয়েছে ঃ

প্রথমত, এ ধরনের মনোভাব বৃদ্ধি পেলে তা এক ধরনের অদৃষ্টবাদের জন্ম দেবে যেন এসব শয়তানী চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই করার নেই। কারণ এসব দুষ্টচক্রের

বিপুল আর্থিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার কাছে আমরা অতিশয় দুর্বল ও হীনবুদ্ধি। এভাবে আমরা দাবার গুটিতে পরিণত হই। এরূপ চিন্তাভাবনা কেবল হতাশা ও পরাজয়ের ধ্বংসাত্মক মনোভাবই সৃষ্টি করবে।

দ্বিতীয়ত, এ মানসিকতা আমাদেরকে আত্মসমালোচনা বিমুখ করে এবং দোষত্রুটি অনুধাবন, সমস্যার প্রতিকার কিংবা ব্যর্থতা ও অপরাধ খতিয়ে দেখার কোনো আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানোর আগ্রহ সৃষ্টি করে না। ফলে রোগের কারণ নির্ণয় করে নিরাময়ের চেষ্টাও বিঘ্নিত হয়। যতদিন পর্যন্ত আমরা মনে করবো আমাদের দুর্বলতা, ঔদাসীন্য, দুর্নীতি কিংবা ধ্বংসের কারণ দুষ্ট বৈদেশিক চক্রান্ত, আমাদের নিজ আচরণের ফলশ্রুতি নয়, ততদিন এ অবস্থা বিরাজ করবে।

আমরা প্রায়শই এ ধরনের মানসিকতা পোষণ করি অথচ কোরআন আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে আমরা কখনো দুর্ভাগ্য, দুর্যোগ ও পরাজয়ের সম্মুখীন হলে কেবল নিজেদেরকেই দোষী মনে করতে হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ আর তোমাদের ওপর যে কোনো বিপদ আপতিত হয়, তা তোমাদেরই হস্তের অর্জিত কার্যকলাপের দরুন। আর অনেক বিষয় তো তিনি মাফ করে দেন (সূরা শূরা ঃ ৩০)।

ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা তাদের সত্তর জন বীর যোদ্ধাকে হারিয়ে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত হয়েছিল। অথচ এ মুসলিম বাহিনীই বদরের যুদ্ধে এক দীপ্তিময় বিজয় অর্জন করেছিল। তারা নিজেদের কাছে নিজেরাই এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে আল্লাহতায়ালা এর জবাব পাঠান এভাবে ঃ তোমাদের এ কি অবস্থা তোমাদের উপর যখন একটি মুসিবত ঘনিয়ে এল, যদিও একবার তোমরাই তোমাদের শত্রুদের ওপর দ্বিগুণ আঘাত হেনেছিলে, তোমরা বলেছ–এটি কোথা থেকে এল? আপনি তাদেরকে বলুন, এ বিপদ তোমাদের নিজেদের কারণেই এসেছে (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৫)।

বাস্তবসম্মত আদর্শ

আমরা আগামীতে ইসলামী আন্দোলনের জন্যে বিজ্ঞানসম্মত আদর্শের যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে চাই তা হবে বাস্তবভিত্তিক, কোনো অলীক ও স্বপ্ননির্ভর নয়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামর্থ্যের ভারসাম্য

একটি বাস্তব সত্য আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে যে আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচি আমাদের সামর্থ্যের অনুপাতে সুষম হওয়া উচিত। এর পাশাপাশি এটিও যাচাই করে নিতে হবে, আমরা কী পেতে চাই আর বাস্তবে কতটুকু পেতে পারি। আমরা যেন এমন কিছু পাওয়ার আশা না করি যে জন্য আমরা প্রস্তুত নই অথবা অর্জন করার মতো প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ আমাদের আয়ত্তে নেই। কোরআন একজন যোদ্ধাকে রণকৌশল বাস্তবায়নের চেষ্টায় অথবা স্বীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার লক্ষ্যে পশ্চাৎপসরণ করার অনুমতি দিয়েছে।

একজন মুজাহিদকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তখনই সরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে যখন মুসলিম বাহিনীর তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি বিপুল সংখ্যক শত্রু সৈন্যের উপস্থিতির ফলে পরিস্থিতি তার অনুকূল থাকে না। আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ এখন আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করে দিয়েছেন এবং তিনি জানেন যে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যদি একশজন দৃঢ়তাসম্পন্ন থাকে তবে তারা দু'শতের ওপর জয়লাভ করবে, আর যদি তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকে, তবে আল্লাহর হুকুমে দু'হাজারের ওপর বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন (সূরা আন্‌ফাল ঃ ৬৬)।

মু'তার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর চেয়ে রোমান বাহিনীর সংখ্যা ছিল বহুগুণে বেশি। দেড় লাখ রোমান সৈন্যের মোকাবিলায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। উভয়পক্ষের সৈন্য সংখ্যার এ অনুপাতের দরুন সমর কুশলী খালিদ বিন ওয়ালিদ আত্মঘাতী হতে পারে এমন যুদ্ধের মুখে ঠেলে না দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

তিনি যখন তার বাহিনী নিয়ে মদিনায় ফিরে এলেন তখন মদিনার ক্ষুব্ধ যুবকরা তাদের দিকে পাথর নিক্ষেপ করে অভ্যর্থনা জানায় এবং তাদের পলায়নকারী বলে আখ্যা দেয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের সমর্থনে বললেন ঃ না, তারাই আক্রমণকারী হবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

তিনিই বিজ্ঞ সেনাপতি যিনি তার সৈন্যদের প্রতি খেয়াল রাখেন। ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) তাঁর শাসনামলের প্রথম দিকে এ কারণে বাইজান্টাইন অভিযানে আগ্রহী হননি।

যারা এ ব্যাপারে তাঁকে তাগিদ দিচ্ছিলেন তিনি তাদেরকে বলেন ঃ আল্লাহর কসম, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য এবং এর সকল ধনসম্পদের চেয়ে একজন মুসলমান আমার কাছে অধিক প্রিয়।

যে কাজ করার সাধ্য নেই তাতে নিজেকে জড়ায় না যে সেই বিজ্ঞ মুসলমান। এ প্রসঙ্গে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ অতএব তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাকে যথাসম্ভব ভয় করো (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬)।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ঃ নিজকে অবমাননা করার অনুমতি একজন মুসলমানকে দেয়া হয়নি। রাসূল (সা.) কে বলা হলো ঃ একজন নিজেকে কিভাবে অবমাননা করে, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)? রাসূলুল্লাহ (সা.) জবাবে বললেন ঃ এমন বোঝা কাঁধে চাপিয়ে নেয়া যা সে বইতে পারে না।

ইসলামী আন্দোলন একটি ভুল সহজেই করতে পারে। সেটি হচ্ছে সাধারণ মানুষের আবেগ তাড়িত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কোনো কোনো দেশে মুসলিম জনতা আন্দোলনের কোনো কোনো নেতাকে রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামিয়ে দেয়। সেখানে তারা এ কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় মানসিক, রাজনৈতিক ও বিশেষ দক্ষতা পূর্ণরূপে অর্জন না করেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটি করতে গিয়ে তারা সাধ্যের চেয়ে অতিরিক্ত বোঝা নিজের কাঁধে চাপিয়ে নেয়। এ পদক্ষেপের ব্যর্থতা নিশ্চিত।

তাড়াহুড়ো, ভ্রান্ত ধারণা, কারো দক্ষতা সম্পর্কে অতিমূল্যায়ন এবং অন্যদের সামর্থ্য সম্পর্কে অবমূল্যায়নের ফলেই এ ধরনের ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সেই উদাহরণ রয়েছে যখন তিনি তাঁর সাহাবিদেরকে মুশরিকদের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি দেননি, এমনকি তারা যখন নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। তিনি বলতেন ঃ লড়াই থেকে তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও এবং সালাত কায়েম করো।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর তরফ থেকে জিহাদ শুরু এবং যুদ্ধাভিযান চালানোর জন্যে একটি মুক্ত ভূখণ্ড এবং একটি শক্ত ঘাঁটি না পাওয়া পর্যন্ত এ রীতি অনুসরণ করেছেন। এ সম্পর্কে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন ঃ তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয়, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন (সূরা হজ্জ ঃ ৩৯)।

পুরানো সমস্যা মিটিয়ে ফেলা

আমরা নতুন আদর্শ গ্রহণের মাধ্যমে সে সব পুরানো সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে চাই যেগুলো আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে এবং মুসলমানদের বহু প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন যাবৎ নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। এমন সমস্যাগুলো হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্ব ও সিফাত। আল্লাহর সিফাতগুলো কি আল্লাহর মৌলিক প্রকৃতি না অন্যকিছু? অথবা এসব গুণাবলী মৌলিক প্রকৃতি নয়, অন্যকিছুও নয়?

সমস্যাগুলোর মধ্যে ছিল কোরআন সৃষ্ট কি সৃষ্ট না, যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে ইসলামের কয়েকজন বিশিষ্ট ইমামের ওপর খড়গ নেমে এসেছিল। সে সব বিষয়ে কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গূঢ় অর্থ অনুসন্ধান (তা'বিল), পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে অহেতুক অতিরঞ্জিত বিতর্ক উত্থাপন এবং মুসলিম বিশ্বের আল আজহার, আল জায়তুনা, আল কারাবিয়ীন, দেওবন্দ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের মধ্যে আশারীয়, মাতুরিদিস ও এসবের প্রবক্তাদের মতবাদ খণ্ডনের চেষ্টা করা।

এসব সমস্যার কোনোটি নিয়ে আমাদের ব্যতিব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। আমাদের মনকে আগামী পর্যায়ে ইহুদীবাদ, ক্রুসেডার, মার্ক্সবাদ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধ্বংসাত্মক দর্শনের প্রবক্তাদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

অহেতুক বিতর্ক

যে বাস্তববাদী আদর্শ আমাদের দরকার তা হচ্ছে দরকষাকষি ও বিতর্ক নয় গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করা। কেননা আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে শাস্তি দিতে চান তখন তিনি তাদেরকে বিতর্ক ও কর্মবিমুখতার মধ্যে ডুবিয়ে দেন। বিতর্ক বলতে আমি সে সব সমস্যা নিয়ে বিতর্ক বোঝাতে চাই যেগুলো ঐতিহাসিক, সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক অথবা যে সব সমস্যা স্বাভাবিকভাবেই বিতর্কিত।

একটি বিতর্ক প্রায়শই উত্থাপিত হয় যার কোনো প্রয়োজন নেই কিংবা এ বিতর্কে আজ আমাদের কোনো লাভ হবে না, তা হচ্ছে ইসলামে সশস্ত্র জিহাদের প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক। তা ইসলামের ধর্ম বিশ্বাস, পবিত্র স্থান ও ভূখণ্ড রক্ষার্থে আত্মরক্ষামূলক জিহাদ হবে নাকি বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রসারে আক্রমণাত্মক জিহাদ হবে।

সমসাময়িককালের বহু স্কলার এ বিষয়ের ওপর লিখেছেন এবং তারা দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েন। জিহাদ হবে আত্মরক্ষামূলক এ মতের সপক্ষে রয়েছেন সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা, শায়খ মাহমুদ শালত, শায়খ মুহাম্মদ আবু জাহরা, শায়খ মুহাম্মদ আল গাজালী ও শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ আল মাহমুদ প্রমুখ।

তাদের যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে আল–কোরআনের বহু সংখ্যক আয়াত ঃ আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে সীমা লঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না (সূরা আল বাকারা ঃ ১৯০)। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ সুতরাং তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত থাকে ও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদেরকে শান্তি প্রস্তাব দেয় তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ রাখেননি (সূরা আন নিসা ঃ ৯০)।

অন্যমতের পক্ষে রয়েছেন মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, শহীদ সাইয়েদ কুতুব প্রমুখ।

তাদের যুক্তির ভিত হচ্ছে তলোয়ারের আয়াত (আয়াতুস সাইফ)। তাদের দাবি অনুযায়ী এ আয়াত পূর্বেকার সকল আয়াত রদ করে দিয়েছে এবং যে পরিস্থিতিতে এগুলো নাজিল

হয়েছিল তার অবসান ঘটেছে। তবে তারা খোদ তলোয়ারের আয়াত প্রশ্নেও দ্বিমত পোষণ করেছেন, কারণ কোরআনের কোন আয়াতটি এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে তা সর্বসম্মতভাবে নির্ধারণ করতে পারেননি।

বর্তমানে তিনটি কারণে এ ইস্যু নিয়ে বিতর্কের আর প্রয়োজন নেই ঃ

প্রথমত, আমরা মুসলমানরা জিহাদের দায়িত্ব পালন করিনি যা ইসলামী দেশগুলোর প্রত্যেকের জন্যে ফরজ। বিশেষ করে দখলদার ও আগ্রাসীদের হাত থেকে মুসলিম ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করা। আর এ মুসলিম ভূখণ্ডগুলো হচ্ছে ফিলিস্তিন, ইরিত্রিয়া, ফিলিপাইন, আফগানিস্তান, তাসখন্দ, বোখারা, সমরখন্দ, উজবেকিস্তান, আজারবাইজান, সোভিয়েত ইউনিয়নের[১] অন্যান্য মুসলিম প্রজাতন্ত্র এবং চীন, ইথিওপিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশের অন্যান্য স্থান। কোনো মুসলমানই ইসলাম বিরোধী শক্তির হাত থেকে এসব দেশ উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তার বিপক্ষে যুক্তি খাড়া করতে পারে না। আর তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য আল্লাহর সিদ্ধান্ত আল-কোরআনের এ আয়াত ঃ আর তোমাদের কি হলো যে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না এবং ঐ সব দুর্বল নির্যাতিত ও অত্যাচারিত পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য যারা প্রার্থনা করছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ জনপদ থেকে উদ্ধার করুন যার অধিবাসীরা অত্যাচারী, আর আমাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে কোনো অভিভাবক দাঁড় করিয়ে দিন যিনি রক্ষা করবেন এবং আমাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে কাউকে পাঠান যিনি সাহায্য করবেন (সূরা আন নিসা ঃ ৭৫)।

মুসলিম উম্মাহ এ বাধ্যতামূলক আত্মরক্ষামূলক কর্তব্য পালন করেনি, তাহলে এখন আক্রমণাত্মক জিহাদের কথা কিভাবে উঠতে পারে?

দ্বিতীয়ত, আক্রমণাত্মক জিহাদ হচ্ছে এর প্রবক্তাদের মতে আল্লাহর বান্দাদের পথে যে শক্তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজে মুসলমানদেরকে বাধা দেয়ার অপচেষ্টা চালায়, তাদেরকে অপসারণ করা। কিন্তু আজ আমাদের পথে কেউ বাধা হতে পারে না যদি আমরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আমাদের দাওয়াত সারা বিশ্বে অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই। মৌখিক, লিখিত ও অডিও-ভিডিও মাধ্যমে সকল ভাষায় বিশ্বের সর্বত্র দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়া যায়। বর্তমানে রেডিও, টেলিভিশন, বইপত্র, সংবাদপত্র ও বিশ্বের সকল দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে দাওয়াতের বাণী পৌঁছে দেয়া যেতে পারে।

কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের লোকদের অবহেলা অন্তহীন। আমরা যদি খৃস্টান মিশনারীদের সাথে আমাদের কাজ কর্মের তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে, তারা তাদের ধর্মমত

১. ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগের অবস্থা। এখন ছয়টি মুসলিম প্রজাতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঃ আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরঘিজিয়া, কাজাখিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান।

প্রচারের জন্যে অন্তত এক হাজার ভাষা-উপভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করে হাজার হাজার নারী-পুরুষ মিশনারীকে পৃথিবীর চতুর্দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তাদের প্রচারাভিযান এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে তারা এখন আমাদেরকেও খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার ইচ্ছে পোষণ করছে যেন আমরা তাদের অনুসরণ করে চলি।

তৃতীয়ত, আমরা সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীল। যাদের বিরুদ্ধে আমরা আক্রমণাত্মক জিহাদ শুরু করতে চাই তারাই সবরকম অস্ত্র তৈরি করে এবং আমাদের কছে বিক্রি করে। এটি যদি তারা না করত, তাহলে তাদের মোকাবিলায় আমরা নিরস্ত্র, প্রতিরক্ষাহীন এবং কোনো কিছুই করতে সক্ষম নই। এ যদি অবস্থা হয়, তাহলে সারা বিশ্বকে আমাদের দাওয়াতের আওতায় আনার জন্যে কিভাবে আক্রমণাত্মক জিহাদের কথা বলতে পারি। যখন আমরা কেবল সেই অস্ত্রই সংগ্রহ করতে পারি যা তারা আমাদেরকে দেয় এবং সেই সব অস্ত্রই কেবল আমাদের হাতে আসতে পারে যেগুলো তারা আমাদের কাছে বিক্রি করতে রাজী হয়।

ঐতিহ্যবাদী আদর্শ

এ আদর্শের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি একটি ঐতিহ্যবাদী (সালাফি) আদর্শ। এখানে ঐতিহ্যবাদী বলতে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতি যা কোরআন ও সুন্নাহর নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত, যার যথার্থ প্রয়োগ প্রথম প্রজন্মের উম্মাহ-সাহাবিরা করেছিল এবং পরে যারা তাদের পথ সঠিকভাবে অনুসরণ করে।

সালাফি পদ্ধতির মৌলনীতি

সাধারণভাবে এ পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ঃ

১. কোনো মানুষের উক্তি নয়, অভ্রান্ত মূল গ্রন্থের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করা।

২. মূল গ্রন্থের দুর্বোধ্য (মুতাশাবিহাত) বক্তব্যসমূহের অর্থ নির্ণয়ে প্রাঞ্জল বা স্পষ্টভাবে (মুহকামাত) প্রকাশিত বক্তব্যের এবং অনির্দিষ্ট (জান্নিয়াত) বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট (কাতিয়াত) বক্তব্যের আশ্রয় গ্রহণ।

৩. গৌণ (ফুরু) ধারণা এবং সম্পূরক (জুজিয়াত) সিদ্ধান্তগুলো মূলতত্ত্ব ও সাধারণ সূত্রের আলোকে অনুধাবন।

৪. ব্যক্তি পর্যায়ে গবেষণা (ইজতিহাদ) ও নবায়নে (তাজদিদ) উৎসাহ প্রদান এবং অনমনীয়তা ও অনুকরণ (তাকলিদ) নিরুৎসাহিত করা।

৫. নৈতিকতার ক্ষেত্রে শিথিলতা নয়, যথাযথ আমলের প্রতি অটল থাকতে উৎসাহিত করা।

৬. জটিলতা নয় ফিকাহর ক্ষেত্রে সরলতার প্রসার।

৭. পথ নির্দেশনার ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্কশ আচরণের মাধ্যমে ভীত সন্ত্রস্ত করার (তানফির) পরিবর্তে মানুষের প্রতি সহৃদয় হওয়া এবং তাদের সামনে সুশৃঙ্খল সুন্দর দৃষ্টান্ত (তাব্শির) তুলে ধরা–এ নীতি প্রয়োগে উৎসাহিত করা।

৮. ঈমানের প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্ক নয়, খাঁটি ও সুদৃঢ় ঈমান গড়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া।

৯. ইবাদতের ক্ষেত্রে পদ্ধতির নয়, পরিতৃপ্তির প্রতি মনোযোগী হওয়া।

১০. ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে চলার প্রতি মনোযোগ দেয়া এবং পার্থিব বিষয়ের রীতিনীতি উদ্ভাবনে সচেষ্ট হওয়া।

প্রাথমিক যুগের মুমিনদের অনুসৃত পদ্ধতির এটিই হচ্ছে মূলকথা এবং উম্মাহর ঐ প্রজন্মের মনীষীদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষায় এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এ পদ্ধতির অনুসরণকারীদের প্রশংসা করেছেন। ইতিহাস থেকেও আমরা জানতে পারি, এ পদ্ধতি সত্যিই প্রশংসাযোগ্য।

কারণ প্রাথমিক যুগের মনীষীরা তাদের উত্তরাধিকারীদের কাছে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা রেখে গেছেন এবং এ কোরআনের আলোকে তারা জীবন গড়ে অনুমোদিত জীবনাচরণকে সংরক্ষণ, বিজয় অর্জন, ন্যায় বিচার ও কল্যাণকামিতার প্রসার ঘটিয়েছেন এবং জ্ঞান ও বিশ্বাসের ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এভাবে তারা এক বিশ্বজনীন, নৈতিকতাবাদী, মানবতাবাদী ও ধর্মীয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন, যার অম্লান স্মৃতি ইতিহাসের পাতায় এখনো জাগরুক।

সালাফিয়া আদর্শের ভুল ব্যাখ্যা

ঐতিহ্যবাদী (সালাফিয়া) পরিভাষাটির ভুল ব্যাখ্যা করেছে এর অনুসারী ও বিরোধীরা একইভাবে।

সালাফিয়া আদর্শের প্রবক্তা এবং তাদের সমর্থকদের অনেকেই বুদ্ধিবৃত্তিক ধর্মতত্ত্ব (ইলমুল কালাম ফিকাহ) অথবা সুফিদের বিষয়গুলোকে একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো ও যুক্তিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। যারা এসব ইস্যুতে সালাফিয়া মতের বিরোধী কিংবা খুঁটিনাটি বিষয়ে সালাফি মত খণ্ডন করে তারা দিনরাত সালাফিদের কঠোর সমালোচনায় লিপ্ত থাকে।

তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এতো অযৌক্তিক যে কেউ কেউ সালাফি আদর্শকে একটি তর্কশাস্ত্রের পদ্ধতি বলে মনে করেন যা গঠনমূলক বা কর্মমুখী নয় অথবা এ পদ্ধতি সর্বজনীনের পরিবর্তে খুঁটিনাটি ব্যাখ্যার ওপর, অনুমোদিত ভাবধারার স্থলে বিতর্কিত ভাবধারার ওপর এবং নিগূঢ় অর্থের পরিবর্তে বাহ্যিকতার ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়।

সালাফি পদ্ধতির বিরোধীরা এটিকে পশ্চাৎপদ চিন্তা বলে মনে করে। এ পদ্ধতি সর্বদা পেছনে তাকায়, সামনে এগোয় না এবং কখনোই বর্তমান বা ভবিষ্যতের পরোয়া করে না। তারা সালাফিদেরকে গোঁড়া বলে আখ্যা দেয়, যারা অপরের মতামতের তোয়াক্কা করা তো দূরের কথা শুনতেও নারাজ। বিরোধীরা সালাফিদের এ মানসিকতাকে নবায়ন (তাজদিদ), উদ্ভাবন (ইবদা) ও ইজতিহাদের পরিপন্থী মনে করে যাতে নমনীয়তার কোনো নমুনাই দেখা যায় না। বস্তুত প্রকৃত সালাফি আদর্শ এবং তার সত্যিকার প্রবক্তাদের প্রতি এটি অবিচার।

সম্ভবত সালাফি আদর্শের পূর্ব যুগের সবচেয়ে খ্যাতনামা প্রবক্তা হচ্ছেন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এবং তার শিষ্য ইবনুল কাইয়েম। তারা তাদের কালের ইসলামী

পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সত্যিকার অর্থে যোগ্যতম প্রতিনিধি। তারা গত কয়েক শতক ধরে ইসলামী চিন্তাধারার ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী অন্ধ অনুকরণ (তাকলিদ) এবং আদর্শিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও ফিকাহ্ কেন্দ্রিক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তাদের আন্দোলনের পুরোটাই ছিল ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ করা।

অবশ্য তারা তাকলিদের গোঁড়া পদ্ধতির বিরোধিতা করলেও মাজহাবের ইমামদের প্রাপ্য যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করেন। ইবনে তাইমিয়ার 'লিফটিং দি ব্লেইম অফ্ দি প্রমিনেন্ট ইমামস' গ্রন্থে এর প্রমাণ রয়েছে।

তদুপরি, আদর্শগত ও তাত্ত্বিক বিচ্যুতি বিশেষ করে হুলুল ও ইজতিহাদের প্রবক্তাদের নীতিভ্রংশতা এবং জাহেল, ভণ্ড ও ভাড়াটে লোকদের মারফত সুফিবাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আচরণগত বিপথগামীতার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালালেও ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়েম প্রকৃত সুফিবাদ এবং এর প্রবক্তাদের প্রতি সুবিচার এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। তারা এ বিষয়ে অনেক সাহিত্য রচনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া সম্বলিত দুই খণ্ডের গ্রন্থ 'মাজমু ফতোয়া' এবং ইবনুল কাইয়েমের বেশ কয়েকটি বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'মাদারিজ আল সালিকিন' এবং তিন খণ্ডে 'শারাহ্ মানাজিল আল সায়েরিন'।

পদ্ধতি গ্রহণ

আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কেবল সিদ্ধান্ত নয় বরং তাদের অনুসৃত পদ্ধতিও অবলম্বন করতে হবে। কেননা কেউ কোনো বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে পারেন, কিন্তু তাদের সুষম ও সুসংহত পদ্ধতির ব্যাপারে কিছুই জানতে পারবেন না।

কেউ এ পদ্ধতির তাৎপর্য প্রয়োগ ও এর লক্ষ্য অনুধাবনে যেমন সচেষ্ট হতে পারেন, তেমনি এর পাশাপাশি প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের কোনো কোনো সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমতও পোষণ করতে পারেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইমাম ইবনুল কাইয়েমের ব্যাপারে আমার অবস্থান এরূপ। আমি তাদের সামগ্রিক পদ্ধতিকে সম্মান করি ও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করি। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে আমি তাদের সব মতামতকে গ্রহণ করি। আমি যদি তাদের সব বক্তব্য গ্রহণ করি, তাহলে তাদের অনুকরণ করা হবে। আর এভাবে তারা যে পদ্ধতির প্রবক্তা সেটারই লঙ্ঘন করা হবে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে তাদেরকে তীব্র বিরোধিতা ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারণ তাদের পদ্ধতি গভীর চিন্তা, প্রমাণ সাপেক্ষ রায় নির্ভর সিদ্ধান্ত প্রদানকারী ব্যক্তি নিয়ে নয়। যে কোনো সিদ্ধান্ত যাচাই বাছাই করতে হবে খোদ ঐ সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি ও গুরুত্বের আলোকে।

যে ব্যক্তি ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়েমকে অন্ধ অনুকরণ (তাকলিদ) করেন তিনি কিভাবে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের তাকলিদকারীদের সমালোচনা করতে পারেন?

এ ইমামদ্বয়ের জীবনের কেবল তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিকের ওপর আলোকপাত করে তাদের জীবনের অন্যান্য উজ্জ্বল দিকগুলো উপেক্ষা করাও অন্যায় হবে। ইবনে তাইমিয়ার সেই সৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের উপেক্ষা করা উচিত হবে না যার প্রতিফলন ঘটেছে তার এ উক্তিতে : একটি কথা আমি প্রায়ই বলি বেহেশতবাসীরা যদি আমার মতো জীবনযাপন করে থাকে তাহলে তারা সত্যিই সুন্দর জীবন যাপন করছে। দুর্দশা ও বন্দী জীবন কাটানোর সময়েও তিনি বলতে পেরেছিলেন শত্রুরা আমার কী ক্ষতি করতে পারে? আমার বন্দিদশা তো নির্জনে ইবাদতের জন্যে। আমার নির্বাসন তো দ্বীনি সফর যা মূলত জ্ঞানের সন্ধান। আর আমার মৃত্যু তো শাহাদাত।

তিনি ছিলেন রূহানী মেজাজের মানুষ এবং তার শিষ্য ইবনুল কাইয়েমও ছিলেন একই রকম। যারা তাদের রচনাবলী মনোযোগ ও নেক নিয়ত নিয়ে অধ্যয়ন করবেন, তারা অবশ্যই এটি অনুধাবন করতে পারবেন। তদুপরি, এ দুই ইমামের জীবনে দাওয়াত ও জিহাদে সাহায্য করার দিকটিও আমাদের উপেক্ষা করা উচিত নয়। ইবনে তাইমিয়া নিজেই বেশ কয়েকটি সামরিক লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন। সশরীরে যুদ্ধ করার পাশাপাশি তিনি তার কণ্ঠনিঃসৃত বাণী দিয়েও অন্যান্য মুজাহিদদের হৃদয়ে অনুপ্রেরণার অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেছেন। এ দুই ইমাম ইসলামের পুনর্জাগরণে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। আর এ ঐকান্তিক সংগ্রামের কারণে বেশ কয়েকবার কারাগারে গিয়েছেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ৭২৮ হিজরীতে কারাগারেই ইন্তেকাল করেন। প্রকৃত ঐতিহ্যবাদের এটিই হচ্ছে অনন্য দৃষ্টান্ত।

আমরা যদি আমাদের সমসাময়িক ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব, সবচেয়ে প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিদা তার রচনাবলী, বই-পুস্তক ও স্বীয় ম্যাগাজিনের মাধ্যমে আধুনিক ঐতিহ্যবাদী পতাকাবাহক ও সালাফি পদ্ধতির প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। 'আল মানার' সাময়িকীর তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। এ ম্যাগাজিনেই তিনি 'আল মানার তাফসীর' প্রকাশ করেন যা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত হয়।

ইমাম মুহাম্মদ রশীদ রিদা ছিলেন তার সময়ে সত্যিকার অর্থে ইসলামের পুনরুজ্জীবনবাদী। যে কেউ তার তাফসীর, ফতোয়া কিংবা পুস্তক 'দি ইন্সপিরেশন অব মুহাম্মদ', 'দি ফ্যাসিলিটি অব ইসলাম', 'এ কল টু দি ফেয়ার সেক্স', 'দি খলিফা', 'দি আরগুমেন্টস অব দি রিফর্মার এন্ড দি ইমিটেটর' এবং অন্যান্য বহু বই ও রচনাবলী পাঠ করবেন তাহলে তিনি অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে তার চিন্তাধারা সত্যিই একটি

আলোকবর্তিকা (মানার) ছিল। এ 'মানারই' ইসলামের অনুসারীদেরকে আলোর পথ দেখিয়েছে–তার জীবনও ছিল সালাফি আদর্শের এক বাস্তব নমুনা।

ইমাম রিদা এক সোনালি সূত্রের উদ্ভাবক ছিলেন, পরবর্তীকালে ইমাম হাসান আল বান্না যা অনুসরণ করেন। সূত্রটি হচ্ছে ঃ আমরা যে বিষয়ে একমত সে সব ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা করা উচিত। আর যে বিষয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান তা পরস্পর এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

কী অপূর্ব সূত্র[১]। ঐতিহ্যবাদের প্রবক্তারা শুধু যদি এ সূত্রটি যথার্থভাবে উপলব্ধি ও অনুসরণ করতেন, কতই না ভালো হতো।

১. আমি এ সূত্রের যথার্থতা প্রতিপন্ন করে এবং এর সমর্থনে শরীয়াহর সাক্ষ্য প্রমাণ উল্লেখ করেছি 'কনটেম্পরারি ফতোয়া' গ্রন্থে।

পুনরুজ্জীবনবাদী আদর্শ

আমরা যে আদর্শ চাই তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি পুনরুজ্জীবনবাদী। এটি না প্রাচীন ধারার মধ্যে সীমিত, না উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, না এটি প্রচলিত রীতি বা অভ্যাসের অনুগত। এটি এমন এক আদর্শ যা ইজতিহাদে বিশ্বাস করে এবং সৃজনশীলতাকে অবলম্বন করে। কেননা এ আদর্শ অন্ধ অনুকরণ (তাকলিদ) ও নির্বিচার আনুগত্য প্রত্যাখ্যান এবং স্থবিরতাকে মৃত্যুর শামিল মনে করে। এটি ফিকাহ্, শিক্ষা, রাজনীতি ও অন্য সকল ক্ষেত্রে পুনর্জাগরণে বিশ্বাস করে।

পুনরুজ্জীবনবাদ ঐতিহ্যবাদের বিরোধী নয়

আমার 'দি ইসলামিক এয়োকেনিং এন্ড দি উজ অব দি আরব মুসলিম ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি। পুনরুজ্জীবনবাদী ও ঐতিহ্যবাদী আদর্শের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি বা বিরোধ নেই। বরং এ দু'টি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। প্রকৃত পুনরুজ্জীবন কেবল তখনই সম্ভব যখন তা ঐতিহ্যমুখী হয় এবং ঐতিহ্যকে কেবল তখনই সংরক্ষণ সম্ভব যখন তা পুনরুজ্জীবন আদর্শে বিশ্বাসী হয়।

পুনরুজ্জীবনবাদের অনুমোদন

আমাদের কখনো বলা উচিত নয় উৎস, দিক-নির্দেশনা, লক্ষ্য ও নীতির দিক দিয়ে ইসলামী আন্দোলন একটি অনমনীয় বিষয় এবং সেখানে পুনর্জাগরণের অবকাশ নেই।

ইসলাম স্বয়ং পুনরুজ্জীবনের বৈধতা অনুমোদন করে। সহীহ্ হাদিসে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক শতবর্ষের শুরুতে এমন কাউকে পাঠাবেন যিনি এ দ্বীনের পুনরুজ্জীবন ঘটাবেন (আবু দাউদ ও আল হাকিম)।

পুনরুজ্জীবনবাদ (তাজদিদ) বৈধ এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) যা বলেছেন তার চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে? অতএব সহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত দ্বীনে পুনরুজ্জীবনের কথা শুনে আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আমাদের যা করা উচিত তা হচ্ছে পুনরুজ্জীবনের তাৎপর্য অনুধাবন করা যাতে কোনো স্বার্থান্বেষী মহল তাদের তথাকথিত পুনরুজ্জীবনের নামে দ্বীনকে ব্যবহার করতে না পারে। কারণ এসব লোক পুনরুজ্জীবন থেকে বহুদূরে।

আমি এ হাদিসের ওপর গবেষণা করে লিখিত এক নিবন্ধে পুনরুজ্জীবনের অর্থ, এর বিভিন্ন দিক এবং কারা এর উদ্যোক্তা হতে পারেন সে সব বিষয় ব্যাখ্যা করেছি। সংক্ষেপে, পুনরুজ্জীবন মানে কোনো কিছুকে শীর্ষবিন্দুতে পৌছিয়ে অন্য কিছুর স্থলে

এটিকে বসিয়ে দেয়া নয়। বরং এটি অস্তিত্ব লাভের সময় যেমন ছিল যথাসম্ভব সেই আকারে এটিকে পুনরুদ্ধার করা এবং বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে এর মৌলিক প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিক বজায় রাখা। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় অর্থে এটি প্রযোজ্য। একটি পুরানো ভবন যেমন একটি প্রাসাদ, সৌধ অথবা মসজিদ পুনর্নির্মাণ করার অর্থ এটি গুঁড়িয়ে দিয়ে সর্বাধুনিক নির্মাণ শৈলী অনুযায়ী সে স্থানে আরেকটি ভবন নির্মাণ করা নয়, বরং যথাসম্ভব আদিরূপে তা সংস্কার করার জন্যে সর্বপ্রকার যত্ন নেয়া। আর তাই হচ্ছে প্রকৃত পুনরুজ্জীবন।

দ্বীনের পুনরুজ্জীবন অর্থ হচ্ছে এর ফিকাহ বা উপলব্ধির পুনরুজ্জীবন। আর তাই হচ্ছে এক আদর্শিক পুনরুজ্জীবন। দ্বীনের প্রতি ঈমানের পুনর্জাগরণ হচ্ছে এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি। দ্বীনের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা এবং দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে নবোদ্যমে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে সত্যিকার অর্থে পুনরুজ্জীবন। প্রত্যেক যুগে যুগোপযোগী পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন যা সমসাময়িক ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর এবং ঐ যুগের ব্যাধিগুলোর নিরাময় করবে।

কিন্তু এমন একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে পুনরুজ্জীবন কোনো অবস্থাতেই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তা হচ্ছে সেই সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র যে ব্যাপারে ইসলাম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে। এগুলো হচ্ছে আকীদা, ইবাদত ও আইন কানুনের (আহকাম) বিভিন্ন দিক যার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আচরণগত ঐক্য প্রতিফলিত হয়েছে। আমি অন্যান্য গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[১]

কৌশল পুনর্বিন্যাস

আন্দোলন যদিও উৎস, পারিপার্শ্বিক অবস্থান, নীতি ও লক্ষ্যের বিচারে ইসলামী, কিন্তু এমন কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় যা সময়, স্থান ও অবস্থার প্রেক্ষিতে দ্বীন পালনে সহায়ক এবং পৃথিবীতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার উপযোগী হয়।

কৌশল, পদ্ধতি ও ব্যবস্থা ইসলামের মতো অবিনশ্বর নয়। ইসলামের মৌলিক নীতি ও তত্ত্বের মতো এসব সামঞ্জস্যপূর্ণও নয়। কেননা হৃদয়ে ও বাস্তব জীবনে ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানবীয় চেষ্টা সাধনার ফলেই কৌশল পদ্ধতি প্রণীত হয়।

ইমাম হাসান আল বান্না ইসলামী পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনের সুসংঘবদ্ধ কাজের জন্যে বিধান রচনা করেন। তিনি নিজকে বা আল্লাহর মেহেরবানীতে যে কৌশল

১. আমার 'ইজতিহাদ ইন দি ইসলামিক শরীয়াহ' বইয়ের 'গাইড লাইনস এন্ড কন্ট্রোলস ফর এ প্রপার কনটেম্পরারি ইজতিহাদ' শীর্ষক অনুচ্ছেদ। উস্তাদ উমর আবেদ হাসানা রচিত গ্রন্থ 'দি ফিকাহ অব দি দাওয়াহ ঃ ইটস ফিচারস এন্ড হরাইজনস' বইয়ের 'ইজতিহাদ এন্ড রিনিউয়াল বিটুইন লিগ্যাল কন্ট্রোলস এন্ড কনটেম্পরারি নিডস' শীর্ষক অনুচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৭-১৮৮।

প্রণয়ন করেছিলেন তা অভ্রান্ত বলে দাবি করেননি। অথচ তার কৌশল এতোই শক্তিশালী ছিল যে সাইয়েদ কুতুব শহীদ তা বুদ্ধিদীপ্ত গঠন কৌশল বলে অভিহিত করেন। ইখওয়ানের মুর্শিদ আল আম ওমর আল তিলমিসানী তাকে বর্ণনা করেছিলেন প্রেরণাদীপ্ত ও প্রতিভাময় নেতা হিসেবে। আর শায়খ মুহাম্মদ আল গাজালী বলেছেন, ইমাম হাসান আল বান্না ছিলেন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ। এসব পদ্ধতি কৌশল সময়ে সময়ে পর্যালোচনা সাপেক্ষ ঠিক যেমন শিক্ষাবিদরা পাঠ্যক্রম ও রেফারেন্স পুস্তক প্রতি বছর পর্যালোচনা করে সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন করে থাকেন। যে কোনো মানবীয় কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন রয়েছে। সে প্রচেষ্টা যথার্থতার বা উৎকর্ষতার কাছাকাছি হোক বা না হোক।

হাসান আল বান্না নমনীয় ছিলেন

ইমাম হাসান আল বান্না নিজে নমনীয় ছিলেন। তিনি সব সময় আন্দোলনের কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির কলাকৌশল পুনর্মূল্যায়ন ও উন্নয়ন করতেন। তিনি কোনো একটি ইস্যুতে আগে যে মত দিয়েছিলেন সে ব্যাপারে তার কোনো ভক্ত অনুসারী যদি বিরুদ্ধ মত পোষণ করত তাতে ক্ষুব্ধ হতেন না। ইসলামী রাষ্ট্রে বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আমার এক রচনায় আমি তার মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছিলাম।

কেউ তার মৌলনীতিসমূহের সঙ্গে সম্পূরক কোনোকিছু যোগ করে দিলেও তাতে তিনি কিছু মনে করতেন না। যেমন শায়খ মুহাম্মদ আল গাজালী তার 'দি কনস্টিটিউশন অব দি কালচারাল ইউনিটি ফর মুসলিমস' গ্রন্থে হাসান আল বান্নার বিশ দফা মৌলনীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এরকম করেছিলেন। ইখওয়ানের প্রশিক্ষণের উসরা ও কাতিবার[১] শিক্ষার কৌশলপদ্ধতি পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে কোনো বিধিগত, ঐতিহ্যগত অথবা মানসিক বাধা ছিল না যাতে কর্মকৌশলে নতুন কিছু সংযোজন করা যায়।

স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবর্তন ও ঘটনাপ্রবাহের আলোকে রাজনৈতিক কৌশল পর্যালোচনা করাতে কোনো ক্ষতি নেই। চলমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ইসলাম, উম্মাহ ও আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে ফ্রন্ট বা এলায়েন্সে অংশগ্রহণ কিংবা চুক্তি বা জোটে শামিল হওয়া যেতে পারে। প্রতিটি দেশে একটি বিশেষ পরিবেশ থাকে, প্রতিটি যুগের বিশেষ নিয়ম থাকে এবং প্রত্যেক গ্রুপের থাকে নিজস্ব সামর্থ্য, তাগিদ ও অবস্থান যা সংশ্লিষ্ট গ্রুপ অন্য যে কোনো গ্রুপের চেয়ে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল থাকে।

ইসলামী আন্দোলন ফিকাহ ও অন্যান্য শরীয়াহ সংক্রান্ত শাস্ত্রের মতো অধ্যবসায়ী ও সৃজনশীল মনন ছাড়া অস্তিত্বমান, সমৃদ্ধিশীল ও বিকাশমুখী হতে পারে না। আর অন্ধ অনুকরণকারীদের মন মানসিকতার খপ্পরে পড়লে আন্দোলন কেবল স্থবির, সঙ্কুচিত ও

১. কাতিবা হচ্ছে ইখওয়ানের একটি রূহানী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। প্রশিক্ষণার্থী সদস্যরা প্রতি সপ্তাহে অথবা প্রতি দু'সপ্তাহে নফল ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে রাত্রিযাপন করেন।

শক্তিহীন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কারণ অন্ধ অনুকরণকারীদের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা চেতনায় সৃজনশীল মননের প্রতিপালন ঘটে না।

অনমনীয়তা একটি ব্যাধি

অনমনীয়তা এমন একটি রোগ যা ইসলামী আন্দোলনের সুসংহত পদ্ধতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং ভেতর থেকেও আন্দোলনের পথে একটি অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমার 'দি ইসলামিক সলিউশন : এ ফরিদাহ্ এন্ড এ নেসেসিটি' গ্রন্থে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছি।

অনমনীয়তা হচ্ছে সংগঠনে একটি একগুঁয়ে ধারা, শিক্ষায় স্থবির প্রক্রিয়া, দাওয়াতি কাজে একরোখা কৌশল, লক্ষ্য অর্জনে অনড় পদ্ধতি এবং রাজনীতির ময়দানে কট্টর মনোভাব বহাল রাখা। কেউ যদি এসব পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও কৌশল পরিবর্তন বা সংশোধনের চেষ্টা করে তাহলে তার প্রচেষ্টা কেবল ঈর্ষার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা হয় না, এমন কি সে নানা অপবাদ অভিযোগেরও সম্মুখীন হয়।

আমি আবারো জোর দিয়ে বলতে চাই, আমরা যে পুনরুজ্জীবন (তাজদিদ) চাই তার অর্থ পুরানো প্রথার অবলুপ্তি নয় বরং পুরানো প্রথার আধুনিকায়ন, উন্নয়ন, মান উন্নীতকরণ এবং নব নব সংযোজন বিশেষ করে কলাকৌশল ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে, যা হবে স্বাভাবিকভাবেই নমনীয় ও পরিবর্তনশীল। আমরা যেন সমসাময়িক আয়ত্তাধীন এসব কলাকৌশল অন্যদের মতোই কাজে লাগাতে পারি।

যা নিয়ে আমার ভয়

ইসলামী আন্দোলনের যে বিষয়কে আমি সবচেয়ে ভয় করি তা হচ্ছে এরা মুক্তচিন্তার বিরোধী এবং তাজদিদ ও ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে কেবল এক ধাঁচের চিন্তার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে, যা অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতকে গ্রাহ্য করে না। এসব মতামতে আন্দোলনের জন্য ভিন্ন লক্ষ্য, কৌশল ও পর্যায়ক্রম নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়। ঘটনাপ্রবাহ, পরিস্থিতি ও মানুষ সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের পর্যালোচনা পেশ করা হয় অথবা মানবীয় ইজতিহাদের আওতায় পড়ে এমন কোনো বিষয়ে একদেশদর্শী চিন্তার সাথে ভিন্নমত পোষণ করা হয়। কারণ মানবীয় ইজতিহাদ পরিবর্তনশীল অবস্থার আলোকে সব সময় পরিবর্তন সাপেক্ষ। আমাদের ফকিহরা অনেক আগেই বলে গেছেন– স্থান, কাল, প্রথা ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে ফতোয়ার অবশ্যই পরিবর্তন হবে।

আমার ভয় যদি বাস্তবে রূপ নেয় তাহলে নব নব চিন্তা ও উদ্ভাবনে সক্ষম মননশীল মানুষ আন্দোলনের কাঠামো থেকে ছিটকে পড়বে যেমন আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি গড়িয়ে যায়। পেছনে থেকে যাবে সেই সব রক্ষণশীল ব্যক্তি যারা কেবল অন্ধ অনুকরণে পারদর্শী এবং যারা সব কিছু তা যতই প্রাচীন হোক না কেন বহাল রাখতে চায়। তাদের বিশ্বাস,

আমরা যা জানি তা আমরা যা জানি না তার চেয়েও উত্তম এবং আমরা যা কিছু করেছি তা এখনো যা করতে পারিনি তার চেয়েও উত্তম।

এর পরিণতি এ হবে যে আন্দোলন তার সাংগঠনিক কাঠামো থেকে সৃজনশীল মেধার অধিকারী মানুষকে হারাবে এবং অনিবার্যভাবে স্থবির অথবা নির্জীব অবস্থার শিকার হবে যেমন তাকলীদের জামানায় ফিকাহ শাস্ত্র ও সাহিত্যের করুণ পরিণতি হয়েছিল। আন্দোলনের বাদ বাকি সদস্যরা ইসলামের সহায়তায় কোনো ফলপ্রসূ চেষ্টার আশা নেই দেখে চুপিসারে নিজেদের গুটিয়ে ফেলবে অথবা তারা এককভাবে নিজেরা কাজ করবে বা অন্যান্য কোনো সমন্বিত উদ্যোগের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলবে যার পরিণাম কেউ জানে না।

যুগে যুগে মুসলিম মানসের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি করেছে এ প্রবচনটি– পূর্বসূরিরা উত্তরসূরিদের নতুন কিছু সংযোজন করার জন্যে ফেলে যাননি। অথবা অন্য কথায় এর চাইতে ভালো আর হতে পারে না।

বর্তমানে মুসলিম মানসের জন্যে এ প্রবচন অবলম্বন করা ছাড়া অন্য আর কিছুই উপকারী হতে পারে না আর তা হচ্ছে– পূর্বসূরিরা তাদের বহু আরব্ধ কাজ উত্তরসূরিদের জন্য রেখে গেছেন অথবা এর চাইতে ভালো সব সময়ই হতে পারে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন ঃ এবং তিনি এরূপ বহু জিনিসও সৃষ্টি করেন, যে ব্যাপারে তোমরা জান না (সূরা নাহ্ল ঃ ৮)।

ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শ

আমরা যে আদর্শ চাই তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা উদ্দেশ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ভারসাম্যপূর্ণ। কারণ তা এমন এক সুষম আদর্শ যা মানুষ ও জীবনের প্রতি এক মধ্যম, সমন্বিত ও প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়। এ হচ্ছে চরমপন্থা ও ঔদাসীন্য থেকে মুক্ত এক সংহত ও সুষম উম্মাহর এক ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রধান প্রধান ইস্যুতে ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শ

বিভিন্ন প্রধান প্রধান ইস্যুতে এ আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গির ভারসাম্য সুস্পষ্ট ঃ

১. এ আদর্শ ধর্মতত্ত্ব, ফিকাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যারা নির্দিষ্ট মাজহাব কঠোরভাবে অনুসরণের প্রবক্তা এবং যারা লা মাজহাবী উভয়ের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ।

২. এ আদর্শ যারা সুফিবাদকে ইবাদতের ক্ষেত্রে বিপথগামী অথবা মিথ্যাচারী যাই হোক না কেন সমর্থন করে এবং যারা সুফিবাদ যতোই সঠিক ও শরীয়াহসম্মত হোক না কেন তার বিরোধিতা করে–উভয়ের মাঝে সুষম দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে।

৩. এ আদর্শ নিয়ন্ত্রণহীন মুক্তদ্বার নীতি এবং অযৌক্তিক রুদ্ধদ্বার নীতির প্রবক্তাদের মধ্যে ভারসাম্য অবস্থান বজায় রাখে।

৪. এ আদর্শ কোনো বিষয় কোরআন সুন্নাহর বিরোধী হলে যারা যুক্তির আশ্রয় নেয় এবং যারা কখনো কোরআন সুন্নাহ অনুধাবনেও যুক্তির আশ্রয় নেয় না উভয়ের মাঝে সুষম দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে।

৫. এ আদর্শ যারা উত্তরাধিকারকে মানবীয় ব্যর্থতা সত্ত্বেও পবিত্র মনে করে এবং যারা উত্তরাধিকারের মাঝে ঐশী প্রেরণা নিহিত থাকলেও অগ্রাহ্য করে এ দু'য়ের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ।

৬. এ আদর্শ যারা শিক্ষাকে বাদ দিয়ে রাজনীতিতে নিয়োজিত হয় এবং যারা শিক্ষায় আত্মনিয়োগের অজুহাতে রাজনীতিকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করে এ দু'য়ের মাঝে সুষম।

৭. এ আদর্শ ফল পাকার আগেই যারা সুফল পেতে চায় এবং ফল পেকে অন্যের হাতে না পড়া পর্যন্ত যারা ফল দেখতেই পায় না এ দু'য়ের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ।

৮. এ আদর্শ যারা কেবল বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত, ভবিষ্যত নিয়ে ভাবে না এবং যারা ভবিষ্যতের ভাবনায় অতিশয় বাড়াবাড়ি করে উভয়ের কাছে ভারসাম্যপূর্ণ।

৯. এ আদর্শ যারা সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে কাজ করাকে বন্দেগীতুল্য মনে করে এবং যারা কোনো সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে কাজ করাকে প্রাধান্য দেয়– উভয়ের মাঝে সুষম।

১০. এ আদর্শ যারা সংগঠনের নেতার আনুগত্য করতে গিয়ে অতিভক্তির পর্যায়ে চলে যায় এবং যারা স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী আচরণ করে যেন তারা সংগঠনের সদস্যই নয় এ উভয় গ্রুপের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে।

১১. এ আদর্শ স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা না করেই যারা বিশ্বব্যাপী কার্যক্রমের প্রবক্তা এবং বিশ্ব আন্দোলনের সাথে কোনো সম্পর্ক না রেখে যারা সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিক কার্যক্রমে বিশ্বাসী তাদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

১২. এ আদর্শ যারা বাধাবিপত্তির তোয়াক্কা না করেই অতি আশাবাদী এবং যারা অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখে না এমন অতি নৈরাশ্যবাদীদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে।

১৩. এ আদর্শ যারা নিষেধ করতে গিয়ে এমন চরমে পৌঁছায় যে দুনিয়ায় হালাল বলে কিছুই নেই এবং যারা ছাড় দিতে গিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করে যেন হারাম বলে কিছু নেই এ দু'য়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

এ ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শই আমরা চাই। যদিও আমাদের আজকের সমাজের নিয়ম হচ্ছে কোনো একটি চরম পন্থাকে আঁকড়ে থাকা তা অতি বাড়াবাড়িই হোক বা চরম উদাসীন হোক। এর ব্যতিক্রম খুবই কম।

ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অবক্ষয়

কোনো কোনো ইসলামপন্থী কেবল দুটি রঙ দেখতে পান–সাদা আর কালো। তারা অন্য কোনো রঙ না চেনেন, না দেখতে পান কোনটি মৌলিক ও কোনটি মিশ্র রঙ, যে রঙ অন্যেরা দেখতে পায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ সকল রঙ বাদ দিয়ে নিজের দৃষ্টি এমন কি জীবনকে একটি মাত্র কালো রঙের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখেন। তারা মানুষ ও বস্তুকে কালো ফিল্মে আচ্ছাদিত চোখ দিয়ে দেখেন।

তারা এ কালো হতাশাবাদী দৃষ্টি দিয়েই প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব তৈরি রাখেন এবং কাকে বা কোথায় গিয়ে লাগল তার পরোয়া না করেই মিসাইলের মতো ছুঁড়ে দেন। তাদের কাছে গোটা সমাজই ইসলামপূর্ব যুগের মতোই জাহেল। জীবনের সব কিছুই পাপ। সব লোক হয় বেঈমান, নয় তো মুনাফিক। দুনিয়া অপশক্তিতে পূর্ণ, গোটা জগত অকল্যাণে পূর্ণ।

তাদের চোখে সমসাময়িক যুগে মানুষ যা কিছু করে তা হারাম ছাড়া কিছু নয়। সকল সঙ্গীত, অভিনয়, নাটক এবং শিল্পকলা হারাম।

হতাশাবাদীরা সাহসিকতার সঙ্গে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। অথচ আমাদের পূর্বসূরিরা সন্দেহাতীতভাবে হারাম বলে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত হারাম শব্দটি ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আল-কোরআনের দু'টি আয়াতে মদের নিন্দা করে বলা হয়েছে ঃ তারা আপনাকে মদ ও জুয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, উভয়ের ব্যবহারের মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু কল্যাণও আছে। আর এ দু'টোর মধ্যে কল্যাণ অপেক্ষা পাপই অধিক গুরুতর (সূরা আল বাকারা ঃ ২১৯)।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ এবং তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের নিকটেও যেও না (সূরা আন নিসা ঃ ৪৩)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কোনো কোনো সাহাবি (রা.) মদপান অব্যাহত রাখেন এবং কেউ কেউ বললেন, ইয়া আল্লাহ, মদের ব্যাপারে আমাদের কাছে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাঠান, এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি জানানো হয় সূরা মায়েদার ৯০ নং আয়াতে ঃ এ হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হতে পার।

আমাদের স্বীকার করতে হবে যে পঞ্চাশের দশকে বেশকিছু জাহেলী চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে। এসব চিন্তাধারা ইসলামী সমাজেও এমন মাত্রায় বিস্তার লাভ করে যে সব কিছু প্রত্যাখ্যান, হতাশা, সংশয় এবং মুসলমানসহ অন্যদের অভিযুক্ত করার প্রবণতা চিন্তার প্রধান ধারা হয়ে দাঁড়ায়।

সে সময়ে অন্যকে পাপী, অবিশ্বাসী এমন কি কাফের বলে রায় দেয়ার প্রবণতার ক্ষেত্র তৈরি হয় এবং এ রকম একটি নিপীড়নমূলক পরিবেশে এ চিন্তাধারা বিকাশে সহায়ক হয়। আর এমনি পরিবেশেই ইসলামী আন্দোলন এবং তার অনুসারীরা ঐ সময়ের সম্মুখীন হয়। ঐ সময়ে ইসলামী আন্দোলনের অনুসারীদেরকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হয়। গোপনে তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেয়া হয়। অন্য সব ধরনের নিপীড়নও চালানো হয়। অন্য দিকে কমিউনিস্ট, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ইসলামের শত্রুদের জন্যে সকল দরজা খুলে দেয়া হয়।

এ সময়েই শহীদ সাইয়েদ কুতুবের বইগুলো প্রকাশিত হয় যাতে তার সর্বশেষ চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে। এসব গ্রন্থে সমাজকে একটি অবিশ্বাসী সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করে ইসলামী দাওয়াতের কাজ স্থগিত করার তাগিদ দেয়া হয়। ইসলামী ফিকাহর পুনরুজ্জীবন ও বিকাশ এবং ইজতিহাদের পুনরুজ্জীবনের নব উদ্যোগকে ব্যঙ্গ করা হয়। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাধারণভাবে সব মানুষের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক জিহাদ শুরুর ডাক দেয়া হয়। সহিষ্ণুতা ও নমনীয়তার প্রবক্তাদের অর্বাচীন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে মানসিক পরাজয় বরণকারী বলে শনাক্ত করা হয়।

শহীদ সাইয়েদ কুতুবের এরূপ চিন্তাধারার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায় তার সুবিখ্যাত তাফসির 'ফি যিলালিল কোরআন', 'ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা', 'ইসলাম এন্ড দি প্রব্লেমস অব সিভিলাইজেশন' সহ অন্যান্য গ্রন্থে। এসব রচনার ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব থাকলেও নেতিবাচক প্রভাবও লক্ষণীয়।

এছাড়া শায়খ সাইয়েদ হাওবা (র.) তার বই পুস্তকে অনুরূপ বক্তব্য জোরালোভাবে উত্থাপন করেছেন।

এদিকে আমাদের সামনে নব্য জাহিরীদের, যারা আক্ষরিক অর্থের আলোকে কোরআনের ব্যাখ্যা করেন, উদ্ভাবিত এক নতুন ধরনের ফিকাহর অভ্যুদয় ঘটে। তারা নিজেদেরকে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার চিন্তাধারার অনুসারী বলে দাবি করলেও পবিত্র কোরআনের আক্ষরিক তাফসীরের সঙ্গে ইবনে তাইমিয়া ও তার অনুসারীদের দূরতম সম্পর্কও খুজে পাওয়া যায় না। তারা কখনোই বাহ্যিক কাঠামো ও বিন্যাসের মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, যে বিষয়টির ওপর নব্য জাহিরীরা অধিক মাত্রায় গুরত্ব আরোপ করে।

এভাবেই ইসলামী চিন্তাধারায় অনমনীয়তা ও একগুয়েমির প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে এবং কিছু কালের জন্যে সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তার সহনশীল চেতনা অবদমিত থাকে। আমি মনে করি ইসলামী আন্দোলনের উচিত হবে এ ধরনের অস্বাভাবিক চিন্তাপদ্ধতি থেকে নিজেকে সরিয়ে আনা যেন আন্দোলন নমনীয়, ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শের পথে অগ্রসর হতে পারে যেন এক ভারসাম্যপূর্ণ মুসলিম উম্মাহ এবং এক পূর্ণ ভারসাম্যময় চিন্তাপদ্ধতির অভিব্যক্তি ঘটে। যে আদর্শের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা বান্দাদের জন্যে সহজসাধ্যতা চান, কাঠিন্য নয়।

মধ্যপন্থা ও সহজপন্থা

স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করতে আমার মতে, মধ্যপন্থা বা ভারসাম্য পদ্ধতি হাত ধরাধরি করে চলে। দ্বীনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি একদিকে অনমনীয়তা ও অহেতুক বাড়াবাড়ি এবং অন্য দিকে শৈথিল্য ও লাগামহীনতার মধ্যে এক সুষম দৃষ্টিভঙ্গি।

সহজতর পথ

ইসলামী আন্দোলনকে অবশ্যই জটিলতা নয়, সহজতর পথ ধরে এগোতে হবে। সমাজ সম্পর্কে ইসলামী আইনবিদদের মতামত, অর্থনীতি, আইন, আচরণ ও আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে এ সহজতর নীতি অবলম্বন করতে হবে। একাধিক কারণে আমি এ কথা বলছি।

প্রথমত, আমাদের শরীয়াহ সহজসাধ্যতা, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তা কাঠিন্য ও ক্লেশ নির্মূল করতে চায়। শরীয়াহর মূল গ্রন্থগুলোতে এ চেতনাই প্রতিফলিত হয়েছে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫)। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ আর আল্লাহর ইচ্ছে নয় যে তোমাদের ওপর কোনো অসুবিধা চাপিয়ে দেন (সূরা মায়েদা ঃ ৬)। মহান আল্লাহ বলেন ঃ আল্লাহতায়ালা তোমাদের ভার হালকা

করতে ইচ্ছে করেন, কারণ মানুষকে দুর্বলভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে (সূরা আন নিসা ঃ ২৮)। আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ এটি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সহজ ব্যবস্থা ও অনুগ্রহ (সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৮)।

মহানবী (সা.) বলেছেন ঃ কাজকর্ম সহজ করে দাও, কঠিন নয় (বুখারী ও মুসলিম)। অন্য হাদিসে বলা হয়েছে ঃ তোমাদেরকে বিষয়াদি সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে এবং এগুলো কঠিন করে ফেলো না (তিরমিজি)।

আমর ইবনুল আস (রা.) এক শীতের রাতে নাপাকি সত্ত্বেও ফরজ গোসল না করেই নামাজ আদায় করেন। তখন তার সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহর (সা.) নিকট অভিযোগ করলে আমর আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন ঃ আমি আল-কোরআনের ঐ আয়াত স্মরণ করেছি যেখানে আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতি করুণাশীল (সূরা আন নিসা ঃ ২৯) এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) স্মিত হাসলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কিছু লোকের এরূপ মানসিকতার তীব্র নিন্দাও করেন। যারা এক আহত ব্যক্তিকে নাপাকির দরুন তাকে অবশ্যই গোসল করতে হবে বলে পীড়াপীড়ি করেছিল এবং লোকটি গোসল করে ও তাদের নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তের কারণে ইন্তেকাল করে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ তারা তাকে হত্যা করেছে। তারা যখন জানে না তখন জিজ্ঞেস করলো না কেন? না জানার প্রতিকার হচ্ছে প্রশ্ন করা। তার ক্ষতস্থানে একটি ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে তায়াম্মুম করে নেয়াই যথেষ্ট ছিল (আহমাদ, আবু দাউদ ও আল হাকিম এবং সহীহ আল জামি আল সগীরেও এ হাদিস বর্ণিত হয়েছে)।

দ্বিতীয়ত, আমাদের এ যুগে অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে মানুষের কল্যাণের স্বার্থে সহজসাধ্যতার প্রয়োজন অনেক বেশি। কারণ অধুনা মানুষের ইচ্ছা শক্তির এমন অবক্ষয় ঘটেছে যে সৎ ও কল্যাণকর কাজের ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ কমে গিয়ে দুষ্কর্মের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুতরাং, দ্বীনি হুকুম আহকাম পালনে কঠোরতম নিয়মবিধি অনুসরণের তাগিদ দেয়ার পরিবর্তে মানুষকে সহজসাধ্যতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করাই বাঞ্ছনীয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী মানুষ এবং মরুভূমির বেদুঈনদের প্রতি এমন আচরণই করেছিলেন। যারা দ্বীনি আহকাম ফরজ পালন ছাড়া অন্যান্য নফল ইবাদত করার অঙ্গীকার করতো না। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকেও গ্রহণ করে নিতেন এবং কারো কারো সম্পর্কে বলতেন ঃ সে তার কথা অনুযায়ী ভালো কাজ করলে সে সৎ কর্মশীল হবে, অথবা সে তার ওয়াদা পালন করলে বেহেশতে যাবে অথবা তোমাদের কেউ যদি বেহেশতী লোক দেখতে চাও, তাহলে এ লোকটির দিকে দেখ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধুমাত্র তাদের প্রতি মমত্ববোধ এবং তাদের কঠোর অবস্থা বিবেচনা করেই এরূপ সদাচার করতেন।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিগতভাবে যে কেউ নিজের ওপর কঠোরতা আরোপ করে স্বীয় ইচ্ছা শক্তির সীমানা পরখ করতে পারে। কিন্তু মধ্যপন্থা হচ্ছে সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে উপযোগী উপায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ সে সব লোককে পছন্দ করেন যারা তাঁর প্রদত্ত সহজসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে, কারণ তিনি তাদের পাপকর্ম করাকে ঘৃণা করেন (আহমাদ, ইবনে হিব্বান ও বায়হাকী এবং সহীহ আল জামি আল সগীরেও এ হাদিস সন্নিবেশিত হয়েছে)।

সুতরাং, ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে একজন ফকিহর কঠোর শর্তাদি আরোপ করা উচিত নয়। তাকে এটি বিবেচনায় রাখতে হবে যে সর্বসাধারণের মধ্যে দুর্বল, বয়োবৃদ্ধ ছাড়াও এমন লোকও রয়েছে যাদের প্রতি উদার হওয়ার সঙ্গত কারণ রয়েছে। নামাজের জামায়াতে ইমামতী সম্পর্কে একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ঃ যিনি নামাজে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তার উচিত নামাজকে সংক্ষিপ্ত করা, কেননা ইমামের পেছনে মানুষদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ, অসুস্থ এবং ব্যস্ত মুসাফির থাকতে পারে। সালাত হচ্ছে এমন একটি প্রতীক যেখানে জীবনের নানা দিকের প্রতিফলন ঘটে।

অতএব, ইসলামী আন্দোলনের ফকিহরা এমন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না যা বিধিনিষেধের প্রাচীর খাড়া করে, সহজসাধ্যতার পথ নির্দেশ করে না, কেবল নিষেধ করে, অনুমতি দেয় না। বিশেষ করে সে সব ইস্যুতে যেগুলোর সঙ্গে মহিলা, পরিবার, শিল্পকলা, বিনোদন ইত্যাদি বিষয় জড়িত।

এ জাতীয় অন্যান্য প্রশ্ন লেনদেনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যেখানে সুযোগ দেয়াটাই স্বাভাবিক নিয়ম এবং নিষেধাজ্ঞা জারি করাটা ব্যতিক্রমী বিষয় বলে গণ্য হওয়া উচিত। দণ্ডবিধির ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। ন্যূনতম সাজা প্রদান করা উচিত। অনুশোচনা দণ্ডবিধি রদ করে দেয় এ মত এখানে বিবেচনায় রাখা উচিত। যেমন মদপানের শাস্তি তাজীরভুক্ত[১] যার পরিমাণ কোরআন ও সুন্নাহতে উল্লেখিত হয়নি এবং তা আদালত বা আইন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হয় ইত্যাদি।

এ পর্যায়ে আমি ইমাম সুফিয়ান আল সাওরীর বক্তব্যের আলোকে আমাদের লক্ষ্য তুলে ধরতে চাই ঃ কেবল বিশ্বাসযোগ্য ফকিহগণ সহজসাধ্যতা প্রসঙ্গে রায় দিতে পারেন, কিভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে সে তো সবাই জানে।

১. আমার প্রবন্ধ 'দি ফ্যাক্টরস অফ ফ্লেক্সিবিলিটি ইন দি ইসলামিক শরীয়াহ'।

ভবিষ্যতমুখী আদর্শ

ইসলামী আন্দোলনের জন্য যে আদর্শ আমরা চাই তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা একটি ভবিষ্যতমুখী আদর্শ অর্থাৎ তা বর্তমানের মধ্যে নিজেকে সীমিত না রেখে সব সময় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ইসলামী আন্দোলন ভবিষ্যতের ব্যাপারে যত্নবান। কেননা তা ইসলামেরই যৌক্তিকতা এবং কোরআন ও সুন্নাহতে এ যৌক্তিকতার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে।

আল-কোরআন ও ভবিষ্যত

পবিত্র কোরআন মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে মক্কী যুগ থেকে আল-কোরআন মুসলমানদের এক উজ্জীবিত ভবিষ্যতের দিকে আকৃষ্ট করে বলেছে, বিশ্বে পরিবর্তন ঘটছে এবং পরিস্থিতিও পরিবর্তনশীল। সমকালের বিজয়ীরা বিজিত হচ্ছে, দুর্বলরা শক্তিশালী হচ্ছে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে ক্ষমতা গ্রহণের জন্যে প্রত্যেকেরই পালা থাকে।

মুসলমানদেরকেও নিজেদের ঘর গুছিয়ে প্রস্তুত হতে হবে পরিবর্তনের পালাকে বরণ করে নেয়ার জন্যে যা আজ হোক কাল হোক অবশ্যই আসবে, অনিবার্যভাবেই আসবে ইনশাআল্লাহ।

মক্কী সূরা আল কামারের ৪৫-৪৬ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা শক্তিশালী, অস্ত্রসজ্জিত, বিপুল সংখ্যার মুশরিকদের সম্পর্কে বলছেন ঃ অচিরেই তারা অধিক সংখ্যায় পলায়ন করবে এবং তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। বরং কিয়ামত তাদের জন্যে প্রতিশ্রুত সময় তাদের পূর্ণ প্রতিফলের জন্য এবং কিয়ামত অতি ভয়ঙ্কর ও অতি তিক্ততর ।

ইবনে কাছীর তার বিখ্যাত তাফসীরে ইকরামার বরাত দিয়ে বলেছেন ঃ অচিরেই তারা অধিক সংখ্যায় পলায়ন করবে আয়াতটি যখন নাজিল হয় তখন ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন বিশাল বাহিনী পলায়ন করবে। বদরের দিনে আমি বর্মাচ্ছাদিত রাসূলুল্লাহ (সা.) কে চলন্ত অবস্থায় দেখলাম। তিনি বললেন ঃ অচিরেই তারা অধিক সংখ্যায় পলায়ন করবে। আমি তখনই এ আয়াতের তাৎপর্য উপলব্ধি করলাম।

হযরত আয়েশার (রা.) বরাত দিয়ে ইমাম বুখারী বলেন ঃ হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন মক্কায় তখনই এ আয়াত নাজিল হয় এবং সে সময় আমি ছোট্ট বালিকা। আয়াতটি হচ্ছে ঃ বরং কিয়ামত তাদের জন্যে প্রতিশ্রুত সময় তাদের পূর্ণ প্রতিফলের জন্য এবং কিয়ামত অতি ভয়ঙ্কর ও অতি তিক্ততর।

এরূপ আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে, মুসলিম মানসকে অনিবার্য পরিবর্তন ও আসন্ন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পবিত্র কোরআনে সমসাময়িক দু'টি পরাশক্তির ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের উল্লেখ দেখতে পাই– রোমান ও পারসিক এবং মক্কায় মুসলমান ও কাফের– দু'গ্রুপই সংঘর্ষের ব্যাপারে উদ্বেগ পোষণ করতো। এ প্রেক্ষাপটে আল-কোরআন মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এমন দিন আসন্ন যখন আধিপত্য আহলে কিতাব রোমানদেরই হবে এবং অগ্নিপূজক পারসিকদের পরাজয় ঘটবে। যদিও আজ তারা বিজয়ী, কয়েক বছরের মধ্যেই তারা পরাজিত হবে। এ প্রসঙ্গে সূরা রূমের ১–৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আলিফ লাম মীম। রোমানরা পরাজিত হয়েছে কয়েক বছরের মধ্যেই এক নিকটবর্তী স্থানে। এবং তারা তাদের এ পরাজয়ের পর শিগগিরই বিজয়ী হবে, পূর্বে ও পরের এখতিয়ার আল্লাহর হাতে। আর ঐ দিন মুমিনরা আনন্দিত হবে আল্লাহতায়ালার এ সাহায্যের জন্যে। তিনি যাকে ইচ্ছে সাহায্য করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

উল্লিখিত আয়াতসমূহ আমাদেরকে দু'টি দিকের প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছে ঃ

১. মুসলমানরা সংখ্যায় ও উপায় উপকরণে কম হলেও বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ, তাদের আশপাশের বৃহৎশক্তিগুলোর সংঘাত সংঘর্ষ এবং তাদের ওপর এ সংঘাতের ফলাফলের ব্যাপারে তারা বেশ সচেতন ছিল।

২. পবিত্র কোরআন এসব ঘটনা উল্লেখ করে পরিবর্তনের উপাদান ও বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে উত্তরণের দিকে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সূরা মুয্যাম্মিলের শেষ আয়াতে আল্লাহতায়ালা তাহাজ্জুদ নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মুসলমানদের ওপর থেকে কড়াকড়ি শিথিল করার কথা বলেছেন। কেননা তাদেরকে শত্রুর সাথে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল। এসব শত্রু মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আল্লাহর পথে অগ্রযাত্রা ব্যাহত করছিল। ফলে মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়া এ সংঘর্ষের মোকাবিলার জন্যে তাদের শক্তি সঞ্চয় করা আবশ্যক ছিল।

সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ আপনার প্রভু জানেন, আপনি ও আপনার সঙ্গীগণের মধ্যে কতিপয় লোক ইবাদতের জন্য রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এবং কখনো অর্ধরাত্রি, আবার কখনো রাতের এক-তৃতীয়াংশ দণ্ডায়মান থাকেন। আর রাত ও দিনের পূর্ণ পরিমাপ আল্লাহই করতে পারেন। তিনি জানেন, আপনারা সারারাত ধরে ইবাদত করতে সক্ষম নন। অতএব, তিনি আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং যে পরিমাণ কোরআন সহজে তেলাওয়াত করা যায় তেলাওয়াত করুন। তিনি অবগত আছেন, তোমাদের মধ্যে কতক পীড়িত হবে, আর কতক জীবিকান্বেষণের জন্যে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করবে। আর কতক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। সুতরাং যে পরিমাণ কোরআন সহজে তেলাওয়াত করা যায়, তেলাওয়াত করুন (সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ২০)।

সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি

মনোযোগ সহকারে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সীরাত অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর দাওয়াতের ভবিষ্যতের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা ও উপায় উপকরণের আলোকে ভবিষ্যতের জন্যে সব সময় চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা করতেন।

হজ্ব মৌসুমে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রচেষ্টা ও তৎপরতা সম্পর্কে পড়াশোনা করলেই তা বোঝার জন্য যথেষ্ট হবে– হজ্বের সময় আরবের সকল গোত্র সমবেত হতো এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের কাছে কিভাবে দাওয়াত পেশ করতেন, তিনি তাদের সাহায্য কামনা করতেন রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের সম্পদপ্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এ থেকেই বোঝা যায়, ভবিষ্যতের দিকে তার দৃষ্টি কতটা প্রসারিত ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'টি প্রধান নীতিতে বিশ্বাস করতেন ঃ

প্রথমত, অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, কেননা পরিবর্তনের কারণ বিরাজমান ছিল। বিদ্যমান পরিস্থিতির বিকল্পই ছিল ইসলাম। অজ্ঞতার অন্ধকার ভেদ করে উষার আলো উদ্ভাসিত হবেই। সুতরাং, মুসলমানদেরকে দৃঢ়পদ ও সহিষ্ণু হতে হবে এবং যথাযথ সময় হওয়ার পূর্বেই ফলাফলের আশা করা ঠিক হবে না।

মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সঙ্গীসাথীদের বিশেষ করে দুর্বল শ্রেণীর ওপর কাফেরদের অত্যাচার এতো বেড়ে গেল যে খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে ফরিয়াদ জানালেন এবং সাহায্য চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন কাবা ঘরের ছায়ায় ঘুমাচ্ছিলেন। খাব্বাব বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্যে সাহায্য চাইবেন না? আপনি কি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করবেন না? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে কোনো কোনো লোককে ধরে নিয়ে মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলা হয়েছে, অতঃপর তাদের মাথার খুলি করাত দিয়ে ভাগ করা হয়েছে, লোহার চিরুনি দিয়ে তাদের হাড় থেকে মাংস আলাদা করা হয়েছে। কিন্তু এরপরও তাদেরকে দ্বীন থেকে বিমুখ করা যায়নি। আল্লাহর শপথ, তিনি ইসলামী দ্বীনকে প্রভাবশালী করবেন এমনভাবে যে একটি কাফেলা সানা থেকে হাদ্রামাওত (ইয়েমেন) পর্যন্ত সফর করার সময় কেবল আল্লাহকে ভয় করবে। অবশ্য কাফেলার পাহারাও দেবে যাতে নেকড়ে বাঘ তাদের ভেড়ার পালে হামলা না চালায়। কিন্তু তোমাদের ধৈর্য নেই যে সেই সত্য বাস্তবে দেখার জন্যে প্রতীক্ষা করবে (বুখারী)।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশ্বাস করতেন এ কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যত তখনই বাস্তবে রূপলাভ করবে যখন মানুষ আল্লাহর অনুমোদিত বিধি অনুযায়ী কর্তব্য পালন ও নিজেকে যথাসম্ভব প্রস্তুত করবে। পথ থেকে সব বাধা অপসারণে তৎপর হবে এবং এর বাইরে সব কিছু সৃষ্টিকর্তার ওপরে ছেড়ে দেবে। কেননা মানুষ যা করতে পারে তা আল্লাহর জন্যে করা আদৌ কঠিন নয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মদিনায় হিজরতের মধ্য দিয়ে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরব উপদ্বীপের মধ্যেই হিজরতের স্থান বেছে নিয়েছিলেন উপযুক্ত স্থান মনে করে, আবিসিনিয়ার মতো কোনো স্থান নয়। তিনি আনসারদের সাচ্চা আরব মনে করতেন। তারা নিজেদের পরিবারবর্গের মতোই তাঁকে রক্ষা করার ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিল। তিনি তাঁর সঙ্গীদের হিজরতকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এ জন্য যে যাতে তাদের জন্যে মক্কা ত্যাগ করা সহজতর হয়। বস্তুত তাদের পরে রাসূল (সা.) এর মদিনায় পৌঁছা যেন আরো গুরুত্ববহ হয়।

আল্লাহর অনুমতি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) যাত্রার বাহনের জন্যে পশু ঠিক করলেন। তাঁর সঙ্গী এবং পথের গাইড কে হবে তাও ঠিক করে নিলেন। এমন কি কাফেররা তাকে তালাশ করে ক্ষান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন গুহায় আত্মগোপন করবেন, এসব আগেই স্থির করে নিলেন।

তিনি মানুষের পক্ষে সম্ভব সব রকম গোপনীয়তা বজায় রেখে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং যেসব বিষয়ের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ নেই সেগুলো আল্লাহর ওপর সোপর্দ করলেন। আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করবেন এ বিষয়ে তাঁর কোনোই সন্দেহ ছিল না। যখন হযরত আবু বকর (রা.) গুহায় তাঁকে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সা.), ওদের মধ্যে কেউ যদি তার পায়ের নিচে তাকায় তাহলে সে নিশ্চয় আমাদেরকে দেখে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ আবু বকর তুমি সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে কি চিন্তা করো, যাদের সঙ্গে তৃতীয় আরেক জন আছেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ যদি তোমরা তাঁকে (মুহাম্মদ) সাহায্য না করো তাতে কিছু আসে যায় না। তবে বস্তুত আল্লাহতায়ালাই তাঁকে সাহায্য করেছেন সেই সময়ে যখন কাফেররা তাঁকে দেশান্তর করে দিয়েছিল, যখন দুইজনের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি, যেই সময় উভয়ে (মুহাম্মদ ও আবু বকর) গুহার মধ্যে ছিলেন, যখন তিনি স্বীয় সঙ্গীকে বলেছিলেন ঃ তুমি বিষণ্ন বা ভীত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা বর্ষণ করলেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করলেন এমন সেনাদল ফেরেশতা দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ কাফেরদের বাক্য ক্ষীণতম করেছিলেন; আর আল্লাহর বাণীই সমুচ্চ রইল; আর আল্লাহতায়ালা হচ্ছেন সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় (সূরা তাওবা ঃ ৪০)।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলন রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

যুক্তিসঙ্গত রাজনৈতিক ফিকাহ

প্রতিকূল আদর্শিক পরিস্থিতি

ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রাজনৈতিক অঙ্গনে, এমন প্রতিকূল আদর্শিক পরিস্থিতি বিরাজমান যা কোনো সতর্ক পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না।

আদর্শের ক্ষেত্রে এমন সব অকল্যাণকর চিন্তাধারা বিদ্যমান যা এখনো ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও লেখক গোষ্ঠী এবং দাওয়াতি অথবা শিক্ষা কার্যক্রমের জন্যে লিখিত বই পুস্তকসহ রাজনৈতিক চিন্তাপ্রবাহে কোনো না কোনোভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। আন্দোলনকে এ চিন্তাধারার প্রভাব মুক্ত হয়ে কল্যাণকর আদর্শের আলোকে সামগ্রিকভাবে জনগণ, জীবন ও জগত নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে।

জাহিরী ভাবাদর্শ মূল গ্রন্থের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয়ে যায়, এর বাইরে তারা শরীয়াহর প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে চর্চা করে না। ফলে মানুষের স্বার্থের প্রতি তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। বিশিষ্ট আলেমগণ গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের কল্যাণ সাধনই শরীয়াহর লক্ষ্য। ইমাম ইবনুল কাইয়েমের ভাষায় ঃ কোনো বিধিবিধান যদি অশুভের পক্ষে শুভকে পরিত্যাগ করে, বিচক্ষণতা পরিহার করে নির্বুদ্ধিতাকে প্রশ্রয় দেয়, তবে শরীয়াহর সাথে কোনোই সম্পর্ক থাকে না। এমনকি ভুল ধারণাবশত এগুলোকে শরীয়াহর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হলেও।

এরূপ আদর্শ ব্যক্তি বিশেষের জন্যে প্রযোজ্য কোনো রসম-রেওয়াজ বা বিধানের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু এ পদ্ধতি কখনোই শরীয়াহভিত্তিক রাজনীতির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা শরীয়াহভিত্তিক রাজনীতির ভিত হওয়া উচিত নমনীয়তা, সহিষ্ণুতা এবং স্থান কাল পাত্র ও মানুষের পরিবর্তনকে বিবেচনায় রাখা।

খারেজী ভাবাদর্শের প্রবক্তারা সততা ও সাহসিকতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মনে হলেও তারা সঙ্কীর্ণমনা এবং দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অদূরদর্শী। এছাড়া অন্যের সঙ্গে আচার আচরণে তারা সহিংস এবং সব সময় সকলকে এমনকি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে প্রত্যাখ্যান, অভিযুক্তকরণ ও সন্দেহ করার বাতিকগ্রস্ত। তারা কেবল নিজেদের মতামতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর এ আত্মপ্রসাদ অত্যন্ত বিপজ্জনক।

এরপর রয়েছে তাকলিদী ভাবাদর্শ যা অন্ধঅনুকরণের নামান্তর। এ পদ্ধতির অনুসারীরা তাদের আদর্শিক, রাজনৈতিক ও আইনগত প্রশ্নের উত্তর খোঁজে নিজ নিজ মাজহাবের পূর্ববর্তী ইমাম ফকিহদের রচিত বই পুস্তকের মধ্যে। তারা কখনো নিজস্ব গণ্ডীর বাইরে যেতে চায় না। মাজহাবের অনুসরণকারীরা শরীয়াহকে প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখে না।

তারা নিজ নিজ তরিকা ও পদ্ধতির আলোকে যেমন বিচার বিবেচনা করে তেমনি বর্তমান যুগ, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং উদ্ভূত সমস্যাদি সমাধানেও তাদের আগ্রহ নেই। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আল্লাহতায়ালা যা প্রশস্ত করেছেন তাকে সঙ্কীর্ণ এবং ইসলাম যা সহজসাধ্য করেছে তাকে দুঃসাধ্য করে ফেলে।

ইসলামী আন্দোলন এসব অস্বাভাবিক ভাবাদর্শ এবং এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে তার অনুসারীদের মুক্ত করতে না পারলে এবং অনুমোদিত আমলের ফিকাহ বা ফিকহ উস সুনান, শরীয়াহর উদ্দেশ্য সংক্রান্ত ফিকাহ, ভারসাম্যের ফিকাহ এবং অগ্রাধিকারের ফিকাহ সমন্বিত যে নতুন ধারার ফিকাহর ওপর আমরা দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করতে চাই সেই ফিকাহর লালন পালন ও চর্চা না হলে ইসলামী আন্দোলন একটি যুক্তিসঙ্গত রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে তুলতে পারবে না।

রাজনৈতিক ফিকাহর অসম্পূর্ণতা

ইসলামী আন্দোলনের ত্রুটিপূর্ণ, অস্বাভাবিক ধ্যানধারণা ও সিদ্ধান্তসমূহ এবং অস্বাভাবিক বিয়োজন পদ্ধতির সংশোধন করা দরকার।

রাজনৈতিক ফিকাহর ক্ষেত্রে এসব অদ্ভুত ধারণা, নিয়মকানুন ও পদ্ধতি বহুলাংশে সুস্পষ্ট। অতীতে ইবাদত, লেনদেন, বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তা এতো গুরুত্ব পায়নি।

আজকের রাজনৈতিক ফিকাহতে নানারকম ভ্রান্ত ধারণা ও দুর্বল সিদ্ধান্ত অনুপ্রবেশ করেছে। ইসলামপন্থীদের মন মানসিকতায় এগুলো এমন ভিন্ন ভিন্নভাবে শেকড় গেড়েছে যে কেউ যখন কোনো বিধি প্রয়োগ করেন তখন তা অন্যের বিধি বিধানের সাথে পূর্ব ও পশ্চিমের মতো ব্যবধান সৃষ্টি করে।

কেউ কেউ পরামর্শ বা শূরাকে বাধ্যতামূলক কর্তব্য নয়, নিছক তথ্য আদান প্রদানমূলক ব্যাপার বলে মনে করেন। আবার অন্যরা জাতির প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ ছাড়াই রাষ্ট্রপ্রধানকে যুদ্ধ ঘোষণা এবং চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা অর্পণ করেন। আবার আরেক গ্রুপ গণতন্ত্রকে একটি কুফরী মতবাদ বলে মনে করেন।

আবার এমন লোকও আছে যারা বিশ্বাস করে ইসলামী রাজনীতিতে নারীদের কোনো স্থান নেই এবং তাদের একমাত্র স্থান হচ্ছে পিত্রালয়। সেখান থেকে তারা দু'টি গন্তব্যে যেতে পারে–স্বামীগৃহে অথবা কবরে। এ গোষ্ঠীর মতে, স্থানীয় সরকার অথবা পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, নির্বাচনেও নারীর ভোটদানের অধিকার নেই।

আরো এক শ্রেণীর লোক আছে যারা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ইসলাম নাকচ করে দিয়েছে বলে মনে করে। তাদের বিশ্বাস, মুসলিম রাষ্ট্রে কোনোরকম রাজনৈতিক মত ও পথের অনুসারী দল বা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

কয়েকজন দ্বীনি ভাই আমাকে জনৈক উৎসাহী লেখকের 'এন্টারিং পার্লামেন্ট ইজ এগেইনস্ট তাওহীদ' শিরোনামে রচিত নিবন্ধটি দেখালে আমি হতবাক হয়ে যাই। কেননা

এ নিবন্ধে পার্লামেন্টের সদস্য হওয়াকে তাওহীদ বিরোধী বলা হয়েছে। আমি এতে আমল ও আকিদার মধ্যে অদ্ভুত বিভ্রাট লক্ষ্য করলাম। আমলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে ন্যায় ও অন্যায়, বিশ্বাস অবিশ্বাস নয়। এসব শরীয়াহ রাজনীতির অংশ যেখানে ইজতিহাদের পুরস্কার সঠিক হলে দ্বিগুণ এবং ভুল হলেও একটি সওয়াব নির্ধারণ করা হয়েছে।

রাজনীতি সংক্রান্ত একটি পার্থিব বিষয়কে কেন্দ্র করে সে যুগের খারিজীরাও ইমাম আলী (রা.)-কে অবিশ্বাসী বলে ফতোয়া দিয়ে একই ভুল করেছিল। যে বিষয়টিকে তারা মূল ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গীভূত করেছিল সেটি হচ্ছে ঃ তিনি আল্লাহর দ্বীনের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছেন, কিন্তু আল্লাহ ছাড়া কারো ফায়সালার অধিকার নেই। ইমাম অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তাদের অভিযোগের জবাব দিয়ে বলেছিলেন ঃ ভুলকে প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি সঠিক বাণীর আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক ফিকাহর প্রয়োগ

আফগানিস্তানের আলেমগণ বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে জিহাদে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু আমি অবাক হয়েছি তাদের মধ্যে কেউ কেউ নারী শিক্ষাকে হারাম মনে করেন এবং একইভাবে জনপ্রতিনিধি অথবা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে নির্বাচনকে একটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহারের প্রশ্নেও একই মত পোষণ করেন। প্রেসিডেন্টের মেয়াদ নির্ধারণ এবং শূরা বাধ্যতামূলক হওয়ার বিষয়টিকেও তারা হারাম বলে বিশ্বাস করেন।

কতিপয় দ্বীনি ভাই যারা এসব চিন্তায় বিশ্বাস করেন তারা এসব বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করার সময় বললেন, আজকের যুগে ইসলামী আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে এমন ধ্যানধারণায় বিশ্বাস করা হয় যেটাকে তারা অনৈসলামী বলে মনে করেন এবং আমরা মুসলমানরা সফল হতে পারব না যতক্ষণ না ইসলামের লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী কৌশল ব্যবহার করা হয়।

আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ মুসলমানরা যদি তাদের স্বার্থেই প্রেসিডেন্টের কার্যকালের মেয়াদ নির্ধারণ করে দেয় তাহলে হারাম হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে?

তারা জবাব দিলেন ঃ এটি প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর সময় থেকে চলে আসা মুসলিম প্রথার বরখেলাপ। কোনো খলিফাই নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে নির্বাচিত হননি। বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীন আজীবন শাসন ক্ষমতায় বহাল ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতিটি রীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্যে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সা.) নব-উদ্ভাবিত বিষয় বা বিদআত সম্পর্কে আমাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন ঃ দ্বীনে প্রতিটি নব উদ্ভাবন বা বিদআত হচ্ছে সরল পথ থেকে বিচ্যুতি। আর এটি মানুষের উদ্ভাবিত একটি নতুন বিষয় (আবু দাউদ ও তিরমিজি)।

এর জবাবে আমি বললাম, আমাদেরকে খোলাফায়ে রাশেদীনের রীতি অনুসরণের আগে রাসূলের (সা.) সুন্নাহ অনুসরণের আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা সুন্নাহ ইসলামী আইনের

দ্বিতীয় উৎস বিধায় যে কোনো বিষয়ে মতভেদ হলে কোরআনের পাশাপাশি সুন্নাহরও শরণাপন্ন হতে হবে। আল ইরবাদ বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে ঃ আমার সুন্নাহ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের রীতি অনুসরণ করো। সুতরাং পয়লা আপনাকে রাসূলের (সা.) সুন্নাহর আশ্রয় নিতে হবে।

সকলেই জানেন রাসূলের (সা.) সুন্নাহ হচ্ছে তাঁর কথা, কাজ অথবা কোনো কাজের প্রতি তাঁর সম্মতি। তাঁর কাজ কোনো ক্ষেত্র বিশেষে বাধ্যতামূলক নাও হতে পারে বরং কেবলমাত্র সম্মতি বা অনুমোদনের ইঙ্গিত দেয় যদি না এর সাথে এমন সাক্ষ্য প্রমাণ থাকে যাতে তার সম্মতি বাধ্যবাধকতার পর্যায়ে পড়ে।

এ কারণে খোলাফায়ে রাশেদীন যখন দেখেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যে উদ্দেশ্যে একটি কাজ করেছেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ কাজ বা পদক্ষেপ মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূল হবে না তখন তারা রাসূলের (সা.) সে কাজের বিপরীতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এর একটি উদাহরণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.) খায়বর বিজয়ের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। কিন্তু ওমর (রা.) ইরাকের পল্লী অঞ্চল জয়ের পর তা করেননি। কারণ সে সময়ের প্রেক্ষিতে তা করা তিনি সমীচীন মনে করেননি। রাসূলের (সা.) অনেক সাহাবি ওমরের এ মতের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করেন, বিশেষ করে এ কারণে যে তাঁর সিদ্ধান্ত আক্ষরিক অর্থে সূরা আন্‌ফালের ৪১ নং আয়াতে বর্ণিত সাধারণ বিধিমালার পরিপন্থী ছিল। এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আর জেনে রাখো যুদ্ধলব্ধ যা কিছু গণিমতস্বরূপ তোমাদের হস্তগত হয় তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্যে।

ওমর (রা.) এ বলে মন্তব্য করেন ঃ আমি সম্পদকে বর্তমান ও ভবিষ্যতে মানুষের জন্যে যথেষ্ট মনে করছি। আপনারা কি চান আগামী প্রজন্ম এমন অবস্থায় পড়ুক যে তাদের জন্যে কিছুই রাখা হয়নি?

এর অর্থ, ওমর (রা.) আগামী প্রজন্মের কথা ভেবেই উপরোক্ত বিবেচনা করেছেন যা মুসলিম উম্মাহর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার লক্ষ্যে এক চমকপ্রদ পদক্ষেপ। যেন আগামী প্রজন্মের স্বার্থ উপেক্ষা করে কেবল বর্তমান প্রজন্ম বিলাসী জীবনযাপন করতে না পারে। হযরত ওমরের এ পদক্ষেপ নেয়ার পেছনে যুক্তির ভিত্তি ছিল সূরা আল হাশরের ১০ নং আয়াত। যেখানে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে গণিমতের মাল বণ্টনের বিধান উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ আর যারা তাদের পরে এসেছে। ইমাম ইবনে কুদামা রাসূলুল্লাহর (সা.) এবং ওমরের পদক্ষেপের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ উভয়ে সেটাই করেছেন যা তাদের সময়ের জন্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কোনো কোনো কাজ সুন্নাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীদের জন্য তা বাধ্যতামূলক নয়। তাঁর সাহাবিরা কখনো কখনো কোনো কোনো বিষয় বিবেচনায় রেখে এর বিপরীত কাজ করেছেন। তাহলে পরবর্তী মুসলমানদের পদক্ষেপ কেন তাদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে যারা তাদেরও পরে আসবে?

কোনো দৃষ্টান্ত আইনগত বাধ্যবাধকতার যথার্থ কারণ হতে পারে না। দৃষ্টান্ত কেবল সংশ্লিষ্ট স্থান, কাল ও পরিস্থিতির জন্য পর্যাপ্ত। এসব উপাদান যদি পরিবর্তিত হয় তবে তার ভিত্তিতেই পদক্ষেপ নিতে হবে।

এখানে মূল বিষয় হচ্ছে, আমাদের আগের যে সব ব্যবস্থা ও বিধান রয়েছে সেগুলোর মধ্যে আমাদের সময়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির জন্য উপযোগী ব্যবস্থা মূল গ্রন্থ ও আমাদের উদার শরীয়াহর লক্ষ্যের আওতার মধ্য থেকেই বেছে নিতে হবে।

শাসকদের কার্যকালের মেয়াদ সীমিতকরণের বিরুদ্ধে মুসলিম পণ্ডিতদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে যে বিতর্ক, তা বেশ বিভ্রান্তিকর বিষয়। একজন শাসক আজীবন রাজত্ব করতে পারেন বলে যে ঐকমত্য রয়েছে তা নিয়ে বিতর্কের প্রশ্ন নেই। তবে কার্যকালের মেয়াদ সীমিতকরণের বিষয়টি নিয়ে কখনো আলোচনা হয়নি বা গবেষণা করা হয়নি। এটি সম্পূর্ণ একটি নীরব বিষয় ছিল। বলা হয় নিশ্চুপ মানুষ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা উচিত নয়। তেমনি যে বিষয়ে স্কলারদের সিদ্ধান্ত নেতিবাচক বা ইতিবাচক কোনোটিই নয় সেটাতেও তাদেরকে জড়ানো উচিত নয়।

অন্যদিকে বলা হয় রাষ্ট্র প্রধানের মেয়াদ নির্ধারণ ইসলামে একটি নব উদ্ভাবিত বিষয় বা বিদআত এবং এ ব্যাপারে সর্বসম্মত রায় হচ্ছে প্রতিটি বিদআতই বিচ্যুতি। আমরা এ বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ স্বীকার করি অর্থাৎ প্রতিটি বিদআত মানে বিচ্যুতি–কিন্তু বক্তব্যের প্রথম অংশ অর্থাৎ এ ধরনের সিদ্ধান্ত শরীয়াহর দৃষ্টিতে বিদআতের পর্যায়ে পড়ে এর কোনো প্রমাণ নেই।

কোনো নতুন জিনিস বা আবিষ্কারের বিরুদ্ধে ইসলাম বিদআত নামে অবস্থান গ্রহণ করে থাকে এরূপ ধারণা করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে কোনো নির্ভেজাল দ্বীনি বিষয়ে কিছু উদ্ভাবনই কেবল বিদআত হতে পারে। যেমন ঈমান, ইবাদত ও এগুলোর শাখা প্রশাখা। কিন্তু জীবনের পরিবর্তনশীল বিষয়গুলো যেমন রীতি, ঐতিহ্য, প্রথা, প্রশাসনিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতি এগুলো আলেমদের ভাষায় 'জনগণের' আওতায় পড়ে, যার ব্যাখ্যা আমরা পাই ইমাম আল শাতিবীর 'আল-ইতিসাম' গ্রন্থে। একারণেই রাসূলের (সা.) সাহাবিরা অনেক কিছু করেছেন যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) করেননি। যেমন আল–কোরআনের অনুলিপি লিখন, রেজিস্টার খাতাপত্র ব্যবহার, ভূমি কর আরোপ ও জেলখানা নির্মাণ।

রাসূলের (সা.) সাহাবিদের পরবর্তী মুসলমান তাবেঈনরা তাদের সময়ে এমন কিছু করেছেন যা তাদের পূর্ববর্তী সাহাবিরা করেননি। যেমন মুদ্রা তৈরি, ডাক সার্ভিস প্রবর্তন ইত্যাদি।

মুসলমানরা আরো অনেক কিছু উদ্ভাবন করেছেন যা রাসূলুল্লাহ (সা.) বা তাঁর সাহাবিদের জামানায় শোনাও যায়নি। যেমন ধর্ম বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব ও মানবিক বিজ্ঞানের মতো বিজ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখার উদ্ভাবন।

সীরাতের ভুল প্রয়োগ

রাজনৈতিক ফিকাহর ক্ষেত্রে ভ্রান্তি ও ভুল সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ হচ্ছে রাসূলের (সা.) সুন্নাহ এবং সীরাত বিষয়ক বিভ্রাট। ইসলামে পবিত্র কোরআন ছাড়াও সুন্নাহ হচ্ছে আইনের একটি উৎস। আল–কোরআন হচ্ছে আইনের ভিত্তি ও মূল এবং সুন্নাহ হচ্ছে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ।

তবে কেউ কেউ সুন্নাহর স্থলে সীরাতকে স্থান দিয়ে ভুল করে থাকেন এবং সীরাতের ঘটনাবলী এমনভাবে উল্লেখ করেন যেন এগুলো কোরআন ও সুন্নাহর মতোই বাধ্যতামূলক।

সীরাত সুন্নাহর সমার্থবোধক নয়। কারণ সীরাতে এমন বিস্তারিত বিষয় থাকে আইনের ক্ষেত্রে যেগুলোর আদৌ কিছু করার নেই। এ জন্য ফকিহগণ সুন্নাহর সংজ্ঞার সাথে সীরাতকে জড়িয়ে ফেলেননি। তারা শুধু এটুকুই বলেছেন ঃ সুন্নাহ হচ্ছে তাই যা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, করেছেন বা সম্মতি দিয়েছেন। তারা এখানে সীরাতকে অন্তর্ভুক্ত করেননি।

কিন্তু মুহাদ্দিসগণ রাসূলের (সা.) কাজ, কথা ও সম্মতির সঙ্গে তিনি দেখতে কেমন ছিলেন, তাঁর আচার ব্যবহার কেমন ছিল এবং তাঁর জীবন পদ্ধতি কি রকম ছিল এসবের বিবরণ সংযোজন করেছেন। আইন কানুনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিনা সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করে তারা সাধারণত রাসূলুল্লাহ (সা.) সংক্রান্ত খুঁটিনাটি সব বিষয় সংগ্রহ করেন। রাসূলের (সা.) জীবনের সব কিছু তথা তাঁর জন্ম, পরিচর্যা, লালন-পালন, বিবাহ, আচার আচরণ, শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং জন্ম মৃত্যু সংক্রান্ত অন্য সকল খুঁটিনাটি বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

এখানে আমাদের চিন্তার কারণ হচ্ছে, কোনো কোনো ইসলামী গ্রুপ কোনো সিদ্ধান্তের সমর্থনে সীরাতকে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য করে। তারা বিশ্বাস করে সকল মুসলমানের জন্য এটি বাধ্যতামূলক। এখানে আমি দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই।

প্রথমত, সীরাতের মধ্যে এমন সব ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা অকাট্য প্রমাণ ছাড়া এক বর্ণনাকারীর কাছ থেকে আরেক বর্ণনাকারী পর্যন্ত চলে এসেছে। কারণ এসব বর্ণনাকারী এমন হালকাভাবে সীরাতের বর্ণনা করেছেন যে শরীয়াহর বিধিবিধান এবং হালাল হারাম সম্পর্কিত বর্ণনা দিতে গিয়ে কোনো হাদিসের বরাত ব্যবহার করেননি।

দ্বিতীয়ত, সীরাত রাসূলের (সা.) জীবনযাত্রার ব্যবহারিক অংশের চিত্র। রাসূলের কোনো কর্মকাণ্ড বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না, তা কেবল সম্মতির আভাস দেয়। বাধ্যবাধকতা কার্যকর করতে আরেকটি প্রমাণ থাকা চাই।

এটি সত্য, আমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা আবশ্যক। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে তোমাদের অনুসরণের জন্য (সূরা আহ্‌জাব ঃ ২১)। নৈতিক আচার ব্যবহার,

মূল্যবোধ ও সাধারণ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আদর্শ অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক তবে খুঁটিনাটি বিষয়ে নয়।

যদি প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রচার সম্ভব হয় এবং অনুমোদিত হয় তবে রাসূলের (সা.) আদর্শ অনুকরণের জন্য গোপনে কাজ করার দরকার নেই। প্রয়োজন না হলে কেবল রাসূলের (সা.) দৃষ্টান্ত অনুসরণের জন্য দ্বীনের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে আমাদের আবাসভূমি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে হিজরত করার দরকার নেই।

এ কারণেই মক্কা বিজয়ের পর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মদিনায় হিজরত করা আর বাধ্যতামূলক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ জিহাদ ও জিহাদের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা ছাড়া মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই; যখন তোমাদের ডাকা হবে তখন যাওয়া উচিত (বুখারী ও মুসলিম)। এর অর্থ হচ্ছে মদিনায় আর হিজরত করতে হবে না। তবে মুসলমানরা যদি কোনো দেশে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয় তা হলে সেখান থেকে হিজরত করার অনুমতি রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) শক্তিশালী গোত্রদের কাছে সাহায্যের অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং আওস ও খাজরাজ গোত্র তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল। এখন আমাদের এরূপ করার আর দরকার নেই। কেননা এ যুগে আর এ পদ্ধতি যথেষ্ট নয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কায় দাওয়াতি কাজ তেরো বছর ধরে করেছিলেন বলেই আমাদের জন্যও তেরো বছর ধরে ঈমানের চর্চা এবং দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। কেননা এখন আমরা যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাস করি তারা বিশ্বাস করে ঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। সুতরাং আমাদের ঈমান-আকিদা শেখার জন্য এত দীর্ঘ সময়ের দরকার নেই।

আমরা যদি এখন সামাজিক সুবিচার, শূরা, স্বাধীনতা, ফিলিস্তিনী অভ্যুত্থান ও আফগান জিহাদের মত বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দেই তবে তা রাসূলের (সা.) দিক নির্দেশের পরিপন্থী কাজ হবে না। তিনি মদিনায় এ ধরনের কাজগুলো নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। কারণ হিজরতের পূর্বে মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন এক জাহেল ও মুশরেক সমাজে বাস করছিলেন যারা ঔদ্ধত্যের সঙ্গে দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করেছিল। সুতরাং সে সমাজের সঙ্গে তাঁর পয়লা লড়াই ছিল তাওহীদ ও দাওয়াতকে কেন্দ্র করে। আমাদের সমাজ অনুরূপ নয়। এ সমাজ আল্লাহ, তাঁর দ্বীন ও তাঁর রাসূলকে (সা.) বিশ্বাস করে যদিও সমাজে দোষ-ত্রুটি এবং আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুতি থাকতে পারে।

মুসলিম ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার

সূচনা কাল থেকেই ইসলামী আন্দোলন সকল মুসলিম ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার এবং মুক্তি ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করাকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছে। কোনো শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তা অস্বীকার করতে পারে না।

ইমাম হাসান আল বান্না তার এক বক্তৃতায় বলেছেন, আমাদের প্রচেষ্টা ও জিহাদ দু'টি প্রধান লক্ষ্যের ওপর কেন্দ্রীভূত– ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম ভূখণ্ড।

তিনি এ দু'টো লক্ষ্যকে সমন্বিত করেছিলেন এ কারণে যে আদর্শ কেবল একটি স্বাধীন ও মুক্ত ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যেখানে এর মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও আইনের বিধান বাস্তবায়ন করা যায়। এতেই নিহিত রয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র বা দারুল ইসলামের তাৎপর্য। এমনি ভূখণ্ডের মধ্যেই ইসলাম টিকে থাকে, এখান থেকেই এর কর্মকাণ্ড পরিচালিত এবং জাতিকে দিক নির্দেশনা দান করা হয়।

এ জন্যই ইসলামের ফকিহগণ বিধর্মীদের হাতে দখলীকৃত সকল মুসলিম ভূখণ্ড উদ্ধার ও রক্ষা করা কর্তব্য বলে একমত হয়েছেন এবং সেই ভূখণ্ডের মুসলমানদের জন্য জিহাদ ব্যক্তি হিসেবে যেমন বাধ্যতামূলক তেমনি সমষ্টিগতভাবে সকল মুসলমানকে আগ্রাসীদের হাত থেকে তাদের ভূখণ্ড মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এ জিহাদে জানমাল ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

সুতরাং মুসলিম ভূখণ্ডের একটি অংশও যদি বিদেশী আগ্রাসনকারীদের দখলে চলে যায় ইসলামী আন্দোলন তা নীরব দর্শকের মত দেখতে পারে না। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কায়রোতে ইখওয়ান সদর দফতর ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত আরব ও মুসলিম বিশ্বের সকল অংশে দখলদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদীন ও বিপ্লবীদেরও কর্মকেন্দ্র ছিল।

হাসান আল বান্না একবার একটি জাতীয় সম্মেলনে ইখওয়ানের জাতীয় দাবিদাওয়া পেশ করেন। তিনি মুসলিম আবাসভূমি গড়ে তোলার কথা বলেন। মিসর ও সুদান সমন্বয়ে একটি ক্ষুদ্র আবাসভূমি, আরব জাহানকে নিয়ে একটি বৃহৎ আবাসভূমি যার বিস্তৃতি হবে উপসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত এবং মুসলিম বিশ্বকে নিয়ে বৃহত্তর আবাসভূমি, যার সীমানা আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়া সব ধরনের বৈদেশিক প্রভাব থেকে বৃহত্তম মুসলিম আবাসভূমিকে মুক্ত করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ এবং ইখওয়ানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

হাসান আল বান্না ফিলিস্তিনকে অন্যতম প্রধান ইস্যু হিসেবে তালিকার শীর্ষে স্থান দেন। তিনি এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে মুসলিম জনতাকে নবী-রাসূল, ইসরা ও মিরাজের পবিত্র ভূমির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার এবং ইহুদী হুমকি সম্পর্কে সতর্ক থাকার তাগিদ দেন। কেননা ইহুদীরা এ ভূমিতে তাদের হিংস্র নখর বসানোর জন্য ওঁত পেতে আছে। আরব ও মুসলিম নেতৃবৃন্দ দু'টি কিবলার প্রথমটি আল আকসা মসজিদের বিরুদ্ধে যে চক্রান্তের জাল বোনা হচ্ছে সে সম্পর্কে বেখবর অথচ আল আকসায় আল্লাহর রহমত বিজড়িত।

হাসান আল বান্না ফিলিস্তিনী স্বার্থ সমুন্নত করার লক্ষ্যে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, বহু মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন, অনেক সভার আয়োজন করেছেন, অসংখ্য লোক রিক্রুট করেছেন, প্রচুর অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করেছেন। এ ব্যাপারে তার কৃতিত্ব এটি উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে তার আধ্যাত্মিক অনুসারী ও যোদ্ধারা ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে যে বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেছিলেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। যার সত্যতা মিসরীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল আল মাওয়াবীসহ অন্যান্য কমান্ডার এমন কি খোদ ইহুদীরাও স্বীকার করেছে। কামাল আল শরীফ বিরচিত 'আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন এন্ড দি প্যালেস্টিন ওয়ার' গ্রন্থে এ গৌরবময় জিহাদের অনেক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

ইসলামী আন্দোলন সকল মুসলিম জাতির প্রতিটি স্বার্থ রক্ষায় এবং সব বর্ণের সাম্রাজ্যবাদের মোকাবেলায় স্বীয় ভূমিকা পালন করেছে।

এ কারণেই ইসলামী আন্দোলন কমিউনিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পয়লা প্রতিরক্ষা ব্যূহের প্রতীক আফগানিস্তানের স্বার্থ রক্ষায় এগিয়ে এসেছে। এ স্বার্থ এতই গভীর যে অনেকে মনে করেছিলেন ইসলামী আন্দোলন বোধ হয় ফিলিস্তিনী স্বার্থের কথা ভুলেই গেছে। বস্তুত ইসলামী আন্দোলন কখনোই ফিলিস্তিনকে ভোলেনি এবং কখনো ভুলবে না। কেননা ফিলিস্তিন হচ্ছে প্রথম ও সর্বোচ্চ ইসলামী স্বার্থ, এর মুক্তি পয়লা ও সর্বোচ্চ কর্তব্য যা আফগান মুজাহিদরাও মনপ্রাণে বিশ্বাস করে।

এখন ফিলিস্তিনী লড়াইয়ে দরকার হচ্ছে একটি ইসলামী পতাকার যা এর চারপাশে লোকদের সমবেত এবং এক সত্তা হিসেবে ঐক্যবদ্ধ করবে। মসজিদসমূহে বিপ্লবের বিস্তার এবং গণঅভ্যুত্থান বা ইনতিফাদার মাধ্যমে এটিই ঘটেছে যার মূল শ্লোগান আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এবং আল্লাহ সর্বশক্তিমান (আল্লাহু আকবর)। অটল, সাহসী ও সজাগ ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস এ অভ্যুত্থানকে এক সংঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করেছে।

হামাস– মুসলিম ও আরবিয় আদি ঐতিহ্যে লালিত ফিলিস্তিনী জনগণের বিশ্বাসের এক প্রতীকী প্রতিষ্ঠান। এ জনগোষ্ঠী এখনো সতেজ। আল্লাহর সাহায্যে বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কখনো নির্জীব হবে না। পূতপবিত্র দেহমনের অধিকারী এ জনগোষ্ঠী জিহাদের ঝাণ্ডা এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আন্দোলনকে ইসলামী স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিটি কার্যক্রমের মূল ভূমিকায় থাকতে হবে। যেখান থেকেই ডাক আসুক না কেন, সাহায্যের প্রতিটি ডাকে সাড়া দিতে হবে। ইসলামী আন্দোলনকে ইরিত্রিয়ায় মার্ক্সবাদী খৃস্টান দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জিহাদে শামিল হতে হবে। সেখানকার জান্তা ইরিত্রিয়াকে গ্রাস করে দেশটিকে একটি উপনিবেশ হিসেবে কব্জা করে রাখতে চায়, জনগণকে সামন্তবাদী ব্যবস্থাধীনে দাস শ্রেণীতে পরিণত করতে চায়।

বিশ্বাসঘাতক খৃস্টান বর্ণবাদী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ইসলামী আন্দোলনকে সুদানের পাশে দাঁড়াতে হবে। খৃষ্টানরা সুদানের সকল ভূখণ্ডে তাদের বর্ণবাদী ধর্মান্ধতা চাপিয়ে দিয়ে দেশটিকে মুসলিম উম্মাহ ও আরব জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়।

ফিলিপাইনে পক্ষপাতদুষ্ট খৃস্টান শাসকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সমর্থন দিতে হবে। কেননা খৃস্টান জান্তা সেখানে মুসলমানদের নির্মূল করে যারা কেবল দাসত্বের জীবন মেনে নেবে তাদেরকেই সেখানে ঠাঁই দিতে চায়। যারা না নিজেদের কোনো কল্যাণে আসবে, না অন্যদের।

কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ অথবা স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত কাশ্মীরী মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের লড়াইয়ে সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে। যাতে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদীদের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেয়া যায়। পাকিস্তান ও সামগ্রিকভাবে মুসলিম জগতের বিরুদ্ধে কাশ্মীরকে একটি চক্রান্তের ঘাঁটি বানানোর জন্য ভারত সাম্রাজ্যবাদ ধর্মহীন শিক্ষা, পাপাচার ও মাদকাসক্তি ছড়িয়ে দিয়ে এ অঞ্চলের মুসলিম পরিচিতি মুছে ফেলার অপচেষ্টায় লিপ্ত।

সোমালিয়ার স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে ইসলামী আন্দোলনের সমর্থন দেয়া উচিত। দেশটির স্বৈরাচারী জান্তা মুসলিম পণ্ডিতদের হত্যা করছে এবং ধর্মীয় অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক চরিত্রের অধিকারী যে কোনো ব্যক্তির ওপর জুলুম নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে।

এসব মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে ইসলামী আন্দোলনের হাতে সঠিক তথ্য থাকতে হবে। এসব মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক কাঠামোতে ইসলামী আন্দোলনের কোনো না কোনো পর্যায়ে উপস্থিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে দূরত্ব দূর করে ঐক্যের জন্য অবশ্যই নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ এবং বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে ছোটখাট মতানৈক্য দূর করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। জিহাদ ক্ষতিগ্রস্ত করার মত সবচেয়ে মারাত্মক উপসর্গ হচ্ছে গ্রুপগুলোর মধ্যেকার অনৈক্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁর রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে, যেন তারা এক নিরেট গাঁথুনির কাঠামো (সূরা সা'ফ ঃ ৪)।

ফিলিস্তিনী স্বার্থের জন্য বিশ্বের মুসলমানদের সংগঠিত করার দায়িত্বও ইসলামী আন্দোলনকে নিতে হবে। কেননা ইহুদীবাদী আন্দোলন ইসরাইলের স্বার্থে বিশ্বের

ইহুদীদের সংগঠিত করেছে। আমাদের ন্যায্য স্বার্থের পক্ষে সারা বিশ্বের বিবেকসম্পন্ন লোকদের সমর্থন আদায়ে ইসলামী আন্দোলনকে তৎপর হতে হবে।

বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম থেকে এরূপ প্রচেষ্টা চালানো নেহাত জরুরী। কারণ ফিলিস্তিনী সংগ্রাম এখন গুরুতর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ফিলিস্তিনী স্বার্থ পদদলিত করে অধিকৃত অঞ্চলে সোভিয়েত ইহুদীদেরকে এনে বসতি স্থাপনের চক্রান্ত করা হয়েছে। যে চক্রান্তের লক্ষ্য হচ্ছে বৃহত্তর ইসরাইলের স্বপ্ন বাস্তবায়ন, যার সীমানা বিস্তৃত হবে নীল নদ থেকে ফোরাত, অতঃপর তাদের খায়েশ হচ্ছে হেজাজ, মদিনা ও খায়বর পর্যন্ত সম্প্রসারণ।

মুক্তি আন্দোলন

ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টি কেবল মুসলিম ভূখণ্ডের দিকে কেন্দ্রীভূত থাকলেই চলবে না। অবশ্যই ইসলামের নীতি অনুসারে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সংহতির স্বার্থে মুসলিম ভূখণ্ড বিশেষ গুরুত্ব পেতে পারে। কিন্তু মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সারা বিশ্বে যারাই ভূমি দখলদারিত্ব, সাম্রাজ্যবাদ, অত্যাচার অবিচার থেকে মুক্তির জন্য লড়াই করছে তাদের প্রতি ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে।

ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে মানুষের মুক্তির সর্বব্যাপী আবেদন নিয়ে। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়ে তাকে সম্মানিত করেছেন এবং এ কারণে আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু তার আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন।

যে কোনো খোদাদ্রোহী তাগুত শক্তির দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করার এবং তাগুতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে তাকে যথোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ইসলামের আগমন।

হযরত মূসা (আ.) এর দাওয়াতের মূল কথা ছিল ফেরাউন, কারুন ও হামানের উৎপীড়ন থেকে বনি ইসরাইলকে মুক্ত করা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল সকল ফেরাউন, কারুন ও হামানের কবল থেকে সমগ্র মানব জাতিকে মুক্তি দেয়া যারা মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে অতি ক্ষমতাধর শাসক হিসেবে চেপে বসে যার কোনো অধিকার তাদের নেই। এসব শাসক আল্লাহর বান্দাদের প্রতি এমন উন্নাসিক আচরণ করে যেন তারা আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অংশীদার। নিজেদেরকে খোদা হিসেবে জাহির করে ও মানুষকে তাদের দাসে পরিণত করে।

রাসূলের (সা.) এর মাধ্যমে শাসক ও রাজন্যবর্গকে আহ্বান জানিয়ে আল-কোরআন সুস্পষ্ট ও সুউচ্চ কণ্ঠে স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করেছে ঃ আস একটি কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সঠিক, আমরা আল্লাহ ব্যতিত আর কারো ইবাদত করব না এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করব না এবং আমাদের মধ্যে থেকে কেউ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে প্রভূ বলে মেনে নেব না (সূরা আল ইমরান ঃ ৬৪)।

রাবি ইবনে আমির পারস্য সেনাবাহিনীর কমান্ডার রুস্তমের সামনে ঘোষণা দিয়ে বলেছেনঃ আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে ও কেবল তাঁরই বন্দেগীর জন্য এবং নানা ধর্মের অবিচার অনাচার থেকে ইসলামের সুবিচারের দিকে মানুষকে ফিরিয়ে আনার জন্য।

সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা পৃথিবীতে কেবল সুবিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়েই তাঁর কিতাব ও রাসূল পাঠিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ নিশ্চয়ই আমি আমার **রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী** দিয়ে প্রেরণ করেছি এবং আমি তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি **কিতাব** ও মানদণ্ড যেন মানুষ ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে (সূরা হাদীদ ঃ ২৫)।

অতএব ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির, গ্রুপের বিরুদ্ধে গ্রুপের অথবা জনগণের বিরুদ্ধে **জনগণের** যে কোনো অত্যাচার অবিচার বিশেষ করে দুর্বল ও নিপীড়িত মানুষের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী ও শক্তিধর মানুষের অত্যাচার অবিচার মূলত সকল ঐশী বাণীরই লঙ্ঘন। এ কারণেই আল-কোরআনে স্বৈরাচারীদের তীব্র সমালোচনা করে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে ঃ কিন্তু তারা (রাসূলগণ) বিজয় ও সাহায্য কামনা করতে লাগল এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী স্বৈরশাসক সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও ধ্বংস হলো। তার (প্রত্যেক অবাধ্য ও হঠকারী স্বৈরশাসকের) সামনে দোযখ রয়েছে এবং তাকে পুঁজ ও রক্তযুক্ত ফুটন্ত পানি পান করানো হবে (সূরা ইব্রাহীম ঃ ১৫-১৬)।

এমনিভাবে আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক অহঙ্কারী স্বৈরাচারীর অন্তরের ওপর মোহর মেরে দেন (সূরা মু'মিন ঃ ৩৫)।

অতএব দোযখের দ্বারসমূহে প্রবেশ করো, তাতে অনন্তকাল থাক; বস্তুত অহঙ্কারীদের আবাস কতই না নিকৃষ্ট (সূরা নাহ্‌ল ঃ ২৯)।

আল-কোরআনের মক্কী ও মাদানী সূরাগুলোতে অনিষ্টকারীদের কঠোর নিন্দা করা হয়েছেঃ নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা সে সমস্ত লোককে পথ দেখান না যারা জালেম (সূরা মায়েদা ঃ ৫১)।

নিশ্চয়ই যারা জালেম তারা কখনো কোনো সাফল্য লাভ করবে না (সূরা ইউসুফ ঃ ২৩)।

এবং এসব জনপদ আমরা ধ্বংস করলাম যখন তারা জুলুম করল (আল কাহ্‌ফ ঃ ৫৯)।

এগুলোই তাদের বাড়িঘর, যা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে আছে তদের জুলুমের জন্য (সূরা আন নাম্‌ল ঃ ৫২)।

আর আপনার রবের পাকড়াও এরূপই হয়ে থাকে, তিনি তখন পাকড়াও করেন জনপদের অধিবাসীদেরকে যখন তারা জুলুম করে, নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক ও অত্যন্ত কঠিন (সূরা হূদ ঃ ১০২)।

অতঃপর যালেমদের শিকড় কেটে ফেলা হলো। আর আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা ও শোকর যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক (সূরা আন'আম ঃ ৪৫)।

আর যারা জুলুম করে তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়বে না, যাতে না আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করে। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো রক্ষাকারী নেই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না। (সূরা হূদ ঃ ১১৩)।

ইসলাম জুলুম অবিচারকে কঠোরভাবে অবৈধ ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়নি, সকল পন্থায় এর বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ জারি করেছে। আর যারা অবিচারের মূলোৎপাটনে কিছুই করবে না তাদেরকে পৃথিবীতে পাপাচারীদের শরিক বলে সাব্যস্ত করা হবে এবং পরকালেও তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

এমন কি যে জাতি নির্দ্বিধায় অবাধে অন্যায় অপকর্ম চালিয়ে যায়, কেউ তাদের কুকীর্তির প্রতিবাদ প্রতিরোধ করে না ইসলাম সেই জাতিগোষ্ঠীকে ঐশী দণ্ডের যোগ্য বলে বিবেচনা করে এবং তাদের ধ্বংস অনিবার্য। আর এরূপ জাতির ওপর যখন আল্লাহর আজাব নাজিল হয় তখন কেউই এ থেকে পরিত্রাণ পাবে না। পাপীরা তাদের পাপের জন্য আর নীরব দর্শকরা তাদের নীরবতার জন্য শাস্তির আওতায় পড়বে। আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ আর সেই ফিতনাকে ভয় কর, যা কেবল জালেমদের ওপরেই পতিত হবে না, আর একথা জেনে রাখো যে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা (সূরা আল আন্‌ফাল ঃ ২৫)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মানুষ যদি অন্যায়কারীকে অন্যায় করতে দেখে অথচ তাকে বাধা না দেয়, তাহলে তারা আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তির নিকটবর্তী হয়ে যায়, সেই শাস্তি আসে তাদের সকলের ওপরে (আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান ও সহীহ্ আল জামি আল সগীর)। অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ঃ যখন আমার উম্মতকে দেখবে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং কোনো অন্যায়কারীকে বলে না তুমি অন্যায় করছ, তাহলে তুমি তাদের আশা ছেড়ে দিতে পার (আল হাকিম)।

সকল পাপাচারী উল্লিখিত ঘোষণার আওতার মধ্যে পড়ে। তাদের অন্যায় অবিচার মুসলমানদের বিরুদ্ধেই হোক বা অন্যদের বিরুদ্ধে, কারণ সকল অন্যায় অপকর্মই পাপ।

এতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, ইসলাম অন্যায়কারীদের প্রতিরোধ এবং উৎপীড়িত ও দুর্বলদের রক্ষায় সকল ইতিবাচক পদক্ষেপকে উৎসাহিত করে। এমনকি প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষাকে ইবাদত এবং আল্লাহর পথে জিহাদ বলে গণ্য করে। পবিত্র কোরআনে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং উৎপীড়িতদের রক্ষার তাগিদ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ আর তোমাদের কি হলো যে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না এবং ঐ সব দুর্বল নির্যাতিত ও অত্যাচারিত পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য যারা প্রার্থনা করছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ জনপদ থেকে উদ্ধার করুন যার অধিবাসীরা অত্যাচারী, আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কোনো অভিভাবক দাঁড় করিয়ে দিন যিনি রক্ষা করবেন এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কাউকে পাঠান যিনি সাহায্য করবেন। (সূরা আন নিসাঃ ৭৫)।

এখানে মূলত দুর্বল শ্রেণী বলতে বিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ এসেছে। তাই এ আয়াতে তাদের দোয়ার কথাই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু ইসলাম কারো বিরুদ্ধে অন্যায় অবিচার সমর্থন করে না যদিও সে কাফের হয়। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ঃ মজলুমের আর্জি অনুযোগের

ব্যাপারে সাবধান হও যদিও সে কাফের হয়। কারণ তাদের আর্জি আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর পথে কোনো বাধা নেই (আহমাদ ও সহীহ্ আল জামি আল সগীর)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার আবিসিনিয়ার এক ক্ষমতাধর নিষ্ঠুর ব্যক্তির হাতে এক দুর্বল মহিলার ওপর উৎপীড়নের কাহিনী শুনে মন্তব্য করেছিলেন ঃ আল্লাহতায়ালা সেই জাতিকে কিভাবে পবিত্র বলে গণ্য করবেন যেখানে শক্তিধরদের হাত থেকে দুর্বলদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয় না (ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান ও সহীহ্ আল জামি আল সগীর)। উল্লেখ্য, সে সময় আবিসিনিয়ায় খৃস্টান রাজত্ব ছিল।

বাস্তবিকই ইসলামের বিজয় অভিযানের লক্ষ্য ছিল স্বৈরাচারীদের জুলুম, নিপীড়কদের নিপীড়ন থেকে নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষকে উদ্ধার এবং এ জনগোষ্ঠীকে পারস্য ও রোমান সম্রাটদের আধিপত্য থেকে মুক্ত করা। এ কারণেই এসব মানুষ ইসলামকে স্বাগত জানিয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে যারা ঈমান ও নৈতিক সাহসের অধিকারী তাদের কর্তব্য হচ্ছে দুর্বলের ওপর নিপীড়ন প্রতিরোধে পরস্পরকে উৎসাহিত করা এবং উৎপীড়কের কাছ থেকে পূর্ণরূপে দুর্বলের অধিকার ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত তাকে সাহায্য করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে এমনি এক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। তিনি আইয়্যামে জাহেলিয়াতে কিশোর বয়সে এমনি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিলফুল ফুজুলের মাধ্যমে। একদল সৎ, কল্যাণকামী ও নিষ্ঠাবান মানুষকে নিয়ে এ সংস্থা গঠিত হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের পাশে দাঁড়ানো যেন দুর্বলের অধিকার ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

নিরীহ নির্বাক প্রাণীর স্বার্থরক্ষায় যেখানে ইসলাম সোচ্চার, সেখানে নিপীড়িত, নির্যাতিত ও অত্যাচারিত মানুষের অধিকার আদায়ে সে কেন তাদের পাশে দাঁড়াবে না?

মুসলিম সংখ্যালঘু

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা মুসলিম সংখ্যালঘুদের স্বার্থের প্রতি ইসলামী আন্দোলনকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে নিম্নোক্ত বিষয়সহ কয়েকটি উপাদান বিবেচনা করতে হবে ঃ

১. সারা বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ বা আরো বেশি হচ্ছে সংখ্যালঘু। প্রায় সাতাশ বছর আগে রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষায় এ তথ্য পাওয়া গেছে।

২. এ মুসলিম সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিপুল সংখ্যা নিয়ে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সম্প্রদায় হচ্ছে ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘুরা। প্রায় বিশ কোটির বেশি মুসলমান ভারতে বসবাস করে। ভারতীয় উপমহাদেশ এবং সাধারণভাবে ইসলামী সংস্কৃতির ওপর এ মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও কৃষ্টিগত প্রভাব পড়েছে।

৩. কয়েকটি তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রকৃত মুসলিম দেশেরই জনগণ। এসব দেশকে শক্তি প্রয়োগ করে কোনো কোনো পার্শ্ববর্তী বড় দেশের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে মুসলিম সম্প্রদায় তাদের মধ্যে বিলীন হয়ে বৃহত্তর সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিপীড়িত সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। এসবের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলিম প্রজাতন্ত্র উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজান। সমীক্ষা চালিয়ে প্রমাণিত হয়েছে এসব দেশ মুসলিম বিশ্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৪. কোনো কোনো মুসলিম সম্প্রদায়কে পক্ষপাতদুষ্ট বিশ্ব পরিসংখ্যানে সংখ্যালঘু হিসেবে দেখানো হয়েছে। বাস্তব চিত্র এর সম্পূর্ণ উল্টো। সত্যিকার পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে মুসলমানরা বিপুলভাবে সংখ্যাগুরু যদিও ভুয়া পরিসংখ্যানে ইচ্ছেকৃতভাবে মুসলিম জনসংখ্যা কম বলে উল্লেখ করা হয়, বিশেষ করে ইসলামের শত্রুরা রাজনৈতিক মতলব হাসিলের জন্যে কয়েকটি অঞ্চলের মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘু হিসেবে প্রতিপন্ন করে। ইথিওপিয়ার মুসলমানরা হচ্ছে এর অন্যতম জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। সে দেশের মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে অধিকাংশ মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত ও পদদলিত করে রাখা হয়েছে।

সংখ্যালঘুদের যা প্রয়োজন

বৃহত্তর মুসলিম বিশ্বের কাছ থেকে এসব সংখ্যালঘুর অনেক কিছু পাওয়ার রয়েছে ঃ

১. তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে সাহায্য প্রয়োজন যেন এগুলোর মুসলিম চরিত্র সংরক্ষণ করা যায়। ইসলাম নির্মূলের লক্ষ্যে খৃষ্টীয়করণের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠানগুলো যে ভয়াবহ অভিযান শুরু করেছে সে প্রেক্ষিতে এ সাহায্য অত্যন্ত জরুরী।

২. ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাস, ইবাদত বন্দেগী, নৈতিক মূল্যবোধ ও বিধি বিধান এসব মুসলিম সংখ্যালঘুর ভাষায় তুলে ধরার জন্যে জ্ঞানের সঠিক উৎস হিসেবে তাদের কাছে মৌলিক ইসলামী বই পুস্তক সরবরাহ করা প্রয়োজন। তাদের জন্যে বিশেষভাবে প্রয়োজন পবিত্র কোরআনের তাফসীর এবং বেশ কিছু সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদিস সংকলন।

৩. মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু ছাত্রকে আরব দেশগুলোর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নের সুযোগ করে দেয়া জরুরী, সেখান থেকে তারা জ্ঞান অর্জন করে নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে ইসলামের শিক্ষা প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করবে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ নিজ কওমে ফিরে এলে যাতে তারা অসৎ কাজ সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে। (সূরা তাওবা ঃ ১২২)।

   কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এসব বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন দেশের মুসলিম সংখ্যালঘু ছাত্রদের জন্যে তাদের দরজা সম্প্রতি বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ এ সিদ্ধান্ত মুসলিম সংখ্যালঘু, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে ইসলামী দাওয়াত এমনকি খোদ মুসলিম উম্মাহর জন্যে বিপজ্জনক।

৪. সংখ্যালঘু দেশগুলোতে আরবি ভাষা শিক্ষা এবং আরবি স্কুলগুলোতে আর্থিক সহায়তাসহ অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতাদান জরুরী অথচ এক্ষেত্রে আরবদের ব্যর্থতার কোনো সীমা নেই। উন্নত দেশগুলো তাদের ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্যে কোটি কোটি ডলার খরচ করছে। আর এ ভাষার মাধ্যমে তাদের সভ্যতা সংস্কৃতিও পাচার করছে। কিন্তু আরবরা এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়। আরবি ভাষার প্রচার ও প্রসারের কথা যখন ওঠে তখন তারা তাদের ধনভাণ্ডার আঁকড়ে ধরে থাকে। মুসলিম সংখ্যালঘুরা তাদের দ্বীন, রাসূল (সা.) এবং তাদের কিতাবের প্রতি ভালোবাসার আকর্ষণে আল-কোরআন, হাদিস, ইবাদত বন্দেগী, ইসলামী সংস্কৃতি এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সৌহার্দ্য সমঝোতার ভিত হিসেবে আরবি ভাষা শিক্ষার জন্যে স্ব-উদ্যোগে যদি স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা না করত তাহলে আরব বিশ্বের বাইরে আরবি জানা কোনো লোক আমরা দেখতে পেতাম না।

   প্রিন্স মুহাম্মদ আল ফয়সাল আল সউদের নেতৃত্বে এবং ড. তওফিক আল শাবী'র পরিচালনায় আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশে আরবি ভাষা শিক্ষা ও প্রসারের জন্যে

'এসোসিয়েশন অব আরব স্কুলস' বেশ কিছু উপযোগী কোর্সের আয়োজন করে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এ উদ্দেশ্যে সাহায্য সহযোগিতা দান করে। এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

৫. মুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্যে এমন ধর্ম প্রচারক বা মুবাল্লিগ ও শিক্ষক প্রয়োজন যারা সংখ্যালঘুদের ভাষায় পারদর্শী। তারা তাদেরই মধ্যে বসবাস করে অজ্ঞদের জ্ঞান, বিপথগামীদের নসিহত, বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব ও ফতোয়া দেবে এবং দ্বীনদারী, তাকওয়া, সম্প্রীতি ও সদিচ্ছার ভিত্তিতে মানুষকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করবে।

   অবশ্য সর্বনাশা মুবাল্লিগদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। তারা কেবল সমাজের ক্ষতিই করে না, অনর্থক তর্ক বিতর্কের আগুন জ্বালিয়ে হিংসা বিদ্বেষের জন্ম দেয়। এদের মধ্যে কিছু কিছু মুবাল্লিগের নিয়ত ভালো হতে পারে, কিন্তু এ নিয়তের সঙ্গে যদি থাকে মূর্খতা তবে তা লাভের চেয়ে ক্ষতির কারণ হয় বেশি। একটি প্রাচীন প্রবাদে রয়েছে, মূর্খ বন্ধুর চেয়ে শিক্ষিত শত্রু কম বিপজ্জনক।

৬. বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও মুবাল্লিগদের সঙ্গে সংখ্যালঘুদের মিটিং, দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাহলে তাদের সামনে চিন্তার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং তাদের মনোবল উজ্জীবিত হবে। যতোটা সম্ভব ঘন ঘন এ ধরনের সাক্ষাত, মিটিং ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা উচিত যেন উম্মাহর প্রাণকেন্দ্র থেকে দূরে বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী সংখ্যালঘু ভাইয়েরা উম্মাহর মূলস্রোত থেকে নিজেদের উপেক্ষিত অথবা ইসলামী আন্দোলনের চিন্তাপ্রবাহের কেন্দ্রবিন্দু ও নেতৃবৃন্দের সমমর্মিতা থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন মনে করতে না পারেন।

৭. সম্ভবত সর্বাগ্রে তাদের প্রয়োজন হচ্ছে একটি অভিন্ন ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যেন তারা তাদের অস্তিত্ব ও ধর্মীয় পরিচিতি সংরক্ষণে সক্ষম হতে পারে। এটি দুর্ভাগ্যজনক যে সারা বিশ্বের সংখ্যালঘুরা যখন সংখ্যাগুরুদের মোকাবিলায় তাদের অস্তিত্ব মজবুত করার জন্যে সব ভেদাভেদ পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, তখন মুসলিম সংখ্যালঘুরা সব সময় একে অপরের বিরুদ্ধে লেগে আছে এবং তাদের সময় ও শ্রম অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন বিবাদ, বিশেষ করে ফিকাহ ও আকীদা সংক্রান্ত ইস্যুকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বাক-বিতণ্ডার পেছনে নষ্ট করছে।

   সকল মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহতায়ালার হুকুম অনুযায়ী একে অপরের পাশে দাঁড়ানো। মুসলমানদের জন্যে তো এটিই যথেষ্ট, তাদের মধ্যে এমন একটি ঐক্যবোধ রয়েছে যেখান থেকে তারা যাত্রা শুরু করতে পারে। সেটি হচ্ছে আল্লাহ, রাসূল (সা.) ও পবিত্র কোরআনের ওপর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা ঐক্যবদ্ধ। আমি এটি বলছি যদিও আমি জানি মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে বসবাসকারী মুসলমানদেরই অনেক দুঃখ দুর্দশা আছে। তাহলে মুসলিম বিশ্বের বাইরে

অবস্থানকারী সংখ্যালঘু মুসলমানদের অভাব অভিযোগ থাকবে না তা কিভাবে সম্ভব? মুসলিম দেশগুলোর মুসলমানরাই যদি মুসলিম নামধারী শাসকদের হাতে অত্যাচার অবিচারের শিকার হয় তবে আমরা কিভাবে আশা করতে পারি খৃস্টান, কমিউনিস্ট, পৌত্তলিক নির্বিশেষে অমুসলিম শাসকদের অধীনে অমুসলিম দেশের মুসলমানদের কোনো অভিযোগ থাকতে পারে না?

নেতৃত্ববিহীন জাতি

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলিম ও সংখ্যালঘু মুসলমানদের সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে সম্প্রসারণশীল এ বিপুল জনগোষ্ঠীর এমন কোনো নেতৃত্ব নেই যারা তাদেরকে সকল ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিতে পারে।

কোনো একদিন আমাদের ছিল খেলাফত ব্যবস্থা যা মুসলিম জাতিকে এক পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। আমাদের একজন খলিফা ছিলেন, যিনি ঐক্যবদ্ধ উম্মাহর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতিভূ ছিলেন। খেলাফত ব্যবস্থার শত্রুরা এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মুসলিম জাতির ঐক্যের প্রতীক এ মহিমান্বিত প্রতিষ্ঠানটিকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। আমাদের আর থাকল না এক অভিন্ন অস্তিত্ব, না রইল এক পতাকা যার তলে আমরা সমবেত হতে পারি।

আমরা খেলাফত পদ্ধতি হারালাম। কিন্তু এর কোনো বিকল্প পদ্ধতিও আমরা উদ্ভাবন করতে পারিনি। সুতরাং কোনো ধরনের নেতৃত্ব ছাড়াই আমাদেরকে চলতে হচ্ছে।

খৃস্টধর্মের নিজস্ব নেতৃত্ব আছে যা এর অনুসারীদের দ্বারা স্বীকৃত। এ নেতৃত্ব এক সুসংগঠিত ধর্মীয় নেতৃত্ব যার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, প্রথা ও জনবল রয়েছে। এর আর্থিক সহায়সম্পদ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পরে তৃতীয় স্থানে। খৃস্টান ধর্মপ্রচারকরা মুসলিম দেশসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু আমাদের মুসলমানদের না আছে মহামান্য খলীফা, না আছে পোপ। আমরা হচ্ছি সেই এতিমের মতো, যে দরজাতেই কড়া নাড়ি সেটাই মুখের ওপর বন্ধ হয়ে যায়।

এক সময় শায়খুল ইসলাম নামে পরিচিতি একটি পদ ছিল। ইসলামে যদিও এ নামে কোনো সরকারি পদ ছিল না। কোনো কোনো পণ্ডিত এতোই জ্ঞানী গুণী শ্রদ্ধাভাজন সাধু-সজ্জন ছিলেন যে মুসলিম জনগণ শ্রদ্ধাভরে তাদেরকে এ উপাধিতে সম্বোধন করতো। আজকের আলেম সমাজ শাসকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে কেবল ন্যায্য কথা বলা থেকেই বিরত থাকে না বরং বিভ্রান্তিকর বক্তব্যও দিয়ে থাকে। ফলে জনগণ বহু বড় বড় শায়খের ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তাই কোনো আলেমকে আর শায়খুল ইসলাম বলা হয় না। এসব আলেম তাদের মনিবদের ইঙ্গিতে বিপুল সহায়সম্পদ ও উপায় উপকরণ হাতিয়ে নিয়ে প্রলোভনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনকারী হাক্কানী আলেমদেরকে একঘরে করার অথবা তাদেরকে হেয় করার জন্যে

উঠে পড়ে লাগে যতক্ষণ না এসব হাক্কানী আলেমের প্রতিরোধ বন্ধ হয়ে যায় এবং জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে।

আন্দোলনের মিশন

ইসলামী আন্দোলনকে সকল ভাবধারা ও গ্রুপসমেত মুসলিম জাতির এ হারানো নেতৃত্বের হাল ধরতে হবে। তাদের মধ্যে থেকে আনুগত্য ও সমর্থনের উপযুক্ত একজন প্রকৃত শায়খুল ইসলামের অভ্যুদয় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন সত্যিকার স্কলারদের সহায়তায় নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে যাবে। আর ভবিষ্যতে যে শায়খুল ইসলাম আবির্ভূত হবেন প্রয়োজনের মুহূর্তে বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর ডাক দেয়ার সামর্থ্য তার থাকতে হবে এবং সেই ডাকের প্রতি সাড়াও পেতে হবে।

প্রবাসী মুসলমান

ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াসহ দূরপ্রাচ্যে বসবাসকারী মুসলিম সংখ্যালঘু ছাড়াও **মুসলিম** দেশ থেকে গমনকারী অভিবাসীদের প্রতিও ইসলামী আন্দোলনকে বিশেষ দৃষ্টি **নিবদ্ধ করতে** হবে।

গুরুত্বের কারণ

মুসলিম অভিবাসীরা এখন আর সংখ্যায় কম নয়। তাদের সংখ্যা এখন লাখ লাখ। বিশেষ করে ফ্রান্সে বিপুলসংখ্যক উত্তর আফ্রিকান রয়েছে। বৃটেনে রয়েছে বাংলাদেশী, ভারতীয় ও পাকিস্তানী। জার্মানিতে তুর্কীদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের উপস্থিতির দরুন মুসলমানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।এদের পূর্বপুরুষদের বহু দিন পূর্বে আফ্রিকা থেকে অপহরণ করে নিয়ে আসা হয়েছিল। এছাড়া ব্যাপক অভিবাসনের কারণেও সেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেড়েছে। এমন একটি পশ্চিমা দেশ নেই যেখানে অস্থায়ী অভিবাসী নেই যারা সেখানে লেখাপড়া অথবা কাজের জন্যে গমন করেনি। আবার অনেকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যেও সে সব দেশে গমন করে।

যেসব মুসলিম দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার সুযোগ নেই কেবল সেসব বিষয় অধ্যয়নের লক্ষ্যে বৃত্তি প্রদান করার জন্যে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পক্ষ থেকে বহু সুপারিশ রয়েছে। এছাড়াও নিজস্ব খরচে অথবা দেশের খরচে প্রতিদিন বহু ছাত্র ছাত্রী বিদেশে সেখানে লেখাপড়া করতে যাচ্ছে। আবার অনেকে চাকরির সন্ধানে অথবা নিরাপত্তা বা স্বাধীনতার জন্যেও মুসলিম দেশ ছেড়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে পাড়ি জমাচ্ছে। সূরা আনকাবুতের ৫৬ নং আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ। নিশ্চয়ই আমার যমিন প্রশস্ত সুতরাং তোমরা কেবল আমারই ইবাদত করো।

পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রথমে আল্লাহর নির্দেশনায় ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয়েছে, কোনো ইসলামী সংগঠনের পরিকল্পনা মাফিক হয়নি। তরুণ নরনারীরা স্বদেশের দ্বন্দ্ব-কলহ থেকে ধর্ম নিয়ে বাঁচার জন্যে এবং জ্ঞান, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা অর্জনের আশায় পশ্চিমা বিশ্বে পাড়ি জমায়। সেখানে তারা কাজ করার এবং প্রাচ্যের অভিবাসী, পণ্ডিত ও অন্যান্যের মধ্যে দাওয়াতি কার্যক্রম ছড়িয়ে দেয়ার চমৎকার সুযোগ পায়।

পাশ্চাত্যে ইসলামের উপস্থিতি

আজকের যুগে বিশ্ব রাজনীতিতে যে সমাজের প্রভাব বিদ্যমান সেই সমাজে ইসলামী **গোষ্ঠীর** উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইউরোপ, দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা এবং

অস্ট্রেলিয়ায় ইসলামী গোষ্ঠীর উপস্থিতি আবশ্যক। কারণ ঃ

১. অমুসলিমদের মধ্যে সুবচন, যুক্তিসঙ্গত আলাপ আলোচনা এবং অনুকরণীয় আচরণের মাধ্যমে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার জন্যেই ইসলামী গোষ্ঠীর উপস্থিতি প্রয়োজন।

২. সুস্থ ইসলামী জীবনযাপনে সহায়ক একটি ইসলামী পরিবেশে নওমুসলিমদের আচার ব্যবহার তদারকি এবং তাদের ঈমানের লালন পালনের জন্যে ইসলামী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আবশ্যক।

৩. পশ্চিমা দেশগুলোতে নবাগত বিশেষ করে পণ্ডিত ও অভিবাসীদের স্বাগত জানানো আবশ্যক এ কারণে যে এসব নবাগত মুসলমান আনসারদের সংস্পর্শ লাভ করবেন যারা নবাগতদের তাদের দেশে বরণ করে নেবেন এবং একটি ইসলামী আবহ সৃষ্টিতে নবাগত মুহাজিরদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।

৪. ইসলাম বিরোধী শক্তির সক্রিয় বিরোধিতা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম ভূখণ্ডের স্বার্থ রক্ষার জন্যেও ইসলামী গোষ্ঠীর উপস্থিতি আবশ্যক।

খৃস্টধর্ম মতই এসব দেশে অপ্রতিহতভাবে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে থাকবে অথবা কেবল ইহুদীবাদই প্রতিপক্ষ হিসেবে তাদের সাথে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের বিরোধিতায় লিপ্ত হবে এটি ঠিক নয়। একথা আমি বেশ কয়েক বছর আগে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য দেশে আমাদের মুসলিম ভাইদের কাছে তুলে ধরেছি। অবশ্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা, উপযুক্ত সংগঠন এবং অগ্রাধিকারের ফিকাহর আলোকে এ কাজ সমাধা করতে হবে। এজন্যে আমাদের সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান, সর্বোত্তম কর্মসূচি ও সবচেয়ে কার্যকর কৌশল অবলম্বনে তৎপর হওয়া উচিত। সুপরিচিত দেশ ও নগরসমূহে মুসলমানদের নিজস্ব সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয়, শিক্ষা ও বিনোদনমূলক সংস্থা থাকা দরকার। প্রবাসী মুসলমানদের মধ্যে আলেম ও ধর্মীয় নেতা থাকাও আবশ্যক যাতে প্রবাসীরা বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে জবাব পেতে পারে এবং কোনো মতভেদ বা বিরোধ দেখা দিলে আলেমগণ যেন সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারেন।

রক্ষণশীলতা ও উদারতা

বিদেশে অবস্থানকারী ভাইদের আমি বলে থাকি, বৃহত্তর সমাজের মধ্যে নিজেদের ক্ষুদ্র সমাজ সংরক্ষণের চেষ্টা করুন। তা না হলে আপনারা অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হবেন না এবং বিলীন হয়ে যাবেন। ইহুদীরা বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে নিজ চিন্তা ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। মুসলমানদেরকেও তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে হবে।

আমি চারপাশের লোকদের জন্যে আমাদের দরজা বন্ধ করে দেয়ার কথা বলছি না। এটি হবে মৃত্যুর শামিল। যা দরকার তা হলো একীভূত আদর্শের বাণী পৌছে দেয়ার জন্যে

মুক্ত মন নিয়ে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। এ উদারতা অন্যের অনুকরণ কিংবা অপরের প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করা নয়।

অনেক দিন ধরে আমরা একটি অভিযোগ শুনে আসছি, স্বদেশে উপযুক্ত স্থান না থাকায় বহু বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞের দেশান্তরী হওয়ার ফলে আরব ও মুসলিম মেধা পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এ অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তবে কোনোভাবেই তাদের নিজ ধর্ম, জাতি, সংস্কৃতি ও পিতৃভূমির প্রতি আনুগত্য হারালে চলবে না। জনগণ ও আবাসভূমির প্রতি তাদের আনুগত্য ও অনুভূতি নিশ্চিত করার জন্যে আমাদের সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আর এটি তখনি সম্ভব যখন আল্লাহ, রাসূল (সা.) এবং মুসলিম স্বার্থের প্রতি তাদের আনুগত্য থাকে। আর শুধু স্বীয় স্বার্থ নয়, জাতির দুঃখ দুর্দশার প্রতি যদি তাদের সহানুভূতি থাকে তাহলেও এ আনুগত্য আশা করা যায়।

অভিবাসীরা যেন পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জীবনে মিশে না যায়, ইসলামী আন্দোলনের কর্তব্য সেদিকেও খেয়াল রাখা। কোথা হতে তারা এসেছে সে ব্যাপারেও প্রবাসীদেরকে অবশ্যই সচেতন করতে হবে।

বিভিন্ন ইসলামী ছাত্র সংগঠন গত তিন দশকে এক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। এর আগে বাম, জাতীয়তাবাদী ও সেক্যুলারপন্থীরা এসব সংগঠন দখল করে রেখেছিল এবং তাদেরই দিক নির্দেশনায় কার্যক্রম পরিচালিত হতো। পশ্চিম গোলার্ধে ইসলামী তৎপরতা সম্পর্কে যারা অবগত তাদের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতে মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের (এমএসএ) অবদান অস্বীকার করার নয়। এরা বিভিন্ন স্থানে শাখা অফিস স্থাপন করেছে এবং বেশ কয়েকটি সম্মেলনেরও আয়োজন করেছে। মূল সংগঠন এমএসএ থেকেই ইউনিয়ন অব ইসলামিক সোসিওলজিস্ট, সোসাইটি অব মুসলিম সায়েন্টিস এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স, ইসলামিক মেডিক্যাল সোসাইটি, ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা ও অন্যান্য সংগঠনের সূত্রপাত হয়। সমাজে স্বাভাবিক অবস্থান থেকে কাজ করার সুবিধার্থে যুক্তরাষ্ট্রেই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

প্রবাসীদের কর্তব্য

আমি গত কয়েক বছর ইউনিয়ন অব মুসলিম স্টুডেন্টস আয়োজিত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছি। এসব অনুষ্ঠানে আমি আনন্দের উৎস খুঁজে পাই। বৃটেনের মুসলিম স্টুডেন্ট সোসাইটি, ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট ইসলামিক সোসাইটিস এবং ইউরোপের অন্যান্য সংগঠনের ক্ষেত্রেও একথা সত্য।

প্রবাসীদের সঙ্গে আমার আলাপ আলোচনায় সব সময় আমি তাদেরকে পাঁচটি কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছি ঃ

১. প্রবাসীর নিজের প্রতি দায়িত্ব ঃ নিজেকে হেফাজত করা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

২. পরিবারের প্রতি কর্তব্য ঃ ভাঙনের হাত থেকে পরিবারকে রক্ষা করা এবং ইসলামের ভিত্তিতে পরিচালিত করা।

৩. স্বীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি কর্তব্য ঃ তাদেরকে এক প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করা।

৪. প্রতিবেশী অমুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি কর্তব্য ঃ বিচক্ষণতা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় আহ্বান করা।

৫. মুসলিম উম্মাহর স্বার্থরক্ষায় প্রবাসীর কর্তব্য ঃ তাদের স্বার্থের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং সাহায্যের হাত বাড়ানো।

সতর্কতামূলক বিষয়

দু'টি ব্যাপারে আমি সতর্ক করতে চাই। বর্ণবাদী ও জাতীয়তাবাদী মানসিকতা এবং চরম পন্থা ও মতানৈক্য। দুঃখজনক যে আমরা কয়েকটি মুসলিম গ্রুপের মধ্যে বর্ণবাদী ও জাতীয়তাবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। এরকম প্রত্যেক গ্রুপ স্বীয় সদস্যদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এর ব্যতিক্রম কেবল তারাই যারা আল্লাহর রহমতে এ অন্যায় থেকে রক্ষা পায়।

এমনকি মসজিদগুলোও বিভিন্ন গ্রুপের বলে চিহ্নিত করা হয়। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে আপনি কোনো শহরে গেলে আপনাকে জানানো হতে পারে এটি তুর্কীদের মসজিদ, ঐ মসজিদ মরক্কোর লোকদের, তৃতীয়টি যুগোস্লাভদের, চতুর্থটি ভারতীয়দের, পঞ্চম মসজিদটি পাকিস্তানীদের, ষষ্ঠটি আরবদের অথবা অন্য কোনো আরব গ্রুপের। আর যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমানদের জন্যে তো বিশেষ মসজিদ রয়েছেই।

ইসলাম এসেছে মানুষের মধ্যে নানা মতভেদ দূর করে তাদেরকে সমতার আসনে বসাতে। মসজিদ হচ্ছে এ লক্ষ্য অর্জনে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা। তাহলে সেটি কিভাবে বিভেদের পন্থা হতে পারে?

এটি সত্যি, প্রবাসীদের প্রথম প্রজন্ম স্থানীয় ভাষা না জানার কারণে প্রথমদিকে এ পৃথকীকরণ জরুরী ছিল। কিন্তু প্রত্যেক দেশে অথবা নগরে বিভিন্ন মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বোধগম্য অভিন্ন ভাষার চর্চা না হওয়া পর্যন্ত একই মসজিদে প্রত্যেক গ্রুপের জন্যে আলাদা আলাদা বক্তৃতার ব্যবস্থা করে এ অবস্থার প্রতিকার করা যেতো। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ পৃথক ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেলেও কোনো কোনো গ্রুপ অথবা জাতি গোষ্ঠীর নামে মসজিদ রয়ে গেছে। একটি মসজিদ কেবল সকল মুসলমানদের জন্যেই হওয়া উচিত। আর যে পতাকাটির তলে সকল প্রবাসীর একত্রিত হওয়া উচিত সেটি অবশ্যই ইসলামের পতাকা।

প্রবাসী মুসলমানরা কেবল তখনি শক্তিশালী হবে যখন তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। কারণ ঐক্যই শক্তি, অনৈক্য দুবর্লতা। সংহতি সব সময় কাম্য হলেও এটি আরো বেশি দরকার বিদেশী ভূমিতে যেখানে নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে ওঠার জন্যে প্রত্যেকেরই তারই মতো আরেকজনের সংশ্রব আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত, উগ্রতা এবং তুচ্ছ খুঁটিনাটি ব্যাপারে আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই। এ অস্বাভাবিক ব্যাপারটি পশ্চিমা দেশগুলোতে কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করা গেলেও এখনো প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে।

প্রাচ্যের মুসলিম ভাইদের উচিত হলো তাদের মতভেদ ও সমস্যাবলী পাশ্চাত্যে আমদানি না করা। এতে এসব নেতিবাচক দিক তাদের নতুন আবাস ভূমিতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। কেননা তাদের স্থান কাল পাত্রের পরিবর্তন হয়েছে। প্রবাসীরা তাদের ধর্মীয় শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন যে স্থান কাল পাত্রের পরিবর্তনের সাথে সাথে ফতোয়ারও পরিবর্তন হয়। সুতরাং তারা যা শিখেছেন, সে অনুযায়ী কাজ করবেন না কেন?

প্রায় বছর দশেক আগে আমি লসএঞ্জেলসের ইসলামিক সেন্টার পরিদর্শন করি। সেখানে কয়েকজন নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– শিক্ষামূলক হলেও কি মসজিদে ফিল্ম দেখানো উচিত? আমি জবাব দিয়েছিলাম, তাতে কি ক্ষতি? এসব চলচ্চিত্রে সৎকর্মের শিক্ষা দেয়া হলে সেগুলো দেখা তো ইবাদতের কাজ। আর মসজিদ তো ইবাদতের স্থান, জ্ঞান ও শিক্ষা লাভের ফোরাম।

আমি আরো বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মসজিদে আবিসিনীয়দেরকে বর্শাসহ নৃত্য করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা.) কে তাদের নাচ দেখার ও তাদেরকে তা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

অন্যেরা জিজ্ঞেস করল, ওয়াজ নসিহত শোনার জন্যে ইসলামী পোশাক পরিহিত নয় এমন মহিলাদের কি মসজিদে প্রবেশ করতে দেয়া যায়? আমি জবাব দিলাম ঃ হ্যাঁ। আমরা যদি তাদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করি, তাহলে তারা আর কোথায় ইসলামের বাণী ও আল্লাহর কালাম শ্রবণ করবে? যদি আমরা তাদেরকে মসজিদে ঢুকতে বারণ করি, ওয়াজ নসিহত শুনতে বাধা দেই তাহলে আমরা তো তাদেরকে চিরদিনের জন্যে হারাবো। তাদের কাছে তো দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছবে না। কিন্তু তারা যদি মসজিদে আসার সুযোগ পায়, আশা করা যায় আল্লাহ তাদেরকে ইসলামের পথে চলার জন্যে হেদায়েত করবেন।

এ পাণ্ডুলিপিটি ছাপাখানায় পাঠানোর জন্যে প্রস্তুতি নেয়ার সময় আমি আমার সম্মানিত ভাই, বিজ্ঞানী, কবি ও ইসলামের প্রবক্তা ড. হাসানের কাছ থেকে একটি চিঠি পাই। চিঠিতে তিনি লসএঞ্জেলসের ইসলামিক সেন্টারের বেশ কিছু কর্মতৎপরতা এবং মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের সাহায্যার্থে সেন্টারের কাজকর্মের কথা তুলে ধরেন। যে কোনো মুসলমান এ চিঠিটি পড়লে উৎফুল্ল হবেন। কারণ এতে এ সত্যই প্রতিভাত হয়েছে, সঠিক উপলব্ধি ও নেক নিয়তের সমন্বয়ে মানুষ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে ইসলাম কখনোই বিলীন হবে না।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র

আগামী পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্তব্য হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক ও একনায়কতন্ত্রবাদী শাসন, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার ও জনগণের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। মেকী নয়, প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথে আন্দোলনকে সোচ্চার হতে হবে। স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিতে হবে তারা জালেম শাসকদের স্বীকার করে না এবং একনায়কতন্ত্রবাদীদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। এমনকি কোনো জালেম শাসক সাময়িকভাবে কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দৃশ্যত আন্দোলনের প্রতি সদিচ্ছা পোষণ করলেও।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যখন আমার উম্মাতকে দেখবে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং কোনো অন্যায়কারীকে বলে না তুমি অন্যায় করছ, তাহলে তুমি তাদের আশা ছেড়ে দিতে পার (আল হাকিম)। তাহলে দাম্ভিক জালেম শাসকদের ব্যাপারে কি করতে হবে যে জনগণকে তারই উদ্দেশ্যে বলতে বাধ্য করে–কী ন্যায়পরায়ণ, কী মহান আপনি, হে আমাদের বীর, আমাদের ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা।

আল-কোরআন কেবল নমরুদ, ফেরাউন, হামান ও অন্যান্য জালেম শাসকদের নিন্দা করেনি বরং যারা তাদের অনুসরণ করে, তাদের হুকুম মেনে চলে সে সব লোককেও ভর্ৎসনা করেছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ নূহের কওমের নিন্দা করে বলেছেন ঃ আর তারা এমন লোকদের অনুসরণ করেছে, যাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তাদের সমৃদ্ধি নয় ক্ষতির কারণ হয়েছে (সূরা নূহ ঃ ২১)।

মহান আল্লাহ হুদের লোকদের সম্পর্কেও বলছেন ঃ এবং তারা অনুসরণ করল প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর আদেশ (সূরা হুদ ঃ ৫৯)।

ফেরাউনের লোকদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ঃ তারা ফেরাউনের আদেশমতো চলতে থাকল এবং ফেরাউনের আদেশ মোটেও ঠিক ছিল না (সূরা হুদ ঃ ৯৭)। অন্যত্র আল–কোরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ এবং তারা তার আনুগত্য করল। নিশ্চয়ই তারা নিতান্ত আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ছিল (সূরা যুখরুফ ঃ ৫৪)।

আধুনিক কালের মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে ঘনিষ্ঠভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন পরিবেশ ছাড়া ইসলামী চিন্তাধারা, ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী জাগরণ বিকাশ লাভ করেনি অথবা ফলপ্রসূ হয়নি। জনগণের ইসলামকে আঁকড়ে থাকার ইচ্ছা স্বৈরাচারী জালেম শাসকদের আমলেই অবদমিত হওয়ার ফলে আন্দোলন ও জাগরণ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। স্বৈরশাসকরা

গুপ্ত নির্যাতন, প্রকাশ্যে হত্যা ছাড়াও অন্যান্য নিষ্ঠুর কৌশল প্রয়োগ করে জনগণের ওপর জোরপূর্বক সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম ও সেক্যুলারিজম চাপিয়ে দিয়েছে।

আমরা বিভিন্ন সময়ে তুরস্ক, মিসর, সিরিয়া, ইরাক, দক্ষিণ ইয়েমেন, সোমালিয়া ও উত্তর আফ্রিকার দেশসহ বহু মুসলিম রাষ্ট্রে স্বৈরশাসনামলে এ নিষ্ঠুর আচরণ প্রত্যক্ষ করেছি।

অন্যদিকে, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক শাসনামলে ইসলামী আন্দোলন ফলপ্রসূ ও বিকশিত হয়। যেসব সরকার জনগণের ওপর ত্রাস ও জুলুমের রাজত্ব কায়েম করেছিল তাদের পতনের পর ইসলামী আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। সুতরাং আমি কল্পনাও করতে পারি না যে ইসলামী আন্দোলন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে সমর্থন দিতে পারে, স্বৈরশাসকরা কেবল ইসলামের কণ্ঠ ছাড়া আর সব কণ্ঠ সোচ্চার হতে দেবে, ইসলামী চিন্তাচেতনা ছাড়া আর সব চিন্তা-মতবাদ রাজনৈতিক অথবা অন্য যে কোনো রূপে প্রকাশ করতে দেবে। অথচ ইসলামী চিন্তাধারাই এ উম্মাহর প্রাণের কথা বলে এবং তাদের আকীদা বিশ্বাস, মূল্যবোধ, চেতনা ও অস্তিত্বের অভিব্যক্তি ঘটায়।

অবশ্য কোনো কোনো ইসলামপন্থী গণতন্ত্রের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে। এমনকি 'গণতন্ত্র' শব্দটির প্রতিও তারা সহনশীল নয়। এখানে আমি জোরের সাথে বলতে চাই, ইসলাম গণতন্ত্র নয় আর গণতন্ত্রও ইসলাম নয়। বরং আমি বলব অন্য কোনো নীতি বা পদ্ধতির সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই। উদ্দেশ্য, পন্থা ও পদ্ধতি সবদিক দিয়ে ইসলাম অতুলনীয়। আমি চাই না পশ্চিমা গণতন্ত্র তার খারাপ দিকসহ ইসলামের মাঝে স্থান পাক। আমাদের স্বকীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ যোগ করেই কেবল আমরা আমাদের সুবিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে পশ্চিমা গণতন্ত্রকে অঙ্গীভূত করতে পারি।

তবে শাসকদের অভিলাষ ও খামখেয়ালীর লাগাম টেনে ধরার জন্যে পৃথিবীতে ইসলাম যে রাজনৈতিক নীতিমালার রূপায়ণ ঘটায় গণতন্ত্রের সৃষ্ট কৌশল ও রক্ষাকবচ তার অনেক কাছাকাছি। এ মূলনীতি হচ্ছে– পরামর্শসভা বা শূরা, সদুপদেশ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, অন্যায় আদেশ অমান্য করা, কুফরী প্রতিরোধ করা এবং সম্ভব মতো শক্তিপ্রয়োগ করে অন্যায় অবিচারের প্রতিকার। কেবলমাত্র গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে পার্লামেন্টের ক্ষমতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে। শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করলে জনগণের প্রতিনিধিরা যে কোনো সরকারের ওপর অনাস্থা আনতে পারে। কেবল এরকম এক পরিবেশেই স্বাধীন সংবাদপত্র, স্বাধীন পার্লামেন্ট, বিরোধী দল ও জনতার শক্তির সর্বাধিক উপস্থিতি অনুভূত হয়।

এক্ষেত্রে অনেকের আশঙ্কা যে গণতন্ত্র জনগণকে শক্তির উৎস মনে করে এমনকি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও, যদিও আইন কেবল আল্লাহরই। এ আশঙ্কা অমূলক, কারণ আমরা যে জনগণের কথা বলছি তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে মুসলমান এবং তারা আল্লাহকে প্রভু, মুহাম্মদ (সা.) কে রাসূল ও ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মেনে নিয়েছে। এ

জনগণ তো ইসলাম এবং ইসলামের অলঙ্ঘনীয় নীতিমালা, চূড়ান্ত বিধিবিধানের পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করবে বলে আশা করা যায় না।

যাহোক ইসলামের অলঙ্ঘনীয় বিধানের পরিপন্থী যে কোনো আইন বাতিল বলে গণ্য হবে এমন একটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করে এ আশঙ্কা দূর করা যেতে পারে। কেননা ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্র ধর্ম এবং রাষ্ট্র সকল প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতির বৈধতার উৎস বিধায় এর লঙ্ঘন করা যেতে পারে না।

এটি জেনে রাখা দরকার আইন আল্লাহর, এ মূলনীতি মেনে নেয়ার মাধ্যমে সতত পরিবর্তনশীল জীবন ও জাগতিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন কানুন তৈরির ক্ষেত্রে জাতির অধিকার হরণ করা হয় না।

আমরা মূলগ্রন্থ কোরআন, শরীয়াহর সামগ্রিক লক্ষ্য ও ইসলামের মর্মবাণীর সীমার মধ্যে থেকে আইন বিধি প্রণয়ন করতে চাই। বাধ্যতামূলক আদেশ নিষেধের সংখ্যা খুবই কম, অন্য দিকে ঐচ্ছিক অথবা আইন প্রণয়নের উন্মুক্ত পরিসর খুবই ব্যাপক। কোরআনের হুকুম আহকাম এতো নমনীয় ও বিস্তীর্ণ যে এগুলো থেকে একাধিক উপলব্ধির অবকাশ রয়েছে এবং একাধিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যেতে পারে। এরই ফলে ইসলামের সুবিস্তৃত কাঠামোর আওতায় কয়েকটি মাজহাব ও দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে।

সম্প্রতি কাতারে প্রবর্তিত কয়েকটি আইন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি এগুলোর মধ্যে কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ বর্জনের ভিত্তিতে বহু সংখ্যক অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কোরআনে দু'একটি ছাড়া এসব বিষয়ের সরাসরি উল্লেখ নেই।

মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী আন্দোলনের প্রতি সবচেয়ে মারাত্মক হুমকি হচ্ছে ফেরাউনী আইন। ফেরাউনরা মনে করতো তাদের মতামতই অভ্রান্ত ও সঠিক যা কখনো ভুল হতে পারে না। এ ধরনের শাসকরা ফেরাউনের যুক্তিকে গ্রহণ করে ঃ আমি সেই পথই দেখাই যা আমি সঠিক মনে করি এবং তোমাদেরকে কেবল মঙ্গলের পথই দেখাই (সূরা মু'মিন ঃ ২৯)।

এসব শাসক বিরুদ্ধবাদী যে কোনো মতামতকে অগ্রাহ্য করে এমনকি দোষারোপও করে, ঠিক যেমন মূসা (আ.) এর ব্যাপারে ফেরাউন বলেছিল ঃ আমার আশঙ্কা হয় যে সে তোমাদের ধর্মই পরিবর্তন করে ফেলবে অথবা রাজ্যের মধ্যে কোনো বিপর্যয় ঘটিয়ে ফেলবে (সূরা মু'মিন ঃ ২৬)।

জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু

মুসলিম ও আরব বিশ্বের নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি ইসলামী আন্দোলনের একটি চূড়ান্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

জাতিগত সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান

ইসলামী ব্যবস্থায় নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত সংখ্যালঘুরা কোনো সমস্যা নয়। কারণ ইসলাম এক বিশ্বাস, এক কিবলা এবং ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সব বর্ণগোষ্ঠীকে এক প্লাটফরমে সমবেত করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণ, ভাষা ও আবাসভূমি নির্বিশেষে সকল মুসলমান এক জাতি। আরব, পারসিক, বার্বার, কুর্দী, তুর্কী, ভারতীয় অথবা অন্য যে কোনো জাতিগোষ্ঠীর সব মুসলমানকে ইসলাম সমান চোখে দেখে। তাদের মধ্যে নিম্নস্তরের মানুষটিও স্বীয় পরিচয়ে সর্বোচ্চ স্তরের মানুষটির মতোই কথা বলার হকদার এবং তারা একদেহ একপ্রাণ হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা তাদের সম্পর্কে বলছেন ঃ মুমিনগণ তো সকলেই পরস্পর ভাই (সূরা হুজুরাত ঃ ১০)।

তাকওয়া ছাড়া কোনো আরব অনারবের চেয়ে, কোনো অনারব আরবের চেয়ে, কোনো শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ'র চেয়ে, কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ'র চেয়ে উত্তম নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ নিশ্চয়, তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত যার তাকওয়া সর্বাধিক (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)।

সকল যুগের সকল মুসলমানের চোখে পারস্যের সুলায়মান (রা.), আবিসিনিয়ার বেলাল (রা.) এবং রোমান সুহায়েবের (রা.) মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান কী ছিল প্রত্যেকের কাছে তা সুবিদিত।

অনারব পণ্ডিতরা ইসলাম ও আরবি ভাষার জন্যে যে অবদান রেখেছেন ইসলামের কোনো পণ্ডিত তা অস্বীকার করতে পারবেন না। ইসলামের ইতিহাস এরূপ প্রখ্যাত পণ্ডিত ও প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বদের দৃষ্টান্তে ভরপুর। যেমন, আল হাসান আল বসরী, ইবনে শিরীন, আতা, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, আবু হানিফা, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, আল তিরমিজি, আল নাসায়ী, ইবনে মাজাহ প্রমুখ।

তারা সকলে মূলত অনারব হলেও ইসলামের সুবাদে তারা আরব বলে পরিচিতি লাভ করেন। আরবি তাদের ভাষা হয়ে ওঠে যেন তারা কোরআনের ভাষায় কথা, লেখা ও গবেষণা করতে পারেন। ইবনে আসাকির বর্ণিত এক হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে ঃ আরব

হওয়ার জন্যে আরব মাতা পিতার দরকার নেই, ভাষাই যথেষ্ট। যে আরবি ভাষায় কথা বলে সেই আরব।

কুর্দী, বার্বার, পারসিক, মালয়েশীয় এবং অনান্য অনারবদের মতো যারা ইসলাম গ্রহণের সময় আরবিকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করেনি তাদের হৃদয় মন ইসলামী সংস্কৃতি তথা ইসলামের প্রভাবে আরবিয় হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ্‌র অনুপ্রেরণায় তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শনের জন্যে বহু শতাব্দী আগে আরবরাই ইসলামের বাণী নিয়ে তাদের ভূখণ্ডে পদার্পণ করেন।

প্রত্যেক মুসলমান আরবি ভাষাকে ভালোবাসে কেননা এটি কোরআন, সুন্নাহ ও ইবাদতের ভাষা। প্রতিটি মুসলমান আরব ভূমিকে ভালোবাসে কারণ সেখানে কাবা, মসজিদে নববী ও রাসূল (সা.) এর রওজা মুবারক অবস্থিত। প্রত্যেক মুসলমান আরবদেরকে ভালোবাসে, কেননা তারা রাসূল (সা.) ও ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী এবং তারা সারা বিশ্বে ইসলামকে ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রাচীন এক প্রবাদ হচ্ছে– আরবরা শক্তিশালী হলে ইসলামও শক্তিশালী হবে; তারা দুর্বল হলে ইসলামও দুর্বল হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত সমস্যা নেই বরং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিই নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত সমস্যার অভ্রান্ত সমাধান দিতে পারে। কিন্তু আরবরা যদি আরব জাতীয়তাবাদের ডাক দেয়, যার সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই, তাহলে কুর্দীরা কুর্দী জাতীয়তাবাদের দাবি করবে, বার্বাররা বার্বার জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তুলবে আর এভাবে চলতে থাকলে এক উম্মাহ নিঃসন্দেহে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। এমনকি আলাদা আলাদাভাবে দেশগুলোতেও আইয়্যামে জাহেলিয়াতের মতো জাতিগত অনুভূতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, যে সংকীর্ণতা কেবল ইসলাম এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব দিয়ে জয় করা হয়েছিল। যে কেউ অন্ধ জাতীয়তাবাদ অথবা গোত্রবাদের জিগির তোলে, এর জন্যে লড়াই করে কিংবা মৃত্যুবরণ করে আমাদের মহানবী (সা.) তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের দিকে যথাযথভাবে নজর দেয়া উচিত। আমি এক নিবন্ধে তাদেরকে মুসলিম সমাজের মধ্যে অমুসলিম সম্প্রদায় বলে অভিহিত করি। অমুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্যা খোলাখুলি ও মুক্ত মন নিয়ে সমাধানে তৎপর হওয়া উচিত, রাজনৈতিক কুমতলব ও কপটতার মাধ্যমে নয়।

এ সংখ্যালঘুদের প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমার 'ইনএভিটেবিলিটি অব দি ইসলামিক সলিউশন' গবেষণা গ্রন্থে আলোকপাত করেছি। পুনরাবৃত্তি না করেই তার কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরছি ঃ

প্রথমত, সাধারণত সেক্যুলারপন্থী যাদের ইসলাম বা খৃষ্টধর্ম কোনোটির প্রতিই আনুগত্য নেই তারা অভিযোগ করেন যে ইসলামী সমাধান ও ইসলামী আইন অমুসলিমদের স্বাধীনতার পরিপন্থী। এসব অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। কারণ তারা আরো একটি

গুরুত্বপূর্ণ, আরো তাৎপর্যপূর্ণ দিক হয় ভুলে যান, নয় উপেক্ষা করেন। সেটি হচ্ছে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের স্বার্থে ইসলামী আইন ও ইসলামী সমাধান পরিত্যাগ করা সংখ্যাগুরু মুসলমানদের ধর্মীয় আদেশ পালনের স্বাধীন নীতির পরিপন্থী। যখন সংখ্যালঘুর অধিকার সংখ্যাগুরুদের অধিকারের পরিপন্থী হয় তখন কোন অধিকারটি অধিক গুরুত্ব পাবে?

গণতন্ত্র, যার পক্ষে সেক্যুলারপন্থীরা সোচ্চার এর যুক্তি হচ্ছে সংখ্যাগুরুর অধিকার সংখ্যালঘুর অধিকারের ওপরে অগ্রাধিকার পাবে। বিশ্বের সকল দেশে এ নিয়মই চলে আসছে। প্রত্যেকের সমর্থন পাবে এমন পদ্ধতি এখনো উদ্ভাবিত হয়নি। কারণ নানামুখী প্রবণতা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। একই জিনিস কখনো সবাই মেনে নিতে পারে না। একটি প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির জন্যে এটিই যথেষ্ট যে সংখ্যাগুরু মানুষ সেটি মেনে নেয় এবং তা সংখ্যালঘুদের প্রতি কোনো অন্যায় অবিচার কিংবা সংখ্যালঘুর ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘন না করে। মুসলমানরা যাতে তাদের ধর্ম অনুযায়ী শাসন কাজ চালাতে পারে এবং আল্লাহর রহমতের আশায় তাঁর আইন বলবত করতে পারে এ লক্ষ্যে খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় যদি তাদের অধিকার ত্যাগ করে তাতে তাদের কোনো ক্ষতি হবে না।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যদি এরূপ না করে সংখ্যাগুরুদের অধিকার ত্যাগ করার জন্যে চাপ দেয় তাহলে সংখ্যাগুরুদের ওপর সংখ্যালঘুদের একনায়কত্ব চাপিয়ে দেয়ার শামিল হবে। উদাহরণস্বরূপ, চার কোটি সংখ্যাগুরুর উপর যেন ত্রিশ লাখ সংখ্যালঘুর শাসন। এ ধরনের পরিস্থিতি ধর্মীয় অথবা সেক্যুলার কোনো যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তদুপরি সংখ্যাগুরু মুসলমানদের অধিকার ত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না এ কারণে যে এটি তো ধর্মত্যাগের শামিল, আর আল্লাহ নির্ধারিত এর শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম।

দ্বিতীয়ত, সেক্যুলারপন্থীদের উল্লিখিত অভিযোগ এ ধারণার ভিত্তিতে করা হয়েছে যে মুসলিম সংখ্যাগুরুর অধিকার এবং অমুসলিম সংখ্যালঘুর অধিকারের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কোনো খৃস্টান যদি ধর্মীয় নয় সেক্যুলার শাসনের আওতায় নাগরিক হতে পারে তাহলে ইসলামী শাসনের অধীনে থাকতে তার আপত্তি করার যুক্তি থাকে না।

তদুপরি যে খৃস্টান তার ধর্মকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে তার ইসলামী শাসনকে স্বাগত জানানো উচিত। কেননা এরূপ শাসনের ভিত হচ্ছে মহান আল্লাহ, তার ওহী ও আখেরাতের পুরস্কার। এ শাসন বিশ্বাস ও নৈতিকতার সেই মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সকল নবী রাসূল যার ডাক দিয়েছেন। ইসলাম হযরত ঈসা (আ.), মরিয়ম (আ.) ও ইঞ্জিলকে সম্মানের চোখে দেখে এবং আহলে কিতাবদের বিশেষ মর্যাদা দেয়। সুতরাং যে ধর্ম আল্লাহ, তাঁর নবী রাসূল ও পরকালকে স্বীকার করে তার অনুসারীরা এমন একটি শাসনকে কিভাবে ভয় করতে পারে যে শাসন ঐশীবিধান, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত। অথচ খৃস্টধর্মে বিশ্বাসীরা ধর্মহীন সেক্যুলার শাসনে ভীত

বা উৎকণ্ঠিত নয়, যে শাসন সকল ধর্মকে ঘৃণা করে এবং যদি কখনো ধর্ম চর্চার অনুমতি দেয়ও তবে তা জীবনের একটি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে?

অন্যান্য সকল শাসন পদ্ধতির মতো বিবেচনা করে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা মেনে নেয়াই বিশ্বাসী খৃস্টানদের জন্যে উত্তম। আর মুসলমানরা এ শাসন ব্যবস্থাকে তাদের দ্বীনি পদ্ধতি বলেই মনে করে যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর নৈকট্য লাভের আশা করে।

এটি তো খৃস্টানদের জন্যেই উত্তম। কারণ হাসান আল হুদাইবির ভাষায়– এ বিশ্বাসের ফলে মুসলমানরা ইসলামী আইন বলবৎ করার ক্ষেত্রে কোনো ভুল ভ্রান্তি যেন না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকবে। তাদের মধ্যে এ অনুভূতি কাজ করবে যেন তারা আল্লাহতায়ালার সতর্ক দৃষ্টির আওতায় রয়েছে, সেখানে কোনো শাসকের ভয় তাদের মনে স্থান পাবে না–যে ভয় সাধারণত কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে।[১]

সুতরাং বিচক্ষণ ও উদারমনা খৃস্টানরা বস্তুবাদের অগ্রগতি রোধে এক অপ্রতিরোধ্য বাধা হিসেবে ইসলামী শাসনকে স্বাগত জানিয়েছে। কেননা, বস্তুবাদ বিশ্ব কমিউনিজমের প্রশ্রয়ে সকল ধর্মকে হুমকির সম্মুখীন করেছে। প্রখ্যাত মনীষী ফারিস আল খোরী এমন কথাই বলেছেন।

আমি এখানে একটি ভুল ধারণার সংশোধন করতে চাই। অনেকে মনে করেন যে খৃস্ট্রীয় পাশ্চাত্য থেকে যে মানব রচিত আইন আমদানি করা হয় সেটির সঙ্গে খৃস্টধর্মের সম্পর্ক রয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি ভুল ধারণা। যারা আইনের উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক সূত্র নিয়ে চর্চা করেন তারা এটি ভালো করেই জানেন। এ যুক্তিই সত্য যে পাশ্চাত্যের এসব আইনের চেয়ে খৃস্টধর্ম ও খৃস্টান ধর্মের অনুসারীরা ইসলামী ফিকাহর অধিকতর নিকটবর্তী। প্রথমত ধর্মীয় কারণ এবং অন্য দিকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব।

তৃতীয়ত, বাস্তবক্ষেত্রে মুসলিম শাসন অমুসলিমদের ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী কাজকর্ম সম্পাদনে বাধ্য করবে এ অভিযোগও মিথ্যা। ইসলামের চারটি শাখা– ঈমান, ইবাদত, নৈতিক মূল্যবোধ ও শরীয়াহ। ইসলাম কোনোভাবেই তার ধর্মবিশ্বাস অথবা ইবাদত অমুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয় না।

এ ব্যাপারে আল–কোরআনে দু'টি সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে। একটি মক্কী, অন্যটি মাদানী। প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সা.) সম্বোধন করে বলছেন ঃ তবে কি আপনি মানুষের ওপর জবরদস্তি করবেন যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে (সূরা ইউনুস ঃ ৯৯)?

১. ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সাবেক মুর্শিদে আম হাসান আল হুদায়বির 'আওয়ার কন্সটিটিউশন' গ্রন্থ হতে।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহতায়ালা আরো স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন ঃ ধর্মে জবরদস্তি নেই (সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬)।

রাসূলের (সা.) সাহাবিরা আহলে দিম্মী[১] সম্পর্কে বলতেন, তাদেরকে তাদের ধর্ম নিয়ে থাকতে দাও।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে ইহুদী ও খৃস্টানরা নির্বিঘ্নে উপাসনাসহ তাদের অধিকার ভোগ করেছে। হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমরের (রা.) শাসনকালে মুসলমান ও তাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিই এর প্রমাণ। এ সবের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হযরত ওমর (রা.) এবং জেরুজালেমের জনগণের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

ইসলামের বিধিবিধান এতোই সুবিবেচনাপ্রসূত যে অমুসলমানদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করা হয় না কিংবা তাদেরকে জিহাদেও অংশ নিতে হয় না। কেননা দুটিই ইসলামের অন্যতম প্রধান ইবাদত। যাকাত এক প্রকার আর্থিক কর আর জিহাদ সামরিক সেবা। এর পরিবর্তে ইসলাম অমুসলমানদের ওপর অন্য এক ধরনের কর আরোপ করে যাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় জিজিয়া। তবে নারী, শিশু, গরীব ও পঙ্গু লোকজন এ করের আওতাবহির্ভূত।

কেউ যদি জিজিয়া শব্দটা মানতে রাজি না হন তাহলে এটিকে তাদের যা খুশি বলতে দিন। আরব খৃষ্টান গোত্র বনু তাগলিবের লোকেরা জিজিয়ার পরিবর্তে দ্বিগুণ যাকাত প্রদানের জন্যে ওমর ইবনে খাত্তাবের কাছে অনুমতি চাইল। হযরত ওমর এতে সম্মত হয়ে তাদের সঙ্গে এ মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন– এ লোকেরা নির্বোধ, তারা অর্থ মেনে নেয় কিন্তু নাম অস্বীকার করে।

ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ প্রসঙ্গে বলা যায়, অন্যান্য ধর্ম থেকে এটি আলাদা কিছু নয়। কেননা সকল ধর্মের দৃষ্টিতে নৈতিকতা একই রকম।

ইসলামে আহকাম বা শরীয়াহর বিশেষ অর্থ রয়েছে। অর্থাৎ সে সব আইন যা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। এ আইন ব্যক্তির সাথে জাতির, তার সম্প্রদায় ও তার রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ করে এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে তার নাগরিকদের ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্কও নিয়ন্ত্রণ করে।

পারিবারিক সম্পর্ক ও দাম্পত্য সংক্রান্ত বিষয় যেমন বিয়ে, তালাক ইত্যাদি ব্যাপারে অমুসলমানরা তাদের ধর্ম বা আমাদের মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নিতে পারে। শরীয়াহর বিধিবিধান মেনে নেয়ার ব্যাপারে তাদের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। উদাহরণস্বরূপ সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে তারা যদি চায় ইসলামী আইন মেনে নিতে পারে। যেমন কোনো কোনো আরব দেশে খৃস্টানরা তা স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছে। তারা যদি তাদের

১. আহলে দিম্মী হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম প্রজাবৃন্দ।

জীবনযাপনে ইসলামী আইন প্রয়োগ না করতে চায় তাহলে তা তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে না।

এ কারণেই আহলে দিম্মীর জন্যে নিজস্ব আদালত থাকা বাঞ্ছনীয় যেখানে তারা বিচারপ্রার্থী হতে পারে। আবার তারা ইসলামী আদালতের আশ্রয়ও নিতে পারে। ইতিহাসে এমন নজির আছে।

অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন বেসামরিক, বাণিজ্যিক অথবা প্রশাসনিক আইনের ক্ষেত্রে অমুসলিমরা অন্যান্যের মতোই প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য থেকে উৎসারিত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা স্বীকৃত এমন যে কোনো আইনের আওতাধীন।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলাম অমুসলমানদেরকে তাদের ধর্মের কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করতে বাধ্য করেনি। কিংবা এমন কিছু করতেও বলেনি যা তাদের ধর্মবিশ্বাসে নিষেধ আছে। আবার তাদের ধর্মের পরিপন্থী কোনো কিছুতে বিশ্বাস স্থাপনেও জবরদস্তি করেনি।

কেবল কিছু কিছু এমন বিষয় আছে যেগুলো ইসলামে নিষিদ্ধ কিন্তু অমুসলিমরা বৈধ মনে করে। যেমন মদ ও শূকরের মাংস। বৈধ বিষয়গুলোও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তাদের স্বাধীন ইচ্ছা মতো পরিহার করতে পারে। সুতরাং খৃস্টানরা মদপান ছেড়ে দিলে তাদের ধর্মের দৃষ্টিতে দোষী হবে না। আমি চিন্তাও করতে পারি না, কোনো ধর্ম সুরা পান উৎসাহিত করবে এবং মাদকাসক্ত হয়ে মাতলামি করাকে সুনজরে দেখবে। বাইবেলে মদ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হলো, সামান্য পরিমাণ পান করলে পাকস্থলির জন্যে ভালো। আর এ কারণে খোদ খৃস্টানরাই মদপানের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত।

একজন খৃস্টান শূকরের মাংসে একটি কামড় না দিয়েও সারাজীবন পার করে দিতে পারে। কারণ এটি খাওয়া কোনো ধর্মীয় প্রথা নয়, না এটি নবী রাসূলদের দেয়া যুগ যুগ ধরে চলে আসা কোনো নিয়ম। শূকরের মাংস ইসলাম-পূর্ব যুগে ইহুদী ধর্মেও নিষিদ্ধ ছিল।

অবশ্য অনেক আলেম এ মত পোষণ করেছেন যে খৃস্টানরা তাদের নিজস্ব এলাকার মধ্যে শূকরের মাংস খেতে পারে, মদপান করতে পারে, এমন কি নিজেদের মধ্যে উভয় পণ্যের ব্যবসাও করতে পারে। তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এগুলো ছড়ানো যাবে না কিংবা এগুলোর মারফত মুসলিম অনুভূতিকেও অবজ্ঞা করা যাবে না। এ এক অনুপম সহিষ্ণুতা।[১]

১. আমার লিখিত 'দি এভিডেন্সেস অব দি ইসলামিক সলিউশন এন্ড দি এমবিগিউটিস অব সেক্যুলারিস্টস এন্ড অকসিডেন্টালিস্টস' বইয়ের 'রিলিজিয়াস মাইনরিটিস এন্ড দি ইসলামিক সলিউশন' শীর্ষক অধ্যায়।

আন্দোলন ও সংলাপ

ইসলামী আন্দোলনকে আগামী পর্যায়ে কেবল নিজের সমস্যা সুরাহার মধ্যে সীমিত রাখলে চলবে না। আন্দোলনের পরিধি অবশ্যই সম্প্রসারিত করতে হবে যাতে অন্যদের সমস্যার দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়।

অনেক ইসলামী লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি নিজেদের জন্যেই লিখে থাকেন। অর্থাৎ তাদের জন্যে লেখেন যারা তাদের পদক্ষেপ অনুসরণ করেন এবং তাদের মতামত প্রচারে নিয়োজিত থাকেন। কেবল পরস্পরের মধ্যে কথা বলার এ গণ্ডি তারা অতিক্রম করতে পারেন না যেন পৃথিবীতে তারা ছাড়া আর কোনো লোক নেই। তারা যদি এ বৃত্ত থেকে বের হন তাহলে কেবল অন্য ইসলামী গ্রুপের উদ্দেশ্যেই লেখেন যারা ইসলাম ও দাওয়াতের প্রশ্নে তাদেরই মতাবলম্বী, তবে ভিন্ন কৌশল ও ভিন্ন ভাবধারা প্রয়োগ করেন।

যখন তারা দ্বিতীয় বৃত্তটি ত্যাগ করেন তখন কেবল সাধারণভাবে ধার্মিক লোকদের জন্যে লেখেন– এসব ধার্মিক কোনো গ্রুপ অথবা আন্দোলনের সদস্য হোক বা না হোক।

এখন যেহেতু ইসলামী আন্দোলন একটি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং এর ভিত্তি প্রশস্ত হয়েছে তাই উচিত, তাদের দিকে দৃষ্টি দেয়া যারা আদর্শ ও চিন্তাধারার দিক দিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশ কিংবা আলোর পথ দেখানোর চেষ্টা না করে প্রাচীন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জাহেলিয়াত, ইসলামের প্রতি অবিশ্বাস এবং অপপ্রচারকারীদের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়।

অতএব ইসলামী আন্দোলনের স্ব–আরোপিত বিচ্ছিন্নতা অবসানের এটিই উপযুক্ত সময় যেন আন্দোলন সকল মুসলমানকে এর অংশ বলে মনে করতে পারে এবং প্রথমেই তাদের সঙ্গে সংলাপ শুরু করে দেয়। অতঃপর একদিকে আন্দোলন ও এসব সমমনা মুসলমান এবং অন্যদিকে তাদের বিরোধী এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বী–এ উভয়পক্ষের মধ্যে সংলাপ শুরু করা আবশ্যক। যুক্তিসঙ্গত, ধীরস্থির, তাত্ত্বিক সংলাপে যাদের দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য রয়েছে তারা আগ্রহী হবে, যারা উৎকণ্ঠিত তারা সুস্থির হবে, যারা অনিশ্চয়তার দোলাচলে ঘুরপাক খাচ্ছে তারা আস্থা ফিরে পাবে। এমনকি যারা বিদ্বেষপূর্ণ বৈরিতা পোষণ করে সেই মানসিকতারও অবসান ঘটতে পারে। সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা বলেনঃ আশা করা যায়, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে– যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে– বন্ধুত্ব কায়েম করে দেবেন; আর আল্লাহ সর্বশক্তিমান; আর বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু (সূরা মুমতাহিনা ঃ ৭)।

জর্দানের আম্মানে অনুষ্ঠিত এক সিম্পোজিয়ামের কথা উল্লেখ করতে চাই যেখানে আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'দি ইসলামী এয়োকেনিং এন্ড দি উজ অব দি আরব ওয়ার্ল্ড'।

সিম্পোজিয়ামে মুসলমান, খৃস্টান, কমিউনিস্ট এবং সকল মতের জাতীয়তাবাদীরা অংশগ্রহণ করে। এ সিম্পোজিয়ামের ব্যাপারে আমি কয়েকজন দ্বীনি ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করলে তারা মত দিলেন আমার যাওয়া উচিত নয়। কারণ যথার্থ ইসলামী ধারা অনুসরণ ছাড়া আয়োজিত এ সব সিম্পোজিয়ামে আমার উপস্থিতি তাদের বৈধতা দিতে পারে। কিন্তু আমি এ ধরনের আশঙ্কা এবং নেহাত কাল্পনিক বিষয়ের প্রতি কর্ণপাত করিনি। কারণ এরূপ কল্পনা সরিষায় ভূত দেখার মতো। আমি দাওয়াত গ্রহণ করে সিম্পোজিয়ামে একটি নিবন্ধ পাঠ করি। পরে এটি একটি আলাদা বই হিসেবে প্রকাশিত হয়।

সেখানে আমার এবং ড. হাসান আল তুরাবী, ফাহমী হুবাইদী ও কামাল আল শরীফসহ বেশ কয়েক জন ইসলামী চিন্তাবিদের উপস্থিতিতে মধ্যপন্থী ইসলামী ধারার মাধ্যমে উত্থাপিত ইসলামপন্থীদের মতামত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। উল্লেখ্য, আমি মধ্যপন্থী ইসলামী ধারায় বিশ্বাস করি এবং এর পক্ষে সোচ্চার। সিম্পোজিয়ামে ইসলামপন্থীদের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি ও তাদের বক্তব্যই সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে।

আমি কখনোই ভুলবো না একজন জাতীয়তাবাদী খৃস্টান বক্তার কথা। তিনি আমাকে খাবার টেবিলে বলেছিলেন, আপনার সম্পর্কে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের কী ধারণা ছিল? তিনি জবাব দিলেন, এটিই যে আপনি একজন কট্টরপন্থী, ধর্মান্ধ। আমি বললাম, কোত্থেকে এ ধারণা পেয়েছিলেন? তিনি জবাবে বললেন, জানি না, তবে খোলাখুলি বলতে গেলে আপনার সম্পর্কে এটিই ছিল আমাদের ধারণা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর এখন? তিনি বললেন, এখন দেখেশুনে, আলোচনা করে ও সরাসরি যোগাযোগের ফলে আমরা যা জানতে পারলাম তাতে আপনার সম্পর্কে আমাদের অসঙ্গত ধারণা পুরোপুরি বদলে গেছে। এখন আমরা দেখছি যুক্তির প্রতি আপনি শ্রদ্ধাশীল। আপনার চিন্তাভাবনা যুক্তিনির্ভর। আপনি জানেন কিভাবে অন্যের মতামত শুনতে হয়। কারণ আপনি এমন ব্যক্তি যিনি একগুঁয়ে বা জেদী নন বরং অত্যন্ত নমনীয় ও সহিষ্ণু।

আমি এ ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে এটিই বলতে চাই, সরাসরি যোগাযোগ এবং সমমর্যাদায় অনুষ্ঠিত যুক্তিসঙ্গত ধীরস্থির সংলাপ ইসলামী আন্দোলনের স্বার্থেই দরকার। আন্দোলন এ থেকে লাভবান হবে, হারাবার আদৌ কিছু নেই।

ইসলামপন্থী ও ইসলামপন্থী নন এমন লোকদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সকল সভা সমাবেশ থেকে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি স্বয়ং এ সাক্ষ্য দিচ্ছি। এ ধরনের সর্বশেষ

সিম্পোজিয়ামটি হয়েছিল আলজেরিয়ায়। আলোচ্য বিষয় ছিল 'ইস্যুস অব দি ইসলামিক ফিউচার'।

অতএব আমরা বলতে পারি, আগামী পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের শ্লোগান হওয়া উচিত 'অন্যদের সঙ্গে সংলাপ স্বাগতম'। অন্যদের বলতে আমি বুঝি, যারা ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য, কর্মপন্থা, দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ এমনকি ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে দ্বিমত পোষণ করে। ভিন্নমত পোষণকারী সকলের সঙ্গে সংলাপকে আন্দোলনের স্বাগত জানানো উচিত। আর যাদের সঙ্গে ইতোমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে তা অব্যাহত রাখতে হবে।

আন্দোলনের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণকারী সকল ইসলামী শক্তির সমর্থন আদায়েও সচেষ্ট হওয়া উচিত। যেসব গ্রুপ বা ব্যক্তিবর্গের বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক প্রভাব রয়েছে তাদের সমর্থনও আন্দোলনকে অর্জন করতে হবে। যারা আমাদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে আল-কোরআন তাদের সাথে সংলাপের আদেশ দিয়েছে। তাদের ব্যাপারে কোনো আশা নেই এমন মনে করা এবং তাদের থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন মনে না করারও তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ আপনি আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করুন জ্ঞানগর্ভ কথা ও উত্তম উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করুন (সূরা নাহ্‌লঃ ১২৫)।

আল-কোরআন যা করতে বলে তা হচ্ছে সর্বোত্তম উপায়ে, সর্বোত্তম কৌশলে, যুক্তিতর্ক ও সংলাপ চালাতে যেন মনে বিশ্বাস ও হৃদয়ে জাগরণ নিশ্চিত করা যায়। এ আয়াতে কোরআনের ভাব প্রকাশের এক বিস্ময়কর নিদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। আল-কোরআনের দৃষ্টিতে দাওয়াতি কাজ উত্তমরূপে করতে হবে কিন্তু সেই যুক্তি ও আলোচনাই কেবল গ্রহণযোগ্য হতে পারে যা সর্বোত্তম পন্থায় উপস্থাপন করা হয়। কারণ দাওয়াত সাধারণত তাকেই দেয়া হয় যে ইতোমধ্যে একমত হয়েছে আর যুক্তি তার কাছেই উত্থাপন করতে হয় যে একমত পোষণ করে না। সুতরাং যে কোনো অবস্থায় সর্বোত্তম পন্থায় দাওয়াত বা যুক্তি উপস্থাপন করাই সঙ্গত।

সেক্যুলারপন্থীদের সঙ্গে সংলাপ

আবশ্যকীয় সংলাপের মধ্যে সেক্যুলারপন্থীদের সঙ্গে সংলাপও অন্তর্ভুক্ত। সে সব সেক্যুলারপন্থী যারা যুক্তিবাদী, মোটামুটি ভালো মানুষ, ইসলামপন্থীদের কথা শুনতে ইচ্ছুক এবং তাদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি বুঝতে চেষ্টা করে।

এসব সেক্যুলারপন্থী মূলত মুসলমান। অনেকে তো মুসলিম পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। কেউ কেউ মুসলিম আচার অনুষ্ঠান পালন করে, নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, সম্ভবত হজ্ব, ওমরাহ করে থাকে। কিন্তু তাদের সমস্যা হচ্ছে অনেক সংস্কৃতিবান ব্যক্তির মতোই তারা ইসলামকে কখনো সঠিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করে না। এর কারণ, তারা কখনোই মৌলিক বা বিশুদ্ধ সূত্র থেকে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের কিংবা কোনো নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত ও চিন্তাশীল লোকের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পায়নি। বরং তারা প্রাচ্যবিশারদ অথবা খৃস্টান মিশনারী, তাদের শিষ্য-সাগরেদদের কাছ থেকে ধর্মের ধারণা লাভ করেছে। কিংবা মুসলমানদের বর্তমান চরম দৈন্যদশা থেকে অথবা চরমপন্থী বা ইসলামের অনুসারী হিসেবে দাবিদার বিপথগামী লোকদের কাছ থেকে শুনে বা পড়ে ইসলাম সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করে নিয়েছে।

যাহোক তাদের লালন পালন, শিক্ষা দীক্ষা ও জীবনযাত্রা তাদেরকে কখনো নির্ভেজাল বিশুদ্ধ ইসলামকে জানার সুযোগ দেয়নি। ভ্রান্ত ধারণা, ভুল প্রয়োগ ও অপব্যবহারসহ এ পীড়াদায়ক অতীত ও বর্তমান ইসলামের ক্ষতি করেছে।

শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে যাওয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যের পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান অন্ধকার পরিস্থিতি ইসলাম, ইসলামী শরীয়াহ ও জীবনপদ্ধতিকে ভুল বোঝার জন্যে সেক্যুলারপন্থীদের কাছে একটি অজুহাত হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। ফলে তারা বিশ্বাস করে, বর্তমান উভয় সঙ্কট থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে অগ্রগতি অর্জন করার জন্যে পাশ্চাত্যের পথ ধরতে হবে। কারণ ধর্ম, ধর্মীয় রীতিনীতি ও যাজক সম্প্রদায় থেকে মুক্ত হয়ে পাশ্চাত্য কেবল বিজ্ঞানের বাহন ধরে আবিষ্কার, উদ্ভাবন, উৎপাদন, নির্মাণ-সৃজনের পথে যাত্রা শুরু করে মানুষের সুখ সমৃদ্ধির জন্যে প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্ত করেছে।

আমরা ১৯৮৫ সালের গ্রীষ্মকালে কায়রোতে ফিজিশিয়ানস এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে দার আল হিকমায় সেক্যুলারপন্থীদের সঙ্গে ঐতিহাসিক সংলাপ শুরু করি। এতে ইসলামপন্থীদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলাম আমি ও শায়খ মোহাম্মাদ আল গাজালী। আর তাদের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন ডা. ফুয়াদ জাকারিয়া।

সাংবাদিক ও চিন্তাশীল মহল সিম্পোজিয়ামকে উষ্ণ স্বাগত জানায়। কারণ এতে একই আবাসভূমিতে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সংলাপের গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে।

ফাহমী হুবাইদীসহ বহু লেখক এ মিটিংয়ে কতিপয় ভালো দিক তুলে ধরেন। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে প্রত্যেক পক্ষ সরাসরি অপর পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করেন। অবশ্য আমি এ সভার একটি ক্রটি লক্ষ্য করেছি। সেটি হচ্ছে, ইসলাম ও সেক্যুলারপন্থীদের মধ্যে সংলাপের পরিবর্তে সিম্পোজিয়াম বিতর্ক সভায় রূপ নেয়।

বিতর্ক উত্তেজনার সৃষ্টি করে, বিশেষ করে সেখানে যদি বিপুলসংখ্যক শ্রোতা থাকে। তাছাড়া এ সংলাপে সেক্যুলারপন্থীদের প্রতিনিধি ছিলেন একগুঁয়ে স্বভাবের লোক যার মধ্যে বিন্দুমাত্র নমনীয়তা, সহিষ্ণুতা ও শালীনতা ছিল না। ফলে প্রতিপক্ষের বক্তব্য শোনার মতো মানসিকতা তার ছিল না– যে বক্তব্য শুনে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানতে পারতেন। আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে তার অজ্ঞতা ছিল অগাধ।

তিনি আসলে তার বক্তব্যের দুর্বলতা এবং যুক্তির অসারতা বুঝতে পেরে তার সমর্থক পত্রিকাগুলোতে সাধারণভাবে সকল শ্রোতা, বিশেষভাবে ইসলামপন্থী এবং আমার নাম উল্লেখ করে মারাত্মক বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন এ সমালোচনার জবাবে আমি সামগ্রিক ইস্যু ব্যাখ্যা করি আমার 'ইসলাম এন্ড সেক্যুলারিজমঃ ফেস টু ফেস' বইয়ে।

আমি আবারো বিতর্ক নয়, সংলাপ অনুষ্ঠানের আবেদন জানাচ্ছি। 'বিতর্ক' শব্দটির মধ্যেই একটি চ্যালেঞ্জের সুর এবং জয়ী হওয়ার মানসিকতা রয়েছে। ফলে প্রত্যেক পক্ষই প্রতিপক্ষকে প্রচণ্ডভাবে ঘায়েল করার চেষ্টা চালায়।

আমি মনে করি না এ ধরনের বিতর্কে তেমন লাভ হবে। কারণ, বিতর্কে সম্ভবত কোনো পক্ষই ছাড় দিতে বা স্বীয় অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াতে চাইবে না বরং আরো একগুঁয়ে ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে পারে।

প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জের মুখে ইসলামী পক্ষ যদি বিব্রতবোধ করে তাহলেই তাদের কাছে বিতর্ক গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তখন ইসলামপন্থীদের সংঘাতের ভয়ে পলায়ন এবং রণে ভঙ্গ দেয়ার অভিযোগ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু সংলাপের নীতি হচ্ছে যথাযথ শিষ্টতা পালন, আল-কোরআন যেটাকে বলেছে ঃ সর্বোত্তম পন্থায় যুক্তি প্রদর্শন করো।

শাসকদের সঙ্গে সংলাপ

আরেক ধরনের সংলাপ দরকার, সেটি হচ্ছে বিচক্ষণ যুক্তিবাদী শাসকদের সঙ্গে সংলাপ– যেসব শাসক ভিন্নমতের পক্ষাবলম্বন করে ইসলামের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকা নেয় না। যেসব শাসক ভিন্নমত গ্রহণ করে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাদের সঙ্গে সংলাপ নিরর্থক। কারণ তারা ইসলামের বিলুপ্তি ও সম্পূর্ণ ধ্বংস ছাড়া ভালো কিছু চায় না। কিন্তু আল্লাহ্ বলেন ঃ তারা আল্লাহর নূরকে নিজেদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ্ তা হতে দেবেন না স্বীয় নূরকেই পূর্ণতা দান ব্যতীত যদিও অবিশ্বাসীরা তা ঘৃণা করে (সূরা তাওবা ঃ ৩২)।

তবে আরেক ধরনের শাসক আছে যারা ইসলামকে ঘৃণা করে না কিন্তু ভয় করে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ভয় হচ্ছে ইসলামের বাস্তবতা, ইসলামী শরীয়ত ও দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। এদের অনেককে ক্ষমার চোখে দেখা যায় এ কারণে যে ইসলাম আসলে কী তারা তা জানার সুযোগ পায়নি এবং বিশুদ্ধ সূত্র ও নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারেনি। এ অজ্ঞতার বিচারে তাদেরকে ইতোপূর্বে উল্লিখিত আমাদের সংস্কৃতিবান বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাতারে ফেলা যায়। বিভিন্ন ধ্যানধারণা তাদের মাথায় জট পাকিয়ে ফেলেছে এবং বাস্তব ঘটনা ও কল্পকাহিনী তাদের কাছে একই রকম মনে হয়।

সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার ইচ্ছায় এসব শাসকের কাছে বিভাজন ছাড়া সামগ্রিকভাবে, কোনো বিকৃতি ছাড়া বিশুদ্ধ মত হিসেবে এবং কঠিন ছাড়া সহজ বিষয় হিসেবে প্রকৃত ইসলামের ব্যাখ্যা দিয়ে কল্যাণকর দিকগুলো তুলে ধরতে পারলে তারা বুঝতে পারবে– ইসলামই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের জন্যে কল্যাণকর এবং জাতির নৈতিক বল ও বৈষয়িক সমৃদ্ধির সংরক্ষণে ইসলাম সব অশুভ তৎপরতা নির্মূল করতে চায়। তারা মুক্তমনে এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে অবশ্যই তাদের মধ্যে পরিবর্তন আসবে এবং ইসলাম ও দাওয়াতের প্রতি অংশত অথবা সামগ্রিকভাবে এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে। কেননা শাসকরা আমাদেরই মতো মানুষ। তাই তাদের মধ্যেও পরিবর্তন আসতে পারে, প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে, উপলব্ধি ঘটতে পারে–এমনভাবে যা শেষ পর্যন্ত তাদের আদর্শ ও আচরণেও পরিবর্তন আনতে পারে।

ইতিহাস এমন শাসকদের দৃষ্টান্তে ভরপুর, সত্যিকার আলেম ও পণ্ডিতদের প্রভাবে যাদের মনমানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। অনেক শাসক তাদের মতলববাজ মন্ত্রণাদাতার মিথ্যা হুঁশিয়ারির প্রভাবে অথবা বিদেশী 'শয়তানদের' চক্রান্তের শিকার হয়ে ইসলাম সম্পর্কে একটি শঙ্কিত মনোভাব পোষণ করে।

এসব শাসকের হৃদয়ে এখনো যে সুমতি রয়ে গেছে তাকে ভিত্তি করে এবং তাদের ধমনীতে এখনো যে মুসলিম রক্ত প্রবহমান তাকে উজ্জীবিত করে তাদের সংস্পর্শে আসতে হবে। তাদেরকে এ আশ্বাস দিতে হবে যে সাময়িকভাবে হলেও তাদেরকে সিংহাসন বা ক্ষমতায় বহাল রাখা হবে যদি তারা ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার স্বাধীনতা দেন– যে কার্যক্রমের মিশন হচ্ছে যুবকদের নৈতিক মূল্যবোধ, বোধোদয়, নির্মল চরিত্রের আলোকে গড়ে তোলা, তাদেরকে নেশাদ্রব্য, মাদকদ্রব্য ও পতিতাদের হাত থেকে রক্ষা করা এবং শাসক ও শাসিত উভয়ের জন্যে ক্ষতিকর ধ্বংসাত্মক নীতির মোকাবিলা করা।

শাসকদের সঙ্গে এরূপ সন্ধি বা সমঝোতার মধ্যে খারাপ কিছুই নেই। এমনকি আন্দোলন তাদের আচরণ ও অন্যদের সঙ্গে সংশ্রব রাখা পছন্দ না করলেও। কারণ ভারসাম্যের ফিকাহর আলোকে পরিচালিত আন্দোলন বিশ্বাস করে, এ নীতি শাসকদের অবজ্ঞা করা অথবা তাদের প্রতি অব্যাহত শত্রুতা পোষণ করার চেয়ে উত্তম।

এ প্রসঙ্গে আমি একটি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করতে চাই। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি এসব শাসকদের প্রতি কোনোভাবেই তোষামোদি অথবা আন্তরিকতাহীন 'কথার কথা' হওয়া উচিত নয়। সমঝোতা ও কপটতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

পাশ্চাত্যপন্থীদের সঙ্গে সংলাপ

ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সংলাপ আবশ্যক যদিও এ সংলাপের পথে রয়েছে অনেক বাধা বিপত্তি।

আমাদের ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বেশ কিছু তফাৎ রয়েছে। ধর্মের তফাৎ আছে। পাশ্চাত্য মূলত খৃস্টান আর আমরা মুসলমান। ভাবধারার ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্য বস্তুবাদী ও বাস্তববাদী আর আমরা আধ্যাত্মবাদী ও আদর্শবাদী। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তফাৎ আছে। পাশ্চাত্য সাধারণত ইসরাইলের পক্ষে, আমাদের বিপক্ষে। যদিও সামর্থ্য ও অবস্থানের বিচারে পাশ্চাত্যের এক দেশ থেকে আরেক দেশে এ দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য থাকতে পারে।

তা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংলাপ আমরা এড়িয়ে চলতে পারি না। আমরা পছন্দ করি আর না করি, এটি ঠিক যে পাশ্চাত্যই শতাব্দীর পর শতাব্দী বিশ্ব শাসন করে আসছে। বর্তমান বিশ্বে তাদেরই সভ্যতা বিরাজমান। তারা আমাদের বিভিন্ন দেশ শাসন করেছে এবং বিভিন্ন মেয়াদে আমাদের ভূখণ্ড দখল করে রেখেছিল। পরে তারা স্বেচ্ছায় বা ইচ্ছের বিরুদ্ধে দখলকৃত দেশ ছেড়ে গেছে কিন্তু এখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে। তারা আমাদের সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের ওপর কোনো না কোনোভাবে প্রভাব খাটায়। আমাদের শাসকদের মনমানসিকতা ও ইচ্ছার ওপরেও তাদের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

তদুপরি কোনো জনগোষ্ঠীর পক্ষে চারপাশের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস ও নীতি নিয়ে কাল্পনিক জগতে বসবাস করা সম্ভব নয়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে সতত প্রবহমান প্রযুক্তিগত পরিবর্তন একজন লেখকের ভাষায় পৃথিবীকে এক বিশ্ব পল্লীতে পরিণত করেছে।

সুতরাং পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংলাপ আমাদের জন্যে একটি অবশ্য কর্তব্য, যেন আমরা পাশ্চাত্যবাসীকে বোঝাতে পারি আমরা নিজেদের জন্যে এবং অপরের জন্যে কী চাই। কারণ আমরা একটি আদর্শের প্রচারক, লুটেরা নই। কল্যাণের বার্তা বাহক, অমঙ্গলের বাহক নই। শান্তির প্রবক্তা, যুদ্ধবাজ নই। সুবিচার ও ন্যায়ের সমর্থক, অন্যায় অবিচারের মদদদাতা নই।

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বিভ্রান্ত মানবতাকে আল্লাহর পথ প্রদর্শন করা এবং ইহলৌকিক জীবনকে পারলৌকিক জীবনের সঙ্গে, জমিনকে আসমানের সঙ্গে ও মানুষকে মানুষের সঙ্গে যুক্ত করা যেন একজন মানুষ নিজের জন্যে যা পছন্দ করে তা অপরের জন্যেও

পছন্দ করে, নিজের জন্যে যা ঘৃণা করে অপরের জন্যেও তা করে।যেন মানবজাতি সকল জাতির অভিন্ন ব্যাধি, হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারে। এ ব্যাধি মানবতাকে ধর্মশূন্য করে ফেলে।

আমরা জানি পাশ্চাত্য এখনো এক বিষাদঘন প্রেক্ষিত সামনে রেখে আমাদের দিকে দৃষ্টি দেয়, যে প্রেক্ষিত ক্রুসেডের সময় থেকে আমাদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পঙ্কিল করে রেখেছে এবং আজো অধিকাংশ পাশ্চাত্যবাসীর হৃদয়ে এটি বাসা বেঁধে আছে।

ফরাসী দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক গুস্তাভ লা বন সহ পাশ্চাত্যের বহু নিরপেক্ষ চিন্তাবিদ একথা স্বীকার করেছেন। তিনি তার 'দি সিভিলাইজেশন অব আরবস' গ্রন্থের কয়েকটি পাদটিকায় খোলাখুলি একথা বলেছেন। কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত যখন ইসলামী বিষয়ে চর্চা করেন তখন তিনি তার স্বাভাবিক, নিরপেক্ষ চরিত্র হারিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট ও ইসলাম বিরোধী হয়ে ওঠেন। এমনকি সেটি তিনি বুঝতেও পারেন না অথচ এসব পণ্ডিত অন্যান্য ইস্যু স্বাভাবিক ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করেন। সম্প্রতি প্রাচ্যবিশারদ মন্টেগোমারী ওয়াট তার 'হোয়াট ইজ ইসলাম' গ্রন্থে একই কথা বলেছেন।

আমরা আরো দেখি বিভিন্ন সময়ে নানা ক্ষেত্রে এ ক্রুসেড চেতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আগ্রাসী ইসরাইল এবং আগ্রাসনের শিকার ফিলিস্তিনী জনগণের প্রতি পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতেও এ প্রভাব লক্ষণীয়। খৃস্টান লিথুনিয়া এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মুসলিম আজারবাইজানের প্রতি পাশ্চাত্যের মানসিকতায় এ প্রভাব দেখা যায়।

ফরাসী, স্পেনীয় এবং ইতালীয় কর্মকর্তাদের কার্যকলাপের মধ্যেও এ লক্ষণ দেখা যায়। তারা আলজেরিয়ার ইসলামী চেতনা প্রবাহে ভীত হয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত কর্মকাণ্ড চালায়। দক্ষিণ সুদান, ইরিত্রিয়া, কাশ্মীর, ফিলিপাইন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ইস্যুতেও পাশ্চাত্যের এ মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়।

আমরা কতিপয় সামাজিক ইস্যুতেও এ প্রভাব লক্ষ্য করেছি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সালমান রুশদী। যে রুশদী তার খোলস পাল্টে স্বীয় ধর্ম বিশ্বাস ও স্বজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ফ্রান্সে হিজাব ইস্যুতেও এ প্রভাব লক্ষণীয়। কিভাবে একটি দেশ নিজেকে 'স্বাধীনতার প্রসূতি' বলে দাবি করে যখন সে দেশটি কয়েকটি মুসলিম ছাত্রীর শালীনতার খাতিরে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্যে পোশাকের ধর্মীয় বিধি পালনকে বরদাশত করতে পারেনি। স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের ভূমি বলে কথিত দেশটি মেয়েদের একটি নেহায়েত ব্যক্তিগত ব্যাপারেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অধিকার দেয়নি।

দুর্ভাগ্যজনক যে ক্রুসেডের চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিস্থিতি এখনো এমনভাবে বর্তমান যার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। এমন কি তুরস্ক, যে দেশটি প্রায় পৌণে এক শতাব্দী ধরে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে তলোয়ারের মাধ্যমে রক্তপাত ঘটিয়ে মুসলমানদের ওপর পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা সেক্যুলারিজম চাপিয়ে দিয়েছে, সর্বত্র ইসলামী

শরীয়াহ বিতাড়িত করেছে, তারাও ইউরোপীয় কমন মার্কেটের সদস্যপদের জন্যে আবেদন করে পাশ্চাত্যের সমর্থন পায়নি। পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর তুরস্কের আবেদন অগ্রাহ্য হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, তুরস্কের এমন এক সংস্কৃতি রয়েছে যা পাশ্চাত্য থেকে ভিন্ন। তারা মুসলিম সংস্কৃতির ধারক আর আমরা ইহুদী ও খৃস্টান সংস্কৃতির।

এসব সত্ত্বেও আমরা পাশ্চাত্যের ব্যাপারে হতাশ অথবা নিরাশ হতে পারি না। তাদেরকে এ ভেবে ত্যাগও করতে পারি না যে তাদেরকে হয়তো কখনোই সংলাপে আনা যাবে না। যদিও তাদের সভ্যতা থেকে আমাদের সভ্যতা ভিন্ন। কিন্তু দু'টি পক্ষ ছাড়া কি সংলাপ হতে পারে? কাজেই সভ্যতা নিয়েই সংলাপ হতে পারে। বিখ্যাত চিন্তাবিদ রজার গারোদি এভাবেই বিষয়টা উল্লেখ করেছেন। সভ্যতার সংঘাত নয়, চাই সভ্যতার সংলাপ।

তাহলে পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমরা কেন সংলাপ চালাবো না যখন আল-কোরআন আমাদেরকে ভিন্নমত পোষণকারীদের সঙ্গে সংলাপের তাগিদ দিয়েছে। এভাবে সংলাপকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার একটি মাধ্যম বানানো হয়েছে।

তাছাড়া আল-কোরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং তাঁর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি ইবলিসের মধ্যে সংলাপের উল্লেখ রয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ অভিশপ্ত শয়তানের মুখের ওপরেও সংলাপের দরজা বন্ধ করে দেননি। সূরা সাদ-এর ৭১– ৮৫ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ স্মরণ করুন আর যখন আপনার রব ফেরেশতাগণকে বললেন, প্রকৃতই আমি মাটি দ্বারা একজন মানুষ সৃষ্টি করব। অতএব যখন আমি তার সৃষ্টি কার্য সম্পূর্ণ করব এবং তাতে আমার তরফ হতে রূহ ফুঁকে দেব তখন তোমরা সকলে তার সামনে সেজদায় অবনত হও। তারপর ফেরেশতাগণ সকলেই আদমকে সেজদা করল ইবলিস ছাড়া। সে অহঙ্কার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ্ বললেন, হে ইবলিস! যে বস্তু আমি নিজ হাতে গড়েছি তাকে সেজদা করতে তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল। তুমি কি অতি অহঙ্কার করছ নাকি তুমি উচ্চ মর্যাদাবানদের অন্তর্ভূক্ত? ইবলিস বলল, আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বললেন, অতএব এখান থেকে বের হয়ে যাও কেননা নিঃসন্দেহে তুমি বিতাড়িত। আর নিঃসন্দেহে তোমার ওপর আমার লা'নত থাকবে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত। সে বলল, হে আমার প্রভু! আমাকে অবকাশ দিন ঐ দিন পর্যন্ত যেদিন মৃতকে পুনরুত্থান করা হবে। আল্লাহ বললেন, নিশ্চয় তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত। সে বলল, তবে আপনার ইজ্জতের শপথ! আমি অবশ্যই তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব, আপনার নির্বাচিত সেই বান্দাগণ ব্যতীত। আল্লাহ্ বললেন, সত্য হচ্ছে- এবং আমি তো সত্যই বলে থাকি–আমি দোযখ পূর্ণ করব তোমার দ্বারা এবং তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের সকলের দ্বারা।

পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংলাপ একাধিক পর্যায়ে হওয়া উচিত। এ সংলাপ হতে পারে ধর্মীয় , বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজনৈতিক পর্যায়ে।

ধর্মীয় সংলাপ

ইসলাম ও খৃস্টধর্মের মধ্যে বিভিন্ন লক্ষ্য সামনে রেখে ধর্মীয় সংলাপ হতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

১. নাস্তিক্যবাদী ও বস্তুবাদী চিন্তাধারার মোকাবিলা করা। যে চিন্তাধারা ঐশীবাণীর ঘোরতর বিরোধী, গায়েবে বিশ্বাসকে পরিহাস করে, আল্লাহ, তাঁর নবী রাসূল, তাঁর শাস্তি ও নৈতিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে। এ সংলাপ আরো মোকাবিলা করবে অবাধ মেলামেশা, নৈতিক স্খলন যা ওহী প্রদত্ত মহৎ মানবিক বৈশিষ্ট্যকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলেছে।

২. দু'টি ধর্মের মধ্যকার ঐক্যসূত্রগুলো নির্ধারণ করা। আহলে কিতাবদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে কোরআন নির্দেশ করছে ঃ আমরা ঐ কিতাবের প্রতিও ঈমান রাখি যা আমাদের ওপর নাজিল করা হয়েছে এবং যা তোমাদের ওপর নাজিল করা হয়েছে, আর আমাদের ও তোমাদের মাবুদ এক, আর আমরা মুসলমান হিসাবে তো তাঁর আনুগত্য করছি (সূরা আনকাবুতঃ ৪৬)।

৩. অতীতের ক্রুসেড এবং বর্তমান সাম্রাজ্যবাদের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট বৈরী সম্পর্ক স্বাভাবিকিকরণের পাশাপাশি ভ্রাতৃত্ব, মানবতা ও কল্যাণকর মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে সুন্দরতর ও পরিচ্ছন্ন সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করা। এর মধ্যে রয়েছে মুসলমান ও খৃস্টানদের মধ্যে যেসব সংঘর্ষ হয় তাতে চার্চের তরফ থেকে খৃস্টান পক্ষকে সমর্থন দান বন্ধ করা। দক্ষিণ সুদান, ফিলিপাইন এবং অন্যান্য অঞ্চলে এ ধরনের সংঘাত সংঘর্ষ ঘটে। চার্চ তো মুসলমানদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট ও পৌত্তলিকদেরও সমর্থন দেয়।

আমি জানি, অনেক ইসলামপন্থী এ ধরনের সংলাপের ব্যাপারে সন্দেহ প্রবণ। তারা মনে করেন এ সংলাপের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল অদৃশ্য হাত বিশেষ উদ্দেশ্যে তাড়িত হয়ে এটিকে ব্যবহার করে। কারণ তাদের বিশ্বাস সংলাপে মুসলমানরা নিঃসন্দেহে দুর্বল পক্ষ বলে তাদের অজ্ঞাতে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ তাদেরকে ব্যবহার করে। সুতরাং কেউ এরকম সংলাপে অংশগ্রহণ করলে তাকে আহাম্মক অথবা দালাল বলে অভিযুক্ত করা হয়।

আমি মনে করি, এ ধরনের সন্দেহ অমূলক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের সন্দেহ সঠিক হতে পারে। সব ক্ষেত্রে সব সময় নয়। আমরা আমাদের নিজেদের ওপর এতোটা আস্থা হারাবো কেন? আমরা নিজেদেরকে দুর্বল পক্ষ ভাববো কেন? আমরা আমাদের যা কিছু আছে তা নিয়েই তো শক্তিশালী। কেউ সংলাপে অংশ নিলেই সে তার ঈমানের অধিকার

হারিয়েছে এবং অপর পক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে বলে আমরা মনে করব কেন? আসলে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যারা আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবে তাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে এবং সংঘর্ষ বা পলায়নী মনোবৃত্তির চেয়ে সংলাপ শ্রেয়তর এমন বিশ্বাস নিয়েই আমরা সংলাপে যাবো।

বস্তুত সংলাপ প্রচার অভিযানেরই অন্যতম কৌশল যেটি রাসূলুল্লাহ (সা.) সূচনা করেছেন হারকিউলিস, মিসরের প্রধান খৃস্টান আল মুকাওয়াকিস, আবিসিনিয়ার নাজ্জাসী এবং আহলে কিতাবের অন্যান্য শাসকদের কাছে পাঠানো তাঁর ঐতিহাসিক চিঠির মাধ্যমে। এ চিঠিগুলো তিনি এ আয়াত দিয়ে শেষ করেছিলেন ঃ হে আহলে কিতাবীরা আস একটি কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সঠিক, আমরা আল্লাহ্ ব্যতিত আর কারো ইবাদত করব না এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করব না এবং আমাদের মধ্য থেকে কেউ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে প্রভু বলে মেনে নেব না। অতঃপর তারা যদি বিমুখ থাকে, বল সাক্ষী থাক যে আমরা মুসলিম (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪)।

সম্প্রতি এ ধরনের একটি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং যার ফল ইতিবাচক। ওস্তাদ মোহাম্মাদ আল মোবারাক (রা.) আমাদেরকে একথা জানিয়েছেন। এ সংলাপ হয়েছিল রোমে। রাবেতা আল আলম আল ইসলামী এবং ভ্যাটিকানের প্রতিনিধি দলের মধ্যে। রাবেতার প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন সেক্রেটারি জেনারেল শেখ মুহাম্মদ আল হারকান। তার সাথে ছিলেন মারুফ আল দাওয়ালিবি ও মুহাম্মদ আল মোবারাক।

এ সংলাপের ফলে এক পক্ষের কাছে অপর পক্ষের ভাবমর্যাদা উজ্জ্বল হয়। বিশেষ করে ইসলামের ভাবমর্যাদা, যে ইসলাম সম্পর্কে অন্যায় ও বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতা পোষণ করা হতো। কখনো কখনো মুসলিম-খৃস্টান সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এর প্রতিফলন দেখা গেছে।

আরেকটি সংলাপ হয় লিবিয়ায় কয়েকজন মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও চার্চের উর্ধ্বতন সদস্যদের মধ্যে। এরও ভালো ফল পাওয়া গেছে বলে ড. ইজ্জ আল দীন ইব্রাহীম জানিয়েছেন। তিনিও এতে অংশ নিয়েছিলেন। আমি সংলাপে তার পঠিত প্রবন্ধটি পড়েছি। প্রবন্ধটির বক্তব্য খুব যুক্তি নির্ভর ও ভারসাম্যপূর্ণ ছিল। উগ্রতা অথবা উন্নাসিকতার কোনো ছাপ তাতে ছিল না।

বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপ

পাশ্চাত্যের সঙ্গে ধর্মীয় সংলাপের পাশাপাশি আরেকটি পরিপূরক সংলাপ আবশ্যক। সেটি হচ্ছে পাশ্চাত্যবিদ ও প্রাচ্যবিশারদের মধ্যে সংলাপ যারা ইসলাম, কোরআন, রাসূল, ধর্ম বিশ্বাস, ইতিহাস, সংস্কৃতি, জ্ঞান, জনগণ, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কিত বিষয়ে অধ্যয়নে আগ্রহী। বিশেষ করে যেসব পণ্ডিত বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা, আধুনিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলন এবং সমসাময়িক পুনরুভ্যুত্থান সম্পর্কে আগ্রহী, তাদের সঙ্গে সংলাপ জরুরী।

চিন্তাধারার পরিশুদ্ধি, সকল দৃষ্টিভঙ্গি আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানা, দু'পক্ষের মধ্যে পরিবেশ ও সম্পর্ক আরো উন্নত করার পথ প্রশস্ত করার লক্ষ্যে এ সংলাপ প্রয়োজন। যদি যাজক সম্প্রদায় ও চার্চের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপ সম্ভব হয় (যারা তাদের অবস্থান এবং যুগ যুগ ধরে লালিত গভীর বিশ্বাসের ধারক) তাহলে প্রাচ্যবিশারদদের সঙ্গে সংলাপ তো আরো সহজ ও কল্যাণকর হওয়ার কথা। যদিও অনেকে মনে করেন পাশ্চাত্য যাজক সম্প্রদায় এবং পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের মধ্যে অথবা মিশনারী ও প্রাচ্যবিশারদদের মধ্যে কোনো তফাত নেই। তাদের মতে পার্থক্যটা কেবল তাদের পোশাকে। যাজকরা পুরোহিতের আর পাশ্চাত্যবিদ ও প্রাচ্যবিশারদরা পণ্ডিতের পোশাক পরিধান করে, আসলে তারা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

কিন্তু দৃঢ় ইচ্ছা, উদ্দেশ্য সচেতনতা ও পথ পরিষ্কার থাকলে সংলাপ অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও বুদ্ধিজীবী ফোরাম পক্ষপাত ও উস্কানিমুক্ত নির্ধারিত কতকগুলো বিষয়ে গবেষণা শুরুর জন্যে দু'পক্ষের প্রতিনিধিদেরকে একত্রিত করে সংলাপের উদ্যোগ নিতে পারে।

এ ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে যে ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রতি প্রাচ্যবিশারদদের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন নয়। প্রাচ্য পণ্ডিতদের সম্বন্ধে বহু লেখা হয়েছে। যেমন আল আকিকীর বই। আবার তাদের অভিযোগের জবাবে অথবা তাদের পক্ষ সমর্থন করে অনেক লেখালেখি হয়েছে। এসব রচনার শ্রেণী বিভাগ করেও প্রবন্ধ নিবন্ধ লেখা হয়েছে। যেমন ড. মোহাম্মাদ আল বাহাই'র প্রবন্ধ। তিনি আলোচিত বিষয়ের নাম দিয়েছেন 'ওরিয়েন্টালিস্টস এন্ড দেয়ার এটিচিউডস টুওয়ার্ডস ইসলাম'।

আমাকে বলতে হচ্ছে, অধিকাংশ প্রাচ্যবিশারদদের মধ্যে বেশকিছু অভিন্ন দুর্বল দিক রয়েছে।

প্রথমত, প্রাচ্যবিশারদরা আরবি ভাষায় পারদর্শী নয় বলে এর বিভিন্ন ব্যঞ্জনা পুরোপুরি

হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ফলে স্বভাবতই মূল ইসলামী সূত্র বিশেষ করে কোরআন ও সুন্নাহ অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাদের হোঁচট খেতে হয়। সুতরাং ইসলাম ও এর বাণী সম্পর্কে উপলব্ধি হয় অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্যের মন, মানুষ ও সভ্যতা সম্পর্কে প্রাচ্যবিশারদরা এক ধরনের অহমিকায় ভোগে। তারা পাশ্চাত্যকে বিশ্বের প্রভু এবং ইউরোপকে সকল দেশের জননী বলে মনে করে। তাদের ধারণা পাশ্চাত্য থেকেই ইতিহাসের শুরু এবং সেখানেই তার সমাপ্তি ঘটবে।

তৃতীয়ত, তারা এমন সব বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু করে যা পরখ করার মতো বিষয় নয়। কেননা তারা মনে করে কোরআন আল্লাহর প্রেরিত নয় এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রাসূল নন। এভাবে তারা গবেষণা শুরুর আগেই একটি ধারণা তৈরি করে এবং তার ভিত্তিতে গবেষণা চালায় এবং যে কোনো প্রকারে তাদের ধারণাগুলোই প্রমাণ করার চেষ্টা করে। এটি করতে গিয়ে তারা দুর্বল সূত্রের বর্ণনা গ্রহণ করে, মিথ্যাকে বিশ্বাস করে, তিলকে তাল করে, উঁইপোকার ঢিবিকে পাহাড় বানায়, সন্দেহকে প্রমাণ বলে মেনে নেয় এবং তাদের ধারণার বিপরীত সকল বিষয়কে নাকচ করে দেয়। এমনকি তাদের স্বকল্পিত ধারণা তাদেরই মুখে মুষ্ঠাঘাত করলেও।

চতুর্থত, প্রাচ্যবিশারদরা অনেক ক্ষেত্রে মহল বিশেষের ফরমায়েশ অনুযায়ী রাজনৈতিক মতলব হাসিলের লক্ষ্যে তাদের গবেষণা চালিয়ে থাকে। এ গবেষণা কর্মের জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। ফলে এসব গবেষণা পুরোপুরি পক্ষপাতমুক্ত এবং মতলবহীন হয় না।

এতদসত্ত্বেও বহু ক্ষেত্রে এখনো সংলাপ আবশ্যক। মুক্ত চিন্তার অধিকারী মানুষদের সঙ্গে এটি চলতে পারে যাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কেননা বহু লোকই পুরনো মনমানসিকতা পরিহার করে নব নব চিন্তায় প্রভাবিত হচ্ছে।

এ সংলাপ শুরুর উদ্যোগ নেয়ার সময় আমাদেরকে সে সব প্রাচ্যবিশারদদের বেছে নিতে হবে যারা সকল জাতির মধ্যে বেশ নিরপেক্ষ ও নমনীয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন প্রফেসর জেক বেরেক। তাকে কয়েকবার কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

অবশ্য সমসাময়িক প্রাচ্যবিশারদদের অনূদিত গ্রন্থ থেকে মনে হয় আজকের প্রাচ্যবিশারদরা সে দিনের প্রাচ্যবিশারদদের চেয়ে নিরপেক্ষতার অনেক কাছাকাছি এবং অতিরঞ্জন ও উগ্রতা থেকে আরো দূরে অবস্থান নিচ্ছেন। বিশেষ করে মুসলমানরা এখন তাদের বইপত্র পড়ে, তাদের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করে কিংবা তাদের বক্তব্য অপছন্দনীয় হলে খণ্ডন করে। কিন্তু অতীতের প্রাচ্যবিশারদরা লিখতেন তাদের নিজেদেরই জন্যে অর্থাৎ একে অপরের জন্যে। সে কারণে তাদের লেখা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ আলোচ্য বিষয়ের পরিবর্তে বিশেষ প্রতিবেদনের মতো মনে হতো।

রাজনৈতিক সংলাপ

ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপ সম্পন্ন করার পর ইসলামী আন্দোলনকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে আরেকটি সংলাপ চালাতে হবে, তা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের সাথে–সে সব রাজনীতিবিদ যারা রাজনৈতিক মঞ্চে প্রকাশ্যে বা নেপথ্যে ভূমিকা পালন করেন তাদের সাথে।

আমি মনে করি পূর্বোল্লেখিত দু'টি সংলাপ এ গুরুত্বপূর্ণ সংলাপের পথ প্রশস্ত করবে। চার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও রাষ্ট্রের কাণ্ডারীদের ওপর এখনো যথেষ্ট প্রভাব রাখে এবং পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইসলাম ও মুসলমান সংক্রান্ত বিষয়ে পর্দার অন্তরালে কলকাঠি নাড়ে।

প্রাচ্যবিশারদরা দৃশ্যত তাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিত হলেও গোয়েন্দা বিভাগ, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা ও পররাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ অনস্বীকার্য।

অনেকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপের যে কোনো উদ্যোগের ব্যাপারে সন্দেহের বীজ বপনের চেষ্টা করেন। অনেকে আবার প্রাচীন পাশ্চাত্য কবির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'ইস্ট ইজ ইস্ট, ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট, দে নেভার মিট' (প্রাচ্য প্রাচ্যই, পাশ্চাত্য পাশ্চাত্যই, তারা কখনও মিলিত হয় না)। কিন্তু আমরা দেখেছি পাশ্চাত্য ভারত, জাপান এবং অতি সম্প্রতি চীনের সাথেও মিলিত হয়েছে।

অন্যেরা বলেন পাশ্চাত্য ভারত, জাপান, চীন অথবা হিন্দু, বৌদ্ধ, কমিউনিস্টদের সাথে মিলিত হতে পারে কিন্তু মুসলমানদের সাথে নয়। তারা এ প্রসঙ্গে মিশনারী, প্রাচ্যবিশারদ ও পশ্চিমী রাজনীতিবিদদের ঘোরতর ইসলাম বিদ্বেষী উক্তি থেকে উদ্ধৃতিও দিয়ে থাকেন।

আবার এমন লোকও আছেন যারা পাশ্চাত্যের সঙ্গে কেউ যোগাযোগ বা কোনো সংলাপ আয়োজনের চেষ্টা করলে তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখেন। এরূপ উদ্যোক্তাদের কলঙ্কিত করার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, দালালী, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি অভিযোগ সব সময় প্রস্তুত করে রাখেন। কেউ ভুলতে পারে না মি. ইভান্সের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে আমাদের বিশ্বস্ত ভাই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দ্বিতীয় মুর্শিদ আল আম হাসান আল হুদায়বীকে কী দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। মিসরীয় বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ এ যোগাযোগের কথা জানতেন, এর প্রতি সমর্থনও দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা এ যোগাযোগকে হুদায়বীর বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। ইভান্সের সাথে এ যোগাযোগকে ব্যবহার করে তারা হুদায়বী, ইসলামী আন্দোলন, আন্দোলনের লোকজন ও নীতির ভাবমর্যাদায় কলঙ্ক লেপন করেন।

এসব বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে আন্দোলনের শত্রুরা এর ক্ষতি করার জন্যে এ ধরনের যোগাযোগকে কাজে লাগাতে না পারে। আমাকে এখানে বলতেই হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে অস্বাভাবিক ধরনের ভীতি ও বিদ্বেষ এখনো সাধারণত পশ্চিমা রাজনীতিবিদদের আচরণকে প্রভাবিত করে। ইয়ারমুক ও আজনাদিনের যুদ্ধ, ক্রুসেড এবং আরব ও ওসমানী বিজয় এখনো তাদের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে আছে। খালিদ বিন ওয়ালিদ, তারিক ইবনে জিয়াদ, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও কনস্ট্যান্টিনোপল বিজেতা মোহাম্মাদ আল ফাতিহর মতো নাম এখনো তাদের ঘুম নষ্ট করে দেয়।

কিন্তু আমাদেরকে এরূপ অস্বাভাবিক মানসিকতা থেকে উদ্ভূত ভীতির শিকার হওয়া উচিত নয়। আমাদের সকল মনস্তাত্ত্বিক বেড়াজাল ভেঙে নতুন ও পুরানো সকল মানসিক জটিলতা ঝেড়ে ফেলতে হবে।

গত কয়েক শতাব্দী ধরে যুদ্ধ, বিরোধ ও রক্তপাতে ইউরোপ ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও এ মহাদেশের দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে একদেশে পরিণত হবে।

মার্কিনী ও সোভিয়েতরা তাদের উত্তপ্ত ও শীতল যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলেছে। তাহলে মুসলমানদের সঙ্গে সমঝোতা হতে পারে না কেন?

এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের যুক্তি সুবিদিত। স্থায়ী বন্ধুত্ব বা স্থায়ী শত্রুতা বলে কিছু নেই। আছে কেবল স্থায়ী স্বার্থ।

আমাদের ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার নীতির আলোকে সংলাপ শুরু করতে আমাদের আপত্তি নেই। আমি মনে করি, কোটি কোটি মুসলমানের বৈরিতা এড়ানো এবং তাদের আস্থা, বন্ধুত্ব ও সম্মান অর্জনের মধ্যেই পাশ্চাত্যের স্বার্থ নিহিত। এর বিনিময়ে আমরা পাশ্চাত্যের চোখে আমাদের ভাবমর্যাদা উন্নত করতে চাইব যাতে তিক্ত সংঘাতের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে পুঞ্জীভূত ধারণা পরিবর্তন করা যায়, যে ধারণা অতিরঞ্জিত ও কল্পকাহিনী মুক্ত ছিল না।

আমরা অস্বীকার করছি না, আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা তাদের চিন্তাধারা অথবা আচার আচরণের মাধ্যমে ইসলামের সর্বোত্তম ভাবমর্যাদা তুলে ধরছেন না। তারা এমনভাবে ইসলামের ভাবমর্যাদা তুলে ধরেন যেন ইসলাম সহিংসতা, ধর্মান্ধতা ও অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং স্বাধীনতা, মানবাধিকার বিশেষত সংখ্যালঘু ও নারী অধিকারের প্রতি তাচ্ছিল্যকে প্রশ্রয় দেয়। বহু মুসলিম দেশে বিরাজমান প্রকৃত অবস্থা এ ধরনের ভাবমর্যাদা গড়তে সহায়ক হয়েছে যেটিকে ইসলাম ও ইসলামী আইনের পরিণতি বলে ধরে নেয়া হয়।

এ ধরনের মারাত্মক বিভ্রম আপনা-আপনি বিলীন বা রাতারাতি দূর হতে পারে না। বরং সদিচ্ছা ও দীর্ঘস্থায়ী সংলাপের মাধ্যমেই দূর করা যেতে পারে। যে সংলাপের ভিত্তি হবে খোলা মন ও স্পষ্টবাদিতা, কূটকৌশল ও ছলনা নয়। অবশ্য রাজনীতিতে এরূপ সংলাপের আশা করা যায় না, কিন্তু অসম্ভব নয়। কারণ অধুনা রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

আমরা পাশ্চাত্য নেতৃবৃন্দ এবং যাদের রাজনীতিতে প্রভাব আছে তাদেরকে যদি নিশ্চিত করে বোঝাতে পারি যে ইসলামের আকীদা, বিশ্বাস, শরীয়াহ, মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড নিয়ে আমাদের জীবন যাপনের অধিকার আছে, যেখানে পাশ্চাত্যের প্রতি কোনো অসৎ উদ্দেশ্য বা তাদের ক্ষতি করার মানসিকতা পোষণ করা হয় না। এভাবে আমরা আমাদের আবাসভূমির জন্যে কাঙ্ক্ষিত মুসলিম সমাজ কায়েমের লক্ষ্য অর্জনের পথে অনেক দূর এগিয়ে যাব।

কোনো সন্দেহ নেই যে এ লক্ষ্য অর্জনের প্রথম বাধা হচ্ছে আমাদের শাসকরা যারা আমাদেরকে সতর্ক পর্যবেক্ষণে রেখেছেন, আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর খবরদারি করছেন এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিধান হিসেবে ইসলাম কায়েমের যে কোনো প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করছেন।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে পরাক্রমশালী পাশ্চাত্য ও তার নেতৃবৃন্দ আমাদের শাসকদের ওপর প্রভাব খাটায়, তাদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে সাবধান করে দেয়। তাদের মনে ইসলামপন্থীদের সম্পর্কে ভীতি সৃষ্টি করে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কৌশল, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে সংশয়ী করে তোলে।

সুতরাং একটি পথ নির্দেশক ও বৃহৎ শক্তি হিসেবে ইসলামের অভ্যুদয়ের আবশ্যকতা পাশ্চাত্যকে ব্যাখ্যা করতে পারলে সম্ভবত তা আরব ও মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বোঝানোও সম্ভব। আর এটিই হবে একটি বড় সাফল্য।

সরকারী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

ইসলামী আন্দোলনকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সমর্থন আদায়ের জন্যে কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মিসরের আল আজহার, তিউনিসিয়ার আল জায়তুনাহ, মরক্কোর আল কারাভিন এবং উপ-মহাদেশের দেওবন্দ।

আন্দোলনকে তার অপরিহার্য পরিকল্পনায় একটি বড় উদ্দেশ্য অর্জনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। তা হলো সরকারী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিজেদের আদর্শ ও জনশক্তি নিয়ে ঢুকে পড়তে হবে এবং তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে। আন্দোলন যদি এ প্রচেষ্টায় সফল হয়, তাহলে নিম্নোক্ত বিষয়সহ তাৎপর্যপূর্ণ ফল লাভ করা যাবে ঃ

১. আন্দোলন সে সব প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে চলতে সক্ষম হবে মুসলিম জনতার মধ্যে যাদের এখনো সমর্থন রয়েছে । এসব সদস্য বিশেষ করে শাসকদের সেবাদাসরা সত্য-মিথ্যা নানা অভিযোগ তুলে অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত মানুষের চোখে আন্দোলনের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করার সামর্থ্য এখনো রাখে।

   তাদের এসব অভিযোগ আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করে এবং আন্দোলনকে আত্মপক্ষ সমর্থন ও অসত্য অভিযোগ খণ্ডন করার প্রচেষ্টায় অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। সুতরাং এদের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে চলতে পারলে, যারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর দ্বীনের আলো নিভিয়ে ফেলতে চায়, ইসলামের সে সব প্রকৃত শত্রুর মোকাবিলায় আন্দোলন নির্বিঘ্নে প্রয়াস চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

২. এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে সংস্কারের সুযোগ সৃষ্টি হবে যাতে সংস্কারের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠান ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের মৌলিক ও আবশ্যিক দায়িত্ব পালন করতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠান এমনভাবে ইসলামের সামগ্রিক, প্রকৃত ও অবিকৃত রূপ তুলে ধরবে যেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান জালেম শাসক, কমিউনিজম ও খৃস্টানদের কবলমুক্ত হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি হয়ে উঠবে ইসলামের শত্রুদের চক্রান্তের মোকাবিলায় ইসলামী দাওয়াতের এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। সরকারী ধর্মীয় এসব প্রতিষ্ঠান যদি সংস্কার করা যায় তাহলে এমন কিছু লোক তৈরি হবে যারা কেবল সরকারী দায়িত্ব পালনই নয় দাওয়াত ও দ্বীনের সেবায়ও আত্মনিয়োগ করবে ।

৩. ইসলামের প্রধান প্রধান স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাদেরকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে সরকারী ধর্মীয় এসব প্রতিষ্ঠানের উপায় উপকরণ কাজে লাগানো সম্ভব হবে। ইসলামের প্রধান স্বার্থের মধ্যে রয়েছে

সারা বিশ্বের মুসলমানদের সমস্যাবলী, ইসলামী ভাবাদর্শ ও মুসলিম ভূখণ্ডের প্রতি মুসলিম জনতার কর্তব্য। সেই সাথে জ্ঞান, কার্যক্রম, শিক্ষা ও মুসলিম ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে ইসলামী সাংস্কৃতিক উত্থানের রূপায়ণে আন্দোলনের কর্মকাণ্ড।

ইসলামের শত্রুদের চক্রান্ত এবং আভ্যন্তরীণ মোনাফেকদের মদদে যে অশুভ ধারা গোপনে ও প্রকাশ্যে উম্মাহর মধ্যে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে তার মোকাবিলায়ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপায় উপকরণ কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

জনপ্রিয় ইসলামী আন্দোলন ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এরূপ সহযোগিতা ও সংহতির ফলে ইসলামী দাওয়াত এবং এর মহতী সাংস্কৃতিক প্রয়াসের প্রতি জনসমর্থন আরও প্রসারিত হবে।

৪. যেসব সরকার জীবন ও সমাজের চালিকাশক্তি হিসেবে ইসলামী আইনকানুন পরিহারে যে অজুহাত খাড়া করার চেষ্টা করে তা খণ্ডন করা সম্ভব হবে। সরকার এসব সরকারী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কোনো কোনো দুর্বল ও বিভ্রান্তিকর ফতোয়াকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে।

আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলনের দাবি ও প্রচেষ্টার বৈধ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা, যে রাষ্ট্রটি আল্লাহর প্রেরিত আইনে পরিচালিত হয় এবং সকল মানুষের জন্যে পথপ্রদর্শন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামকে একটি মৌলবিশ্বাস, একটি জীবনব্যবস্থা ও একটি বাণী হিসেবে গ্রহণ করে।

ইমাম হাসান আল বান্না সব সময় আল আজহারের পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে আগ্রহ পোষণ করতেন। তাদের মধ্যে অনেকে তার বন্ধু ছিলেন। একবার তান্তায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু মনীষী উপস্থিত ছিলেন, যেখানে আমি ইমাম হাসান আল বান্নাকে বলতে শুনেছি– আপনারা, আলেমরা হচ্ছেন ইসলামের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী আর আমরা আপনাদের পেছনে আছি রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে।

স্বাভাবিকভাবে এ কথা সে সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যেগুলো ইহকালের সুখ সম্ভোগের বিনিময়ে দ্বীনকে বিক্রি করে দিয়েছে, স্বৈরশাসকদের মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে, অত্যাচারী শাসকদের হাতের তলোয়ারে পরিণত হয়েছে–যে তলোয়ার প্রকৃত ইসলামপন্থীদের আঘাত হানার জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা বা নিষ্কৃতি দিলে চলবে না, বরং জনগণের সামনে এগুলোর মুখোশ খুলে ফেলতে হবে যাতে জনগণ এসব প্রতিষ্ঠানের অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে পারে এবং তারা কারা তা জানতে পারে।

যারা স্বৈরশাসকদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে এবং যারা স্বৈরশাসকদের ঘৃণা করে, কিন্তু দুর্বলতা ও ভীতির দরুন তাদের প্রতিহত করতে সাহস পায় না, এ দু'য়ের

মধ্যে আমাদেরকে পার্থক্য করতে হবে। কারণ যারা দুর্বল তারা এতোদূর ভীত যে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করে এবং ন্যায্য কথাও উচ্চারণ করতে ভয় পায়। কিন্তু অন্যায় কথাবার্তার সঙ্গেও নিজেদেরকে জড়িত করে না। সুতরাং এ অস্বাভাবিক অবস্থা বিবেচনা করে দুর্বলতা ও ভয়ভীতি কাটিয়ে উঠতে তাদের সাহায্য করা উচিত।

ইরানে শাহের বিরুদ্ধে বিপ্লবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। জাফরী ভাবাদর্শের নির্দেশনা মাফিক জনগণের নিরঙ্কুশ আনুগত্যের দাবি অনুযায়ী বিপ্লব বিপুল সাড়া ও সহযোগিতা পেয়েছিল। এ ছাড়া জনগণ শায়খ ও আয়াতুল্লাহদের আহ্বানে বিপ্লবের জন্যে জানমাল কুরবানী করতে সব সময় প্রস্তুত ছিল।

এ বিপ্লবে জনগণের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত তহবিলও সহায়ক হয়েছিল। জাফরী ফিকাহ অনুযায়ী দানের পরিমাণ হচ্ছে খুমুস অর্থাৎ এক পঞ্চমাংশ যা মোট আয়ের ওপর নির্ধারিত হয়। এ পরিমাণ দান সামগ্রী 'অনুপস্থিত ইমামের' প্রতিনিধিত্বকারী আলেমদের হাতে তুলে দেয়া হয়।

এভাবে ইরানের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সরকারের দয়ার পাত্র ছিলেন না। যদি তা হতো তাহলে সরকারই তাদের বেতন ভাতা দিতো তাদের ও তাদের পরিবারবর্গের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতো। তাদেরকে ইচ্ছামতো নিয়োগ দেয়ার এবং বরখাস্ত করার ক্ষমতাও থাকতো সরকারেরই হাতে।

সুতরাং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কারের অন্যতম অপরিহার্য নীতি হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠান তাত্ত্বিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং দখলকৃত ওয়াকফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করে উপযুক্ত খাতে এগুলো ব্যবহারের স্বাধীনতাও থাকবে যেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তাদের নির্দিষ্ট ক্ষমতা ফিরে পায়। ইমাম হাসান আল বসরীর এমন ক্ষমতার গোপন রহস্য সম্পর্কে কোনো এক শাসক বলেছিলেন, তার ধর্ম আমাদের দরকার কিন্তু আমাদের অর্থের তার প্রয়োজন নেই।

এটিই হচ্ছে আসল সমস্যা যখন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রের কর্মকর্তা বনে যান, অথচ রাষ্ট্রের ধর্মের কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু রাষ্ট্রের অর্থ তাদের দরকার।

ইসলামী পুনর্জাগরণ

দুনিয়ার বুকে ইসলাম কায়েম এবং ইসলামী দাওয়াতের বিরোধী সকল আগ্রাসী শক্তিকে রুখে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনকে সকল ইসলামী গ্রুপ এবং সকল ইসলামী পুনর্জাগরণ গ্রুপকে এক মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ ফ্রন্ট সংলাপের যথার্থ পন্থা নির্ধারণ এবং বিরোধী পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকভাবে মোকাবিলার জন্যে অবশ্যই সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে যেন যে ব্যাপারে আমরা একমত পোষণ করি সে ব্যাপারে সহযোগিতার এবং যে বাপারে মতভেদ রয়েছে সে ব্যাপারে সহনশীল হওয়ার ভিত রচনা করতে পারি।

ইমাম হাসান আল বান্না মিসরের ইসলামী গ্রুপগুলোর মতানৈক্য অবসানে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালান এবং একমত হওয়া যেতে পারে এমন নূন্যতম কর্মসূচি হিসেবে বিখ্যাত বিশ দফা প্রণয়ন করেন।

প্রধান প্রধান লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী আন্দোলনের সব সময় এটিই করা উচিত। কেননা ইসলামী অঙ্গনে কর্মরত সকল গ্রুপের সম্মিলিত শক্তিই কেবল ইসলামী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে পারে। আমি এখানে গুরুত্ব ও নিষ্ঠার সাথে আন্দোলনকারী ইসলামী গ্রুপের কথাই বোঝাচ্ছি। সে সব তুচ্ছ অথবা বিপথগামী গ্রুপ নয় কিংবা ইসলামের নামে ভাওতাবাজি করে এমন গ্রুপ নয়।

কোনো ইসলামী গ্রুপ যদি মনে করে তারা একাই এ সময়ে ইসলামী শাসন কায়েম এবং আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও বৈদেশিক চক্রান্ত মোকাবিলায় সক্ষম তবে মারাত্মক ভুল করবে।

সকল ইসলামী গ্রুপ ও আন্দোলনের প্রকৃতপক্ষে যা করা উচিত তা হচ্ছে একটি শক্তিশালী ইসলামী জোট গঠনের লক্ষ্যে তাদের সকল প্রচেষ্টা সংহত করা এবং মতানৈক্যের অবসান ঘটানো যেন এ জোট ইসলামের মিত্রদের সহায়তা এবং শত্রুদের প্রতিরোধ করতে পারে।

আমি যেটি সবচেয়ে বেশি ভয় করি সেটি হচ্ছে স্বার্থপরতা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের চেতনাকে ক্ষুণ্ন করে। প্রত্যেক গ্রুপ নিজেকে বড় করে দেখায় এবং অন্যকে অসমর্থ প্রমাণে উঠে পড়ে লাগে–এত দূর পর্যন্ত যে নিজ দলকে সমগ্র জোটের একটি শক্তিশালী অংশ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা না করে অন্যকে ধ্বংসের লক্ষ্যে সকল তৎপরতা কেন্দ্রীভূত করে।

আমি আরো ভয় করি সেই সঙ্কীর্ণতা যা ইসলামী গ্রুপগুলোকে গ্রাস করে এবং তাদের চিন্তাচেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের দ্বন্দ্ব সংঘাতগুলোকে বড় করে দেখায়, উঁইপোকার ঢিবি দিয়ে পাহাড় বানায়, গৌণ বিষয়কে মৌলনীতিতে পরিণত করে, ইজতিহাদের বিষয়কে শরীয়াহর মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত করে, যেমনটি করেছিলেন 'দি রাইট অপিনিয়ন অন দি কনট্রাডিকশন বিটুইন মেম্বারশীপ অব পার্লামেন্ট এন্ড তাওহীদ' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক।

যে শক্তিশালী ইসলামী শাসন উম্মাহর ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারে এবং আমাদের পার্থিব জীবনকে উন্নততর করতে পারে সেটি কায়েমের জন্যে নানা মত-পথ-নীতি নির্বিশেষে সকল ইসলামী গ্রুপ ও শক্তির সম্মিলিত উদ্যোগ চাই। এর পাশাপাশি সে সব ধর্মপরায়ণ ও উৎসাহী ব্যক্তি যারা কোনো গ্রুপ ও সংগঠনের সদস্য নন তাদেরকেও এ প্রচেষ্টায় শামিল করতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি, ইসলামী আন্দোলন যদি এ লক্ষ্য অর্জনে সকল ইসলামী শক্তির প্রচেষ্টাকে এক মঞ্চে সমন্বিত করতে সক্ষম হয় যেখানে সকলেই মনে করবে এ রাষ্ট্র তাদেরই রাষ্ট্র, এ শাসন তাদেরই শাসন, এর বিজয় তাদেরই বিজয়, এর পরাজয় তাদেরই পরাজয়– তাহলেই আন্দোলনের সাফল্য সুনিশ্চিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার
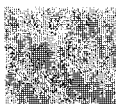
যা না বললেই নয়

বইয়ের শেষপ্রান্তে এসে আমি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করতে চাই ইসলামী আন্দোলনকে ভবিষ্যত প্রশ্নে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে হবে। যে দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আন্দোলন বৈধ উপায়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। এরূপ পরিকল্পনা আধুনিক ধ্যান ধারণা, নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে বিভক্তি এবং তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রণয়ন করতে হবে। এ পরিকল্পনা নমনীয়, সহজে সম্পাদন ও বাস্তবায়নযোগ্য হতে হবে। এর সকল দায়িত্বভার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে এবং কোনো ব্যক্তি নির্ভর হওয়া উচিত নয়। কেননা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল হলে তারা যতক্ষণ সক্রিয় থাকবে, পরিকল্পনাও ততোক্ষণ।

প্রামাণিক তথ্য, প্রকৃত পরিসংখ্যান, বিস্তৃত পর্যালোচনা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাপ্ত ও সম্ভাব্য সকল বৈষয়িক ও মানবিক সম্পদ, ভেতর ও বাইরের সকল মনস্তাত্ত্বিক এবং বস্তুগত বাধাসমূহের অবমূল্যায়ন ও অতিরঞ্জন ব্যতিরেকেই ব্যাপক গবেষণার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।[১]

জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের যোগ্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত টীমকে দিয়েই এরূপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তার দক্ষতা ও মেধা এ টীমে নিয়োজিত করবেন। এ টীম তাদের বিবেচনা মতো অন্য যে কোনো যোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকেও মতামত অথবা তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারে।

পরিকল্পনা প্রণয়নের আগে ও পরে তিনটি দিকের ওপর মনোযোগ দেয়া আবশ্যক– সার্বক্ষণিক কাজ, বিশেষজ্ঞদের যোগ্যতা এবং তথ্য ও গবেষণা। এ তিনটি দিক নিয়ে আমরা উপসংহারে বিস্তারিত আলোচনা করব।

সার্বক্ষণিক কাজ

আন্দোলনের ভবিষ্যত পরিকল্পনায় সকল কৌশলগত ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, তথ্য, গণমাধ্যম, রাজনীতি ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অবশ্যই বেশ কিছু যোগ্য ব্যক্তিকে সার্বক্ষণিক কাজে নিয়োগ করা উচিত।

আন্দোলনের কেবল খণ্ডকালীন স্বেচ্ছাসেবী লোকদের কাজের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। কারণ এসব লোককে তাদের ব্যক্তিগত কাজেই অধিকাংশ সময় ব্যয় করতে হয়

১. আলোচ্য পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন আমার বই 'দি ইসলামিক সলিউশন ঃ এ ফারদা এন্ড এ নেসেসিটি'। তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে এই আলোচনা করা হয়েছে।

বলে যে সামান্য সময় তারা আন্দোলনকে দেয় তাতে বড় ধরনের কোনো দায়িত্ব সম্পাদনের আশা করা যায় না। অবশ্য যেসব স্বেচ্ছাসেবক আল্লাহর ওয়াস্তে সামান্য সময়ও ব্যয় করেন তাকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। বরং তাদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপকভাবে ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। কেননা স্বেচ্ছাসেবীরাই আন্দোলনের সম্প্রসারণশীল ভিত্তি রচনা করে। দাওয়াতি কার্যক্রমের স্বার্থে সার্বক্ষণিক কাজে নিয়োজিত কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া আন্দোলনের সকল সদস্যই বিনা বেতনে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী।

দাওয়াতি কাজ ও আন্দোলনের গতিপ্রবাহের চাপের মুখে ইমাম হাসান আল বান্না তার সম্পূর্ণ সময় ও প্রচেষ্টা আন্দোলনের কাজে লাগাতে বাধ্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আন্দোলনের মধ্যে থেকেও বেশ কয়েক বছর শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন।

একাধিক দেশে আন্দোলনের বহু সদস্য ও নেতৃবৃন্দ এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা অথবা স্বাধীন ব্যবসায়ী বা বণিক ছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে ভালো প্রচেষ্টা সেটিই হতে পারে যখন ব্যক্তি আন্দোলনের সেবায় এবং এর উদ্দেশ্য অর্জনে সার্বক্ষণিক কাজে নিয়োজিত হয়।

অবশ্য সার্বক্ষণিক কর্মী নিয়োগের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরাই দায়িত্ব পায়। তারা একে অপরের পরিপূরক হবে। এভাবে কাজের সকল ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞের দক্ষতা কাজে লাগাতে হবে। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্র বাদ দিয়ে কেবল কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞায়নের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে সঠিক ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও কোনো ব্যয় হবে না।

এক্ষেত্রে অর্থকড়ি কোনো সমস্যা হওয়া উচিত নয়। কারণ এ খাতে অর্থ ব্যয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি সর্বোত্তম উপায়। এজন্যে প্রয়োজনীয় তহবিল যাকাত, সাদকা, ওয়াকফ এবং অনুরূপ অন্যান্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

স্থানীয় ও বিদেশী ব্যাংকে গচ্ছিত পুঁজি থেকে অর্জিত সুদও এ উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যায়। এ সুদ হারাম সূত্র থেকে অর্জিত হয় বলে এ অর্থ ব্যবহারে আমাদের কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। কারণ এটি হারাম কেবল পুঁজির আমানতকারীর ক্ষেত্রে। কিন্তু ইসলামের স্বার্থে এটি ব্যয় করা হালাল। আর সর্বাগ্রে ইসলামী আন্দোলনের সার্বক্ষণিক কর্মীদের জন্যে এ অর্থ ব্যয় করা যায়।

অন্যান্য স্থানে সমপর্যায়ের কাজের সমান পর্যাপ্ত বেতন নেয়ার ব্যাপারে নিষ্ঠাবান কর্মীদের অনাগ্রহী হওয়া উচিত নয় এজন্যে যে তারা যেন সন্তুষ্টি সহকারে আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। আর কম বেতনের কারণে তাদের মধ্যে যেন অসন্তুষ্টি না থাকে। না খুব বেশি, না খুব কম পারিশ্রমিকই ন্যায্য বেতন বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

তবে কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব ছাড়া উপযুক্ত গুণ বৈশিষ্ট্য যাচাই করে সঠিক স্থানে সঠিক ব্যক্তিকে বসানো প্রয়োজন। যোগ্যতা ও সততা লোক বাছাইয়ের একমাত্র মানদণ্ড হওয়া

উচিত। এ প্রসঙ্গে আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ নিশ্চয়ই আপনার কর্মচারী হিসেবে সেই ব্যক্তি উত্তম যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত (সূরা কাসাস ঃ ২৬)।

বিশেষজ্ঞদের যোগ্যতা

জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে প্রচেষ্টা জোরদার করা উচিত। আমরা এখন বিশেষজ্ঞায়নের যুগে বাস করছি, যার বিশেষজ্ঞরা যথার্থই বিশেষজ্ঞ। আমরা সেই যুগে বাস করছি না যখন জ্ঞানতাপস প্রতিভাধর ব্যক্তিরা জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় মতামত প্রকাশ করতেন। কেবল বুদ্ধিই যথেষ্ট নয়, না বুদ্ধির দীপ্তি, না প্রতিভা।

প্রয়োজন হচ্ছে বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা যা সময়ের সাথে তাল মিলাতে সক্ষম হবে, চাহিদা মিটাতে পারবে এবং নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনে উৎকর্ষতার স্বাক্ষর রাখবে। সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর মধ্যে নৈপূণ্য নিহীত রেখেছেন।[১] এবং আল্লাহতায়ালা খুশি হন যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে।[২]

আমাদের যুগে কেবল বিশেষজ্ঞায়নের মাধ্যমে উৎকর্ষতা সম্ভব। একটি ওয়াজিবকে পূর্ণতা দান করার জন্য যে পদক্ষেপ নেয়া হয় তাও ওয়াজিব।

উদাহরণস্বরূপ গণসংযোগ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহুমুখী বিশেষজ্ঞায়নের কথাই ধরুন। একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করা একটি বিজ্ঞান, আবার তাকে চিত্রনাট্যরূপ দেয়াও বিজ্ঞান, এটির পরিচালনাও বিজ্ঞান। একইভাবে এতে অভিনয় করা ও এর বিপণন করাও বিজ্ঞান। এভাবে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত বিশেষায়িত জ্ঞানের একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করা সম্ভব।

রেডিওর জন্যে অনুষ্ঠান নির্দেশনা এক ধরনের কাজ। টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্দেশনা আরেক ধরনের। আবার মঞ্চ নির্দেশনা ও সিনেমা পরিচালনা দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। আজকে গণমাধ্যমের কাজ এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সকল শিল্পকলার সম্মিলন ঘটেছে। দক্ষতার সাথে এসব বিষয় শেখার জন্যে বহু ইনস্টিটিউট ও কলেজ রয়েছে যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা উচ্চতর ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা লাভ করছে।

জ্ঞানের এসব শাখার ইসলামীকরণ কখনোই সম্ভব হবে না যদি আমরা বিশেষজ্ঞদের সাহায্য না নেই। কেবল তারাই এ ক্ষেত্রের জন্যে ইসলামী বিকল্প হতে পারেন।

ইসলামী আন্দোলন মেধায় সমৃদ্ধ। কিন্তু এর মেধাবী জনবল উপযুক্ত ক্ষেত্র ও অবস্থানে যথার্থভাবে নিয়োগ করা হয় না। আমরা প্রায়ই মেডিসিন, ফার্মাকোলজি অথবা

১. আন নাওয়াস ইবন সামানের সূত্রে মুসলিম-এ বর্ণিত।
২. হযরত আয়েশার (র.) সূত্রে আল বায়হাকীতে বর্ণিত।

ইঞ্জিনিয়ারিং এর মতো কতিপয় ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের জটলা দেখি। কিন্তু বিজ্ঞানের বিরল শাখাগুলোতে ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সংখ্যা খুবই কম।

এ অবস্থা মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গণসংযোগের মতো মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সাধারণত তরুণরা এসব বিষয়কে অবজ্ঞা করে ফলিত বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অথচ এসব বিজ্ঞান সমাজের জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং তা সমাজকে প্রভাবিত করে। এ জন্যই যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের ইহুদীরা এক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপন করে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে নিয়েছে যেন তারা তাদের মর্জি মাফিক স্বীয় স্বার্থে এসব পরিচালনা করতে পারে।

বহু বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ মানবিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য সাধনায় যোগ্য ও আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক চাপের দরুন ফলিত বিজ্ঞান নিয়ে অধ্যয়নে বাধ্য হয় অথচ তার সামর্থ্য ও আগ্রহ যেদিকে সেখানে তার মেধা ব্যবহার করতে পারলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অধিকতর ফল লাভ করা সম্ভব হতো।

বস্তুত মানবিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব ও এর গুরুতর প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এ শাখায় মুসলমানদের ঘাটতি খুবই প্রকট। এমন কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ছোটগল্প, সাহিত্য সমালোচনা ইত্যাদিতেও ঘাটতি উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে দীপ্তিমান কোনো তরুণের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এদের মধ্যে কেউ কেউ সাহিত্যচর্চা করলেও অন্যদের মতো প্রয়োজনীয় প্রচার সুবিধা পায় না অথচ বামপন্থীসহ অন্যরা এক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

তথ্য ও গবেষণা

সমসাময়িককালে ইসলামী আন্দোলনের একটি অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা হচ্ছে একটি ডাটা ব্যাংক অথবা তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন যা এ যুগের তথ্য বিপ্লবের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের এ কেন্দ্রে নিয়োগ দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালার দিক নির্দেশনা হচ্ছে ঃ আর তোমাকে সর্বজ্ঞ আল্লাহর ন্যায় কেউই অবহিত করতে পারবে না (সূরা ফাতির ঃ ১৪)। সেই সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা মোতাবেক অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জাম ও জনবল দিয়ে এ কেন্দ্রকে সুসজ্জিত করতে হবে।

তথ্য সংগ্রহের সূত্র ও উপায়, তথ্য সংরক্ষণ, শ্রেণীবিন্যাস ও পুনরুদ্ধারের উপায়ও বহুমুখী হয়েছে। আমরা এসব উপায় উপকরণ ব্যবহারের কোনো পদক্ষেপ নিয়েছি কি?

শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে অন্যদের ব্যাপার বাদ দিলেও নিজেদের সম্পর্কিত অর্ধেক তথ্যও আমাদের জানা নেই। অথচ শত্রুরা আমাদের ব্যাপারে সকল খবর রাখে।

কয়েকজন আরব ভাই যারা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উপর কাজ করছিলেন তাদের সাথে আমি ইস্তাম্বুলে যাই। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তুর্কমেন প্রজাতন্ত্র থেকে আগত

কয়েকজন ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে– লৌহযবনিকার অন্তরালে আটকে থাকা তুর্কমেনিস্তান ও অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের আপনাদের ভাইদের জন্য আপনাদের সাহায্য এখন কোথায়, যারা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে সক্ষম? তাদের এখন ধর্মীয়, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ সকল প্রকার সাহায্য ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞান দরকার। কোথায় সেই সাহায্য ও বিশেষজ্ঞ? কে তাদেরকে সাহায্য দেবে?

গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রয়কার কার্যফল পাওয়ার সাথে সাথে খৃস্টান ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের কাছে সকল তথ্য, উপাত্ত, পরিসংখ্যান এবং চিহ্নসম্বলিত মানচিত্র তৈরি ছিল। ফলে সঙ্গে সঙ্গে বাইবেল ও অন্যান্য বইপত্র বিতরণ করা এবং সর্বত্র মিশনারীদের পাঠানো হয়। তখন থেকে এ স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ২০০০ গীর্জা নতুন স্থানে নির্মাণ অথবা পুনর্নির্মাণ বা ধ্বংসনাুখ গীর্জাগুলোকে আবার নতুন করে সাজানো হয়। গির্জা ও তাদের লোকজন এখনো সেখানে এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাহলে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে ইসলামী কাজ কোথায়?

আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা আমাদের সেখানকার ভাইদের সম্পর্কে কী জানেন? তাদের সংখ্যা, তাদের দেশ, ইতিহাস, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি এবং তাদের চাহিদা কী? আমি জানতে পারলাম, তাদের সম্পর্কে আমরা সামান্যই জ্ঞান রাখি এবং এমন একটি ইসলামী প্রতিষ্ঠানের কথাও জানি না যার কাছে তাদের সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও প্রামাণ্য তথ্যাদি আছে যা কাজে লাগানো যেতে পারে।

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনকে যুগোপযোগী ধারায় গড়ে তুলতে হবে। এজন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং লক্ষ্য অর্জনে আন্দোলনের আশপাশের মুসলমানদের সকল শক্তির সমাবেশ ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আসুন আমরা এ প্রার্থনা করি ঃ

হে আল্লাহ, আমাদের আজকের দিনটিকে গতকালের চেয়ে ভালো করুন এবং আগামীকালকে আজকের দিনটির চেয়েও ভালো করুন। আমাদের সকল কাজে আপনার রহমত বর্ষণ করুন। আমীন!

পরিশিষ্ট ঃ ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া

১. অন্যায় অবিচার ও দুষ্টের দমনে সরকারী পদ গ্রহণ

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে (রা.) এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি সরকারী পদ গ্রহণ করে কয়েকটি জায়গীরের দায়িত্ব লাভ করেছিল, যার প্রজাবৃন্দ সরকারের নিয়মানুযায়ী আরোপিত কর পরিশোধ করতে বাধ্য ছিল। ঐ ব্যক্তি তার সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে জনগণের কাঁধ থেকে অন্যায় অবিচারের সব বোঝা তুলে নিতে নিয়োজিত হলো এটি বিবেচনা করে যে সে যদি পদত্যাগ করে, তবুও অবিচার তো থেকে যাবে, যদি এর চেয়ে খারাপ নাও হয়। যদি লোকটি অর্ধেক খাজনা মওকুফ করে প্রজাদের বোঝা লাঘব করতে পারে এবং বাকি অর্ধেক আদায় করে জনগণের কল্যাণেই ব্যয় করতে পারে তাহলে যতোটা সম্ভব অবিচার লাঘব করার এ নিয়তের কারণে তার কি সরকারী পদে বহাল থাকা উচিত, নাকি অবিচার দূর হবে না বরং তার পদত্যাগের কারণে বাড়তে পারে এটি জেনেও অন্যের হাতে জায়গীর তুলে দিয়ে তার পদত্যাগ করা উচিত? সে যদি সরকারী পদ আঁকড়ে থাকে তবে কি তার গুনাহ হবে? যদি তা না হয়, তবে তাকে তার পদে বহাল থাকতে বলা সঠিক হবে কি? তার জন্যে কোনটি উত্তম হবে–অবিচার দূর করার প্রচেষ্টায় পদে বহাল থাকা নাকি পদত্যাগ করে অবিচার অব্যাহত রাখা এবং বাড়তে দেয়া? প্রজারা তাদের ওপর থেকে জুলুম অবসানের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার দরুন ঐ ব্যক্তির ক্ষমতায় থাকা যদি পছন্দ করে তবে তার কি থাকা উচিত হবে?

ইমাম ইবনে তাইমিয়া উত্তরে বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার। হ্যাঁ, তার ক্ষমতায় থাকা উচিত যদি তিনি সৎ মানুষ হন এবং যতোটা সম্ভব অবিচারের বোঝা দূর করার চেষ্টা চালিয়ে যান। যদি অন্য কোনো ব্যক্তির চেয়ে তার থাকা উত্তম হয় এবং যদি অন্যের কাছে জায়গীর তুলে দেয়ার চেয়ে তার নিয়ন্ত্রণে থাকাই অধিক কল্যাণকর বলে বিবেচিত হয়। তিনি সরকারী পদে থাকতে পারেন এবং এরূপ করলে তার গুনাহ হবে না। যদি এর চেয়ে ভালো কোনো কর্তব্য তার না থাকে তবে এ পদ ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে বহাল থাকাই অধিক উত্তম।

অন্য কেউ যদি না থাকে তবে এ ধরনের লোকের জন্যে এ পদে থাকাই কর্তব্য। কারণ সম্ভাব্য সকল পন্থায় সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং এ অবিচারের মূলোৎপাটন একটি সামষ্টিক কর্তব্য। নিজেকে সক্ষম মনে করলে এবং অন্য কেউ না থাকলে যে কোনো ব্যক্তিরই এ কর্তব্য পালন করা উচিত। কিন্তু যে ব্যক্তি দায়িত্ব নেবে তাকে এমন কোনো অবিচার দূর করার জন্যে চাপ দেয়া উচিত নয় যেটা তার আয়ত্তের মধ্যে থাকে না।

জায়গীরের প্রজাদের ওপর শাসকরা যে কর ধার্য করেন তা প্রত্যাহারের জন্যে ঐ ব্যক্তির কাছে আবদার জানানো উচিত নয় যা তার ক্ষমতার মধ্যে নাও থাকতে পারে। এছাড়া শাসক ও তাদের প্রতিনিধিরা যে তহবিল দাবি করেন, খাজনা সংগৃহীত না হলে তা কিন্তু পরিশোধ করা যাবে না। আর ঐ ব্যক্তি যদি এ দাবি না মেটান তাহলে তারা অন্য কাউকে জায়গীরের দায়িত্ব দিয়ে দেবে। তখন সে ব্যক্তি অত্যাচার অবিচার চালিয়ে যাবে অথবা এর মাত্রা বৃদ্ধি করবে। সুতরাং শাসকদের সকল খাজনা আদায়ের সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে কিছু কিছু খাজনা দিয়ে দেয়া অনেক ভালো। কারণ ঐ ব্যক্তি যদি যথাসম্ভব ন্যায়পরায়ণ হওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে তিনি অন্যদের তুলনায় উত্তম এমনকি তিনি দুষ্ট ব্যক্তিদের অন্যায় থেকে বাঁচার জন্যে তাদের কিছু দাবি পূরণও করেন। ঐ ব্যক্তি যদি নিজে জুলুম না করে মুসলমানদের কাছ থেকে কর আদায় করেন তবে পুরস্কৃত হবেন এবং উপরোক্ত পরিস্থিতিতে তিনি যদি কর আদায়ও করেন তবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। তিনি যদি সুবিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন তবে তাকে দুনিয়ায় কিংবা আখেরাতে সাজা দেয়া হবে না।

ঐ ব্যক্তি এতিমদের অভিভাবক, ওয়াকফের ট্রাস্টি, বাণিজ্যের অংশীদার অথবা সেই ব্যক্তির মতো যিনি অন্যদের পক্ষ থেকে অথবা অন্যদের বদলে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সেই ব্যক্তির মতো যিনি গ্রাহকদের পক্ষ থেকে তাদের মূলধনের একটি অংশ একজন জালেম শাসককে দিয়ে দেন যদি সেটিই গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষার একমাত্র উপায় হয়। সে ক্ষেত্রে ঐ লোকটি সঠিক কাজটিই করবেন, ভুল নয়। তিনি শাসকদেরকে যা দিচ্ছেন তাতো রিয়েল এস্টেট ও সেলস ট্যাক্সের মতোই যা খাজনা সংগ্রাহকদেরকে দিতে হয়। কেননা যে কোনো লোক এসব দেশে নিজের জন্যে অথবা অন্যদের পক্ষ থেকে এ লেনদেন করেন, তাকে এসব কর আদায় করে কর্তৃপক্ষকে দিতে হয়। তিনি যদি কর আদায় না করেন তাহলে এ কর ছাড়া তার অধীনস্থদের স্বার্থও রক্ষা করতে পারবেন না। ফলে তার অধীনস্থদের এমনকি খোদ নিজের স্বার্থও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অনেকে মনে করেন প্রজাদের ওপর সামান্য একটু অবিচার মেনে না নেয়ার জন্যে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেয়া উচিত নয়। জনগণ যদি এ মত মেনে নেয় তাহলে অবিচার ও দুর্নীতি নিশ্চিত বেড়ে যাবে। কারণ তাদের অবস্থা হবে সেই মুসাফিরদের মতো যারা দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। মুসাফিররা যদি দস্যুদের কিছু অর্থ দিয়ে শান্ত না করে তাহলে দস্যুরা তাদেরকে হত্যা করে সব অর্থকড়ি লুট করে নেবে। কেউ যদি মুসাফিরদেরকে বলে, দস্যুদেরকে তোমাদের অর্থ দেয়া অন্যায়, এর অর্থ হচ্ছে সে তাদেরকে এ সামান্য অর্থ ডাকাতদের হাতে তুলে না দেয়ারই পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু তারা যদি এ পরামর্শ মোতাবেক কাজ করে তাহলে তারা কেবল এ সামান্য পরিমাণ নয় বরং সমস্ত অর্থ কড়ি হারাবে। ধর্ম তো দূরের কথা, কোনো বিবেক বোধসম্পন্ন মানুষই এ ধরনের পরামর্শ দিতে পারে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা তাঁর রাসূল (সা.) কে পাঠিয়েছেন যথাসম্ভব মানুষের কল্যাণ বিধান, দুষ্টের দমন ও তা উৎপাটনের জন্যে।

জালেম শাসকের অধীনে সরকারী পদ গ্রহণকারী সৎ ব্যক্তি যদি যথাসম্ভব কম খাজনা আদায় করে বড় ধরনের ক্ষতি থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে নিতে পারে, আর এ লোক যদি সরকারী পদ ছেড়ে দেয় তাহলে অন্য কিছু তো করতে পারবেই না বরং তার জায়গায় অন্য লোক এসে জনগণের কাছ থেকে সব খাজনাই আদায় করে নেবে। আর কোনো ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারবে না। সুতরাং নেক নিয়তে সরকারী পদ গ্রহণকারী ব্যক্তি তার কাজের জন্যে পুরস্কৃত হবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে এজন্যে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

এ ধরনের লোক এতিমের অভিভাবক ও ওয়াকফের ট্রাস্টির মতো যারা সরকারের অন্যায়ভাবে আরোপিত কর পরিশোধ করেও তাদের কর্তব্য পালন করে। যদি তা না করে দায়িত্ব ছেড়ে দেয় তাহলে এমন একজন সে স্থানে আসবে যে অবিচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে। সুতরাং সৎ ব্যক্তিদের সরকারী পদে বহাল থাকা অনুমোদনযোগ্য এবং জালেম শাসককে এ ধরনের কর প্রদান করলে তাদের কোনো গুনাহ হবে না। বরং তাদের পদে থাকাই এমন একটি কর্তব্য যা পালন করা উচিত।

এ নীতি কোনো জায়গীরে খাজনা আদায়ের জন্যে নিযুক্ত সৈনিকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সে জনগণের কাছ থেকে কম খাজনা আদায় করলেও সবটাই সরকারকে দেয় না। কেননা এ অর্থ থেকেই তাকে অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব ও অন্যান্য জিনিসপত্র ক্রয় করতে বলা হয়েছে। একজন সুসজ্জিত সৈনিক যুদ্ধেও মুসলমানদের সেবার ভালো সুযোগ পায়। কেউ যদি তাকে বলে যে তার খাজনা আদায়ের কোনো অধিকার নেই এবং তার এ জায়গীর ত্যাগ করা উচিত, সে ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত বলে থাকে। কেননা তার জায়গীরদারী ত্যাগের ফলে এমন এক ব্যক্তি তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে যে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে এবং মুসলমানদের কল্যাণে কিছুই করবে না। এমনকি তুর্কী ও আরব সৈন্যদের উপস্থিতিও উত্তম। কারণ তারা অন্য সৈন্যদের চেয়ে ভালো। জনগণের প্রতি সুবিচারে আগ্রহী এবং যথাসম্ভব অবিচার অনাচার নিরসনে তৎপর। এ সৈনিক মুসলমানদের জন্যে ভালো। সুতরাং সে স্থলে অন্যকে জায়গীর ছেড়ে দেয়া কম উপকারী এবং অধিক অবিচারপূর্ণ হতে পারে।

এ ধরনের যে কোনো ন্যায়পরায়ণ ও জনকল্যাণকামী কর্মকর্তা ও কর্মচারীই তাদের উত্তম কর্মের জন্যে পুরস্কৃত হবে এবং তাদের ক্ষমতার বাইরে কোনো ভালো কাজ করতে না পারার জন্যে তাদেরকে সাজা দেয়া হবে না। সুতরাং তারা যা সংগ্রহ করে ও ব্যয় করে সেজন্যে তাদের কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করা হবে না যদি তারা অন্য কিছু নাও করতে পারে। কেননা তারা যদি খাজনা আদায় না করে এবং জনকল্যাণে তা ব্যয় না করে তাহলে বৃহত্তর ক্ষতির কারণ হতে পারে।[১]

১. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার 'ফতোয়া', ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৬-৩৬০।

২. একই পরিস্থিতিতে ভালো ও মন্দের সংঘাত

ভালো ও মন্দের সংঘাত সম্পর্কিত একটি অধ্যায়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন– যেহেতু এটি প্রমাণিত যে ভালো বিষয় কল্যাণ বয়ে আনে, সেহেতু ভালো কাজ না করা অন্যায় বলে বিবেচিত আর অন্যায় হচ্ছে ক্ষতিকর। একটি অবাঞ্ছিত বিষয়ের মধ্যেও কিছু কল্যাণ থাকতে পারে। আবার দু'টি ভালো কাজ একত্রে সম্পন্ন করা না গেলে অধিকতর ভালো কাজটি আগে করা উচিত। দু'টি মন্দ বিষয় এড়ানো সম্ভব না হলে, কম মন্দটি গ্রহণ করা যেতে পারে। আবার একটি ভালো ও একটি মন্দ, যা হয় একত্রে গ্রহণ করা দরকার নয়তো পরিত্যাগ করা দরকার–এমন পরিস্থিতিতে বৃহত্তর কল্যাণের কথা বিবেচনা করে গ্রহণ অথবা বর্জন করতে হবে। অর্থাৎ ভালো বিষয়টিতে বেশি উপকার থাকলে সেটি গ্রহণ করতে হবে অথবা মন্দ বিষয়টি গ্রহণ করতে হবে যদি বড় ধরনের ক্ষতি এড়ানো যেতে পারে।

প্রথম ধরনের সংঘাতটি হচ্ছে কর্তব্য (ওয়াজিব) ও পছন্দনীয় (মুস্তাহাব) কাজের মধ্যে বিরোধের মতো। যেমন সাদকার চেয়ে ঋণ পরিশোধকে অগ্রাধিকার দেয়া। কিংবা সকল মুসলমানের জন্যে বাধ্যতামূলক ফরজ কাজ এবং সকল মুসলমানের পক্ষে যে কোনো মুসলমানের করণীয় ফরজ দায়িত্ব পালনের মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিরোধটি হচ্ছে জিহাদে অর্থ ব্যয়ের পরিবর্তে কারো স্ত্রী ও পরিবারের জন্যে অর্থ ব্যয়কে অগ্রাধিকার দেয়ার মতো সংঘাতপূর্ণ বিষয়। এখানে জিহাদ ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতার বিষয় নয়। আবার জিহাদের চেয়ে পিতামাতাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে সহীহ হাদিসে বলা হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন কাজটি অধিক উত্তম। তিনি বলেন, যথাসময়ে নামাজ পড়া, অতঃপর পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা, তারপর আল্লাহর পথে জিহাদ।

আবার জিহাদ হজ্বের ওপর অগ্রাধিকার পাবে যখন তা ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতার পর্যায়ে পড়ে যদিও হজ্ব একটি ফরজ কাজ। এমনিভাবে দু'টি জায়েজ কাজের মধ্যেও কোরআন সুন্নাহর আলোকে একইভাবে অগ্রাধিকার নির্ণয় করতে হবে।

আল্লাহর জিকিরের চেয়ে কোরআন পাঠ অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য যদি দু'টির ক্ষেত্রে সমানভাবে হৃৎপিণ্ড ও জিহ্বার ব্যবহার হয়। আবার এ দু'টির ওপরে নামাজ অগ্রাধিকার পাবে যদি নামাজে হৃদয়ের সংমিশ্রণ থাকে। অন্যথায় কোরআন তেলাওয়াতের পরিবর্তে জিকিরকে প্রাধান্য দিতে হবে যদি সে তেলাওয়াতে মনের সংশ্রব না থাকে। অবশ্য এটি ফিকাহর বিস্তৃত আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়।

তৃতীয় ধরনের সংঘাত হচ্ছে কোনো মহিলার মাহরম ছাড়া একটি সফর এবং দারুল হরবে অবস্থানের মতো বিরোধ। যেমন হযরত উম্মে কুলসুম দারুল হরবে অবস্থান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয় ঃ হে মুমিনগণ। যখন তোমাদের নিকট মুসলমান নারীগণ হিজরত করে আসে, তখন তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১০)।

জিহাদের ফিকাহতে অসামরিক নারী-শিশুকে হত্যা করা হারাম হলেও তারা কোনো ধরনের যুদ্ধে জড়িত হলে প্রয়োজনবোধে তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে। যেমন ক্ষেপণাস্ত্র জাতীয় অস্ত্র ব্যবহার করে অথবা নৈশ অভিযানে। সুন্নাহতে এ প্রসঙ্গে তায়েফের অবরোধে আঘাত হানা এবং ক্ষেপণাস্ত্র জাতীয় অস্ত্র দিয়ে পাথর নিক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া মুসলিম দেশে বসবাসকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে নৈশ অভিযানের কথাও বর্ণিত হয়েছে। এ রায়ের লক্ষ্য হচ্ছে ফিতনা এড়ানোর জন্যে এর সাথে জড়িতদের হত্যা করা, অন্যথায় যাদেরকে হত্যা করা যায় না।

ফকিহদের বর্ণিত তাতাররুসের[১] ইস্যুটিও অনুরূপ। কাফেররা বিদ্রোহের যে বীজ বপন করে তার বিরুদ্ধে লড়াই হচ্ছে জিহাদ। অপেক্ষাকৃত কম অশুভ দিক স্বীকার করেও এ যুদ্ধ করতে হয়। সুতরাং ফকিহরা একমত যে ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত অংশগ্রহণকারীদের হত্যা করার মাধ্যমেই যদি মুসলমানদের ক্ষতি এড়ানো যায় সে ক্ষেত্রে তাদের হত্যা করা যেতে পারে। অবশ্য এ ব্যাপারে দ্বিমতও রয়েছে।

আরেক ধরনের বিরোধ হচ্ছে যখন কোনো মুসলমানকে চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করতে হয়। এক্ষেত্রে এ খারাপ কাজটির মাধ্যমেই কেবল জীবন রক্ষার মতো একটি ভালো কাজ হতে পারে। ঠিক এরকমই আরেকটি বিষয় হচ্ছে, কোনো দূষণীয় ওষুধ সেবন করা যায় কিনা যখন রোগ নিরাময়ের চেয়ে এর ক্ষতিটাই বেশি এবং একারণে যে এর পরিবর্তে অন্য ওষুধ থাকলেও তাতে রোগ নিরাময় অনিশ্চিত। বিষয়টি ওষুধ হিসেবে মদপান করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

একটি অনিষ্টকে দু'টি ক্ষেত্রে বরদাশত করা যায়, যদি এর ফলে গুরুতর অনিষ্টকে এড়ানো যায় যা অন্য কোনোভাবে পরিহার করা সম্ভব নয় এবং যদি এর ফলে এমন কোনো কল্যাণ হয় যা বাদ দেয়া যায় না কিংবা অন্য কোনোভাবে অর্জন করা যায় না। একটি স্বার্থ বা কল্যাণকে দু'টি ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করা যেতে পারে যদি এর ফলে বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষতি হতে পারে অথবা যদি এতে ব্যাপকতর ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এ বিষয়টি ধর্মীয় ভারসাম্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

দুনিয়াবী জিন্দেগীতে কোনো ক্ষতির কারণে কোনো কর্তব্য থেকে অব্যাহতি অথবা পার্থিব জীবনে কোনো কল্যাণের আশায় কোনো নাজায়েজ বিষয়কে মেনে নেয়া–যেমন সফরের কারণে রোযা থেকে অব্যাহতি এবং অসুস্থতার দরুন হজ্বকালে কিছু নিষিদ্ধ কাজের অনুমতি, অসুস্থতার কারণে নামাজের কিছু মৌলিক শর্ত পালনে অব্যাহতি–এসব ব্যাপার ধর্মীয় শিথিলতা এবং কঠোরতা হ্রাসের আওতায় পড়ে। এ বিষয়ে বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যে মতপার্থক্যও থাকতে পারে। কিন্তু পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে মতভেদের কারণ থাকতে পারে না।

১. তাতাররুস সেই পরিস্থিতি যখন শত্রুরা তাদের নিজেদের নারী ও শিশুকে অথবা মুসলিম যুদ্ধবন্দীদেরকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা।

অন্তত সাধারণ বিচারে খুঁটিনাটি ব্যাপারে। সেটিও যুক্তির আলোকে নির্ধারণ করতে হবে। প্রসঙ্গত একটি প্রবাদের কথা উল্লেখ করা যায়– সেই ব্যক্তি বিজ্ঞ নয়, যে বলতে পারে অকল্যাণ থেকে কল্যাণের বিষয় কোনটি বরং সেই ব্যক্তি বিজ্ঞ যে দু'টি ভালো জিনিসের মধ্যে কোনটি বেশি ভালো এবং দু'টি মন্দের মধ্যে কোনটি কম মন্দ একথা বলতে পারে।

যেমন জনগণের কাছে এটি একটি নিশ্চিত সত্য যে খরার মধ্যে বৃষ্টি রহমতস্বরূপ, যদিও এতে স্বৈরশাসকই বেশি ফসল পায়। কিন্তু বৃষ্টি না হলে তো সব মানুষেরই ক্ষতি। জনগণ কোনো শাসক আদৌ না থাকার চেয়ে একজন জালেম শাসক থাকা পছন্দ করে। একজন মনীষী বলেছেন– একটি রাত শাসকবিহীন থাকার চেয়ে ষাট বছর জালেম শাসকের অধীনে থাকা ভালো।

তদুপরি একজন শাসককে তার দ্বারা সংঘটিত অত্যাচার উৎপীড়ন এবং মানুষের যে অধিকার সে খর্ব করে তার জন্য তাকে দায়ী করা যায়। কিন্তু কোনো শাসক বা কোনো কর্মকর্তা যদি তার কর্তব্য পালনে অপারগ হয়, অথচ সকল অবৈধ কাজ থেকে দূরে থাকে, কোনো ভুল কাজ করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে–যখন অন্যরা এসব কাজ ইচ্ছেকৃতভাবেই করে, তখন তাকে সরকারী দায়িত্ব দেয়া উচিত। কেননা সরকারী পদের মধ্যে যদি এ কর্তব্য থাকে যা তাকে সম্পন্ন করতে হবে যেমন শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ, ফায় (যুদ্ধ ছাড়া অর্জিত মালামাল) বন্টন, হুদুদ (ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট) প্রয়োগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। এ পদ তো পূরণ করতে হবে। অন্যথায় এ পদ তো তাকেই দেয়া হবে যে এর যোগ্য নয় এবং ঐ কর্মকর্তা তা ঠেকাতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে কর্তব্য পালনের জন্যে তার পদক্ষেপ অনিবার্য বলে গণ্য হবে। সুতরাং এর ক্ষতি গ্রহণযোগ্য হবে যদি তা ঐ কর্তব্যের উপকারের চেয়ে কম হয়। তদপুরি সরকারী পদ যদি কোনো অসৎ ব্যক্তি দখল করে থাকে সে ক্ষেত্রে অন্য কেউ এ পদটি গ্রহণ করে অন্যায় অবিচার কমানোর জন্যে এবং বেশিরভাগই বোঝা লাঘব করে সামান্য বোঝা স্বীকার করে, তাহলে নিয়তের কারণে ঐ লোকটির কাজ উত্তম বলে বিবেচিত হবে এবং তার কাজ সমাধা করতে গিয়ে বড় ধরনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে কিছু খারাপ কাজ করে ফেললেও সেটা ভালো কাজ বলে গণ্য হবে।

এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে নিয়ত হচ্ছে নিয়ামক উপাদান। যদি কোনো স্বৈরশাসক কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিতে বলে তখন একজন মধ্যস্থতাকারী অবিচার থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে লোকটির কাছ থেকে অংশ বিশেষ আদায় করে নিষ্ঠুর শাসককে দিয়ে তার রোষ থেকে লোকটিকে বাঁচায়, তাহলে এ মধ্যস্থতাকারী একটি ভালো কাজ করলো। কিন্তু যদি সে স্বৈরাচারীকে মদদ দেয়ার জন্যে কিছু করে তাহলে সে একটি অপকর্ম করবে।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়ত ও আমলের মধ্যে গলদ হতে দেখা যায়। যদি ইচ্ছেকৃতভাবে কোনো অন্যায় করার উদ্দেশ্যে কাজ করা হয় অথবা দায়িত্ব পরিত্যাগ করা হয় তবে নিয়তে গলদ রয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

এছাড়া সরকারী পদ গ্রহণযোগ্য, পছন্দনীয় অথবা অপরিহার্য হলেও যাকে এ পদে নিযুক্ত করা হবে তার জন্যে এর চেয়েও অপরিহার্য বা বাঞ্ছনীয় অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়ও থাকতে পারে। সেটি হচ্ছে তাকে কখনো বাধ্য হয়ে এবং কখনও পছন্দ অনুযায়ী দু'টি ভালো জিনিসের মধ্যে অধিক ভালোটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

হযরত ইউসুফ (আ.) এর মিসরের বাদশাহর কাছ থেকে দেশটির শস্যভাণ্ডারের দায়িত্ব চেয়ে নেয়ার বিষয়টি এ শ্রেণীকরণের মধ্যে পড়ে। অথচ বাদশাহ ও তার কওম কাফের ছিল। আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ আর নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট এর আগে ইউসুফ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আগমন করেছিলেন, কিন্তু তোমরা সে সব বিষয়ে সর্বদাই সন্দেহ পোষণ করতে যা তিনি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন (সূরা আল মু'মিন ঃ ৩৪)। হযরত ইউসুফ (আ.) এর বন্দীকালীন ভূমিকা সম্পর্কে আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়। অনেক ও বিভিন্ন উপাস্য কি উত্তম, না এক আল্লাহ, যিনি পরাক্রমাশালী? তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে কেবল কতিপয় অবাস্তব নামের উপাসনা করছ যাদেরকে তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা সাব্যস্ত করে নিয়েছ (সূরা ইউসুফ ঃ ৩৯-৪০)।

যেহেতু তারা কাফের ছিল, তাদের অর্থ আদায়ের এবং তা রাজ দরবার, সৈন্য ও প্রজাদের পেছনে ব্যয়ের ক্ষেত্রে একটি পদ্ধতি ও ঐতিহ্য প্রচলিত ছিল। নবী রাসূলদের কায়দা কানুন ও ইনসাফের সঙ্গে এ পদ্ধতি ও ঐতিহ্যের কোনো সঙ্গতি ছিল না। সুতরাং ইউসুফ (আ.) আল্লাহর বিধান মোতাবেক যা কিছু করতে চেয়েছিলেন তা করতে পারেননি। কিন্তু তিনি যা করতে পেরেছেন সেটি হচ্ছে ইনসাফ ও আমলে সালেহ'র প্রতিষ্ঠা এবং তার ক্ষমতার মাধ্যমে তার পরিবারের ঈমানদারদের জন্যে সুফল অর্জন যেটি তিনি অন্য কোনোভাবে পারতেন না। এসবই আল্লাহতায়ালার এ উক্তির আওতায় পড়ে ঃ অতএব তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাকে যথাসম্ভব ভয় করো (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬)।

যদি দু'টি কর্তব্য একই সাথে এসে পড়ে কিন্তু করা যেতে পারে মাত্র একটি এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যটি বেছে নিতে হয় সে ক্ষেত্রে অন্যটি আর কর্তব্য থাকে না। যে ব্যক্তি এ কাজটি পরিত্যাগ করে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সমাধা করে তাকে দায়িত্ব পালনে গাফেল বলা যাবে না।

একইভাবে যদি দু'টি নিষিদ্ধ কাজ সামনে আসে তবে বড় নিষিদ্ধ কাজটি এড়ানোর জন্যে ক্ষুদ্রতর নিষিদ্ধ কাজটি করতে হয়। সেক্ষেত্রে এ কাজটি আসলে আর নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে না।

তবে উভয় ক্ষেত্রে কাজটি যদি না করা হয় তাহলে প্রথম ক্ষেত্রের কাজটি কর্তব্যে অবহেলা বলে গণ্য হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি নিষিদ্ধ কাজ করা হলো বলে ধরে নেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়, কর্তব্য পরিহারের একটি অজুহাত থাকে আর মন্দ কাজটি করা হয় একটি বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে অথবা প্রয়োজনবশত কিংবা আরেকটি গুরুতর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে।

স্বার্থের সংঘাতের ক্ষেত্রটি অত্যন্ত বিস্তৃত, বিশেষ করে যেখানে সুন্নাহ্ ও খেলাফতের সময় এর দৃষ্টান্ত বিরল। ফলে সংঘাতপূর্ণ বিষয় বড় হয়ে দেখা দেয়। ঐতিহ্যগত দৃষ্টান্ত যত বিরল, সংঘাত ততই ব্যাপক হয়ে উম্মাহর মধ্যে মতবিরোধের কারণ সৃষ্টি করে। যখন ভালো আর মন্দ একটি ধাঁধার মধ্যে পড়ে যায় তখন এমন দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি হয় যে কোনো কোনো লোক ভালো মনে করে অত্যন্ত মন্দ একটি জিনিসকে বেছে নেয়। আবার অনেকে একটি জিনিসকে ক্ষতিকর মনে করে আরেকটি এমন জিনিস বেছে নেয় যাতে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণের আশা নেই। অবশ্য এমন অনেক লোকও আছেন যারা দু'টি দিক নিয়েই গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেন।

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত হবে সতর্কতার সঙ্গে বিষয়গুলো বিবেচনা করা। কারণ আমি ইতোপূর্বেই বলেছি, তাকে হয়তো কোনো কিছু দৃঢ়তার সঙ্গে অনুমতিদান অথবা নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে কোনো কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে নমনীয় হতে হবে। যেমন তাকে হয়তো এমন একটি কাজের আদেশ দিতে হতে পারে যাতে গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা আছে, কিন্তু লঘু ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে এ কাজ করার আদেশ দেয়া চলবে না। উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি একজন দোষী লোককে একজন স্বৈরশাসকের হাতে তুলে দিতে পারে না যে তাকে তার অপরাধের তুলনায় কঠোরতর শাস্তি প্রদান করে অথবা এমন কিছু মন্দ কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যাতে ভালো দিকও জড়িত আছে যে ভালো মন্দকে ছাড়িয়ে যায়। এক্ষেত্রে কারো এরূপ নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত নয় যাতে আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসূল (সা.) যে নির্দেশ দিয়েছেন তা বর্জন করতে হয়। এসব অনিষ্ট বর্জনের চেয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নির্দেশিত কাজ অধিক ফলদায়ক।[১]

১. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার 'ফতোয়া', ২০ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮-৬১।

পরিভাষা

আহলে দিম্মী : আক্ষরিক অর্থে নিরাপত্তা চুক্তির অধীন জনগোষ্ঠী। মুসলিম সরকারের অধীন ইহুদী, খৃস্টান, সাবেয়ী প্রমুখ অমুসলিম নাগরিক যারা জিজিয়া কর প্রদানের মাধ্যমে একটি মুসলিম দেশে জানমালের নিরাপত্তা ভোগ করে।

আহলে কিতাব : আক্ষরিক অর্থে ধর্মগ্রন্থের অনুসারী জনগোষ্ঠী–ইহুদী ও খৃস্টান।

আওকাফ : ধর্মীয় ট্রাস্ট অথবা জনসেবা প্রতিষ্ঠান।

দারুল হরব : যুদ্ধে লিপ্ত ভূখণ্ড। যে দেশে মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

দারুল ইসলাম : ইসলামী রাষ্ট্র। যে ভূখণ্ডে ইসলাম ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত।

ফরজ : অবশ্য কর্তব্য। বাধ্যতামূলক ইবাদত বন্দেগী।

ফতোয়া : আইনগত ইসলামী মত।

ফিকাহ : আক্ষরিক অর্থে জ্ঞানের রূপরেখা। পারিভাষিক অর্থে ইসলামী আইনের শর্তাবলী।

হালাল ও হারাম : যথাক্রমে ইসলামে বৈধ ও অবৈধ বিষয়সমূহ।

হিজরত : মুসলমানদের মদিনায় দেশান্তর।

জাহেলিয়াত : ইসলাম-পূর্ব যুগ এবং ঐ যুগের পৌত্তলিক রীতিনীতি।

জানাবা : নাপাকি, যে কারণে গোসল ফরজ হয়।

জিহাদ : আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম।

মাসালে মুরসালা : জনস্বার্থ।

নাফিলা : নফল, ঐচ্ছিক ইবাদত।

রিবাত : কাফেরদের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা।

সাদাকা : যাকাতের অতিরিক্ত দান খয়রাত।

তাহলিল : কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই উচ্চারণ।

তাকবীর : 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ। অর্থাৎ আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম।

তাকফির : কাউকে কাফের বলে সাব্যস্ত করা।

তাসবীহ : সুবহানাল্লাহ ধ্বনি উচ্চারণ। অর্থাৎ সকল গৌরবের অধিকারী আল্লাহ।

উসূলে ফিকাহ : আইনশাস্ত্রের নীতিমালা।

ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া এন্ড রিসার্চ- এর প্রেসিডেন্ট এবং কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডীন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্নাহ ও সিরাহ স্টাডিজ সেন্টারের পরিচালক। তিনি বাংলাদেশের ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম এর ট্রাস্টি বোর্ডেরও সদস্য।

তার এ পর্যন্ত ৪২ টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি, তুর্কী, ফার্সী, উর্দু, ইন্দোনেশিয়া সহ বিশ্বের অন্যান্য অনেক ভাষায় তার বই অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত এ বইটিসহ মোট নয়টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে 'ইসলামে হালাল-হারামের বিধান', 'ইসলামের যাকাত বিধান', 'ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন', 'ইসলাম ও শিল্পকলা' বই চারটি খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা প্রকাশ করেছে। এছাড়া সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ঢাকা 'ইসলামী পুনর্জাগরণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা', সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্যা কুরআন এন্ড সুন্নাহ, চট্টগ্রাম 'দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম', আল ফুরকান প্রকাশনী 'জেরুজালেম ঃ বিশ্ব মুসলিম সমস্যা' এবং আল কোরআন একাডেমী লন্ডন 'ফতোয়া' প্রকাশ করেছে। ড. কারযাভীর ইংরেজি ভাষায় অনূদিত বই www.qaradawi.net/english ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়।

তিনি একজন স্বনামধন্য কবি। নিজস্ব কাব্য বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি আরব বিশ্বে সুপরিচিত। বর্তমানে ড. কারযাভী আল জাজিরাহ টেলিভিশনে একটি সরাসরি সম্প্রচারিত সাপ্তাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করছেন। বিশ্বের কোটি কোটি দর্শক শ্রোতা এ অনুষ্ঠান উপভোগ করে।

বাল্যকাল থেকেই তিনি ইসলামের একজন সক্রিয় কর্মী। এর জন্য তাকে ১৯৪৯, ১৯৫৪-১৯৫৬ এবং ১৯৬৩ সালে কারাবরণ করতে হয়। আরব ও মুসলিম দেশ সমূহের প্রতি পাশ্চাত্য বিশ্বের বিশেষ করে আমেরিকা ও বৃটেনের পররাষ্ট্র নীতির জন্য তিনি তাদের একজন কঠোর সমালোচক। একই সাথে ফিলিস্তিন প্রশ্নে ইসরাঈলের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ, একপেশে ও নিঃশর্ত সমর্থনের তিনি তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করেন। ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে তার সাম্প্রতিক বক্তব্য বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনগণের মতামতকে শাণিত করতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। তিনি একজন মানবাধিকারের প্রবক্তা। নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের সপক্ষে তিনি সোচ্চার যা তার বিভিন্ন লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছে।

ড. কারযাভী পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, আরব ও মুসলিম দেশসমূহ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছেন। তিনি বাংলাদেশেও বেশ কয়েকবার এসেছেন।

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সমস্যা হলো, মুসলিম বিশ্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। মুসলিম বিশ্ব গতিশীল নয়। এর প্রধান কারণ, মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব উম্মাহর মৌলিক সমস্যা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। তারা ব্যর্থ হয়েছে একটি কার্যকর কৌশল নির্মাণ ও কর্মসূচি গ্রহণে যা তাদেরকে বর্তমান অস্থিতিশীল অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে। এই হলো সার্বিক অবস্থা।

বাংলাদেশে যারা সংস্কার ও রেনেসাঁর নামে কাজ করছে তারা কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে সক্ষম না হওয়ার কারণে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশে যারা এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা তাদের কাজের অগ্রাধিকারের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করতে সক্ষম হননি–কোন কাজটি আগে করতে হবে এবং কেন?

আমাদের বিশ্বাস এ গ্রন্থটি বাংলাদেশে যারা সমাজ সংস্কারে কাজ করছে তাদের সুখনিদ্রা ভাঙতে সক্ষম হবে এবং তাদের মাঝে গতিশীলতা আনতে সহায়ক হবে। আশা করা যায় বইটি সমাজ কর্মীদের উজ্জীবিত করবে এবং তাদের মাঝে প্রাণসঞ্চার করার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন আনতে সক্রিয় ক্যাটালিস্ট বা অনুঘটকের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।